বিদ্যাবুদ্ধি

তারাপদ রায়

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅতি দাস

মুদ্রক ঃ
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

স্বর্গীয় অহিভূষণ মালিকের স্মৃতিতে

এই লেখকের অন্যান্য বই

ডোডো-তাতাই পালাকাহিনী

একটি কুকুরের উপাখ্যান

কাণ্ডজ্ঞান

কবিতার বই

নীলদিগন্তে এখন ম্যাজিক

দারিদ্র্যরেখা

সূচীপত্র

আবার সে এসেছে ফিরিয়া···৭
অভিনয় নয়···১০
ইঁদুর ও মদিরা···১৩
টর্চলাইট···১৬
রং ··২০
স্ত্রী ও মহিলা···২৩
শুভবিবাহ···২৬
লিফট···২৯
মদমত্ত···৩৩
আবার মদমত্ত···৩৬
কাঠগড়ায়···৩৯
সুচিকিৎসা···৪২
তাস···৪৫
আবার ডাক্তার···৪৮
পরকীয়া···৫১
অচলার প্রেম···৫৫
শেষ পরকীয়া···৫৮
এখন বক্তৃতা করবেন···৬১
এরপর বক্তৃতা করবে ··৬৫
তালা···৬৮
তালাচাবি···৭২
তবু রঙ্গে ভরা···৭৫
কুকুর কাহিনী· ৭৮
কুকুর-কুকুর···৮২
গোপাল ভাঁড়···৮৫
চলো যাই·· ৮৮
জগৎপারাবারের তীরে···৯১
প্রমাদ তরণী···৯৪
অসুখবিসুখ··· ৯৭
হিন্দি···১০০
অনর্থ···১০৩
রেফ্রিজারেটর ··১০৬
ভবসিন্ধু···১১০
কৃষ্ণকান্ত এবং···১১৩
পুনশ্চ কৃষ্ণকান্ত···১১৬
অশেষ কৃষ্ণকান্ত···১১৯
মাতাল-রহস্য···১২২
আরো রহস্য···১২৫
উপহার অথবা দান···১২৯
আবার মনে মনে ১৩৫
একবার বিদায় দে মা···১৩৮
শেষের সেদিন···১৪১

আবার সে এসেছে ফিরিয়া

আমি আবার ফিরে এসেছি। অমর পাগলা দাশুকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করে এবার আমি বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজে পাল ওড়াবো। এবার আমার সাহস বেড়েছে কাণ্ডজ্ঞানের অবসানে ; তাই বিদ্যাবুদ্ধি, যাব আমার নিতান্তই অভাব। যে সব সতর্ক পাঠক-পাঠিকা কাণ্ডজ্ঞানের ভগ্নতরীতে আরোহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, তাঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বিদ্যাবুদ্ধির জাহাজে ; এ জাহাজে আমার নিজের জিনিসপত্র, মালপসরা খুবই কম, সুতরাং ভয়ের কিছু নেই, প্রায় সবই স্মাগল করা, চোরাই জিনিস। মাঝে মধ্যে যদি কোথাও কখনো আমার কাঁচা হাতের কাজ চোখে পড়ে, দয়া করে চোখ সরিয়ে নেবেন।

★ ★

বিদ্যাবুদ্ধি অর্থাৎ বিদ্যা ও বুদ্ধি, নিতান্ত দ্বন্দ্ব সমাস। দুটো আলাদা আলাদা ব্যাপার। বিদ্যা এবং বুদ্ধি কেন যে একসঙ্গে আসে কে জানে ? বিদ্যা বিনয় দান করে বলে শোনা গেছে। কিন্তু সে কথাও সত্যি নয়, আশেপাশে অহঙ্কারী পণ্ডিতের অভাব নেই। অহং নেই

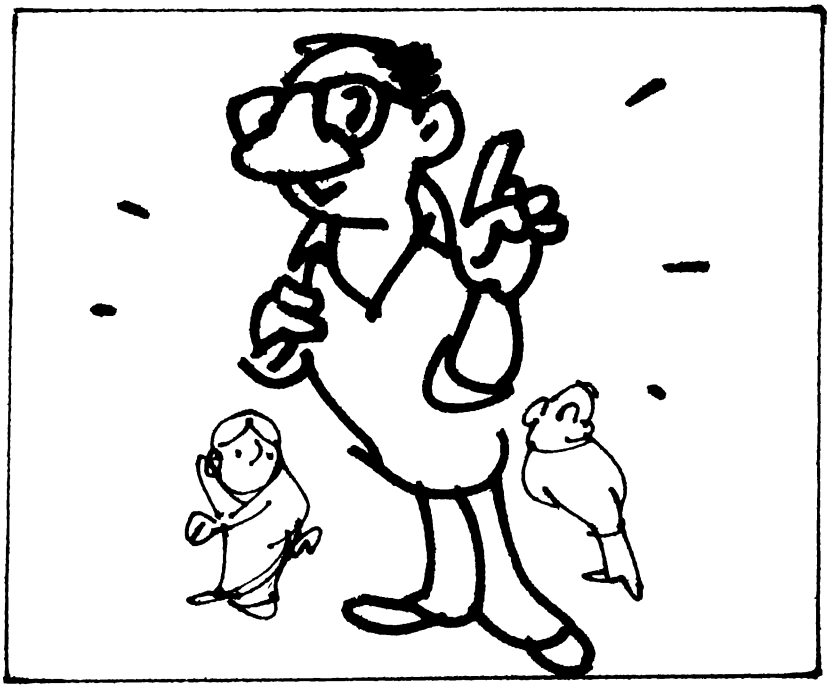

অথচ পাণ্ডিত্য আছে, এমন লোক খুঁজে পাওয়াই তো কঠিন।

বিদ্যার সঙ্গে বিনয়কে জড়ানো যেমন উচিত নয়, তেমনিই বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে ফেলা তো ঠিক হবে না। নির্বোধ বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান মূর্খের সংখ্যা এই সংসারে প্রায় সমান সমান।

কি একটা কাজে রাশভারি চেহারার এক গ্রাম্য ভদ্রলোক একবার আমার কাছে এসেছিলেন, হাতে একটা লম্বা দরখাস্ত। দরখাস্তের নিচে কোনো সই নেই।

আমি দরখাস্তটা নেওয়ার আগে ভদ্রলোকের কাছে জানতে চাইলাম, বিষয়টা কি ? ভদ্রলোক বললেন, সব এর মধ্যে লেখা আছে।

আমার একটু তাড়াতাড়ি ছিল, 'একটু পড়ে বলুন তো ব্যাপারটা কি ?' ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, 'আমি পড়তে পারবো না, পডতে জানি না। তবে লিখতে জানি।'

আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম, বললাম, 'ঠিক আছে। তাহলে সই করে দরখাস্তটা রেখে যান। পরে দেখা যাবে।' ভদ্রলোক পাঞ্জাবির পকেট থেকে মূল্যবান সোনার কলম বার করে শক্ত করে ধরে নাম সই করলেন। দুবার খটমট, খচখচ শব্দ হলো, তবে সুখের কথা, কলমও ভাঙলো না, কাগজও ছিঁড়লো না। কিন্তু দরখাস্তের নিচে সইয়ের দিকে তাকিয়ে আমার চোখ কপালে উঠলো। এ কি হিজিবিজি, দরখাস্তকারীর নাম উদ্ধার করার সাধ্য কারো হবে না, যাকে পরিভাষায় বলে স্বাক্ষর অস্পষ্ট, একেবারে ঠিক তাই।

আমি ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম, 'এই যে সই করলেন, নামটা তো পড়া যাচ্ছে না। দয়া করে নামটা বলুন, দরখাস্তের মধ্যে লিখে রাখছি।' ভদ্রব্যক্তিটি অপলক চোখে বহুক্ষণ নিজের হস্তলিপির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর অসহায়ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'পড়তে পারছি না। আগেই তো বললাম, লিখতে পারি, পড়তে পারি না।'

এই ঘটনার পাশাপাশি আরেকটা কাহিনীও লিখে রাখা উচিত। সেটা কোনো পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিত ভদ্রলোকের ব্যাপার নয়, রীতিমত শহুরে ব্যাপার, বিদ্যাদেবীকে নিয়ে। বেপাড়ার কয়েকটি ছেলে সরস্বতী পুজোর চাঁদা নিতে এসেছে, যথারীতি তাদের চাঁদার রসিদ বইয়ে সরস্বতী বানানে চমৎকার ভুল।

আগে এ সব গ্রাহ্য করতাম না। তবে আজকাল উত্তরযৌবনে রক্তচাপবৃদ্ধি বা স্নায়ুবৈকল্যবশত আমি একটু তিরচিটে হয়ে গেছি, ব্যাপারটা অনেকেই বলেছে, আমিও মাঝেমধ্যে টের পাই। আজ ঠিক করলাম সরস্বতী বানান নিয়ে হেস্তনেস্ত না করে এক পয়সা চাঁদা দেবো না। বহুকাল ধরে অনেক সহ্য করা গেছে, 'দেবি হোংসোবাহীনী' থেকে 'বানির আরাধোনায়' পর্যন্ত। কিন্তু আর সহ্য করবো না, 'সরস্যতি বোন্দোনায়' এক পয়সা দেবো না।

চাঁদা দলের কর্তা সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত চেহারার যে যুবকটি ধুতি, গরম পাঞ্জাবি, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, সিনেমার অধ্যাপকের মত দেখতে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'সরস্বতী বানান কি ?' যুবকটি নিশ্চয় এই প্রশ্নের সম্মুখীন ইতিমধ্যে এক-আধবার হয়েছে, সে রীতিমত সপ্রতিভভাবে উত্তর দিল, 'দেখুন চার রকম বানান হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেখায় যেটা সেটা আমরা লিখেছি।'

অন্যের বিদ্যা নিয়ে আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি করা সঙ্গত নয়, বিপজ্জনকও বটে। বরং

আপাতত বুদ্ধির দিকে একটু এগোই।

বুদ্ধির ব্যাপারটায় আমার স্বল্পতা থাকলেও আমাদের বাড়িতে এর যথেষ্টই বাড়াবাড়ি।

কয়েকদিন আগে দূরদর্শনের পর্দায় বলশয় দলের নাচ হচ্ছিল। আমরা বাড়ির সবাই বসে দেখছিলাম। তন্বীসুন্দরীরা কি অনায়াস সাবলীলতায় রূপের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করছিলেন, হঠাৎ আমার ভাই বিজন বললো, 'বলশয়ের মেয়েদের আর একটু লম্বা নিলেই পারে।' আমার স্ত্রী বললেন, 'কেন, এরা তো বেশ চমৎকার লম্বা।' বিজন বললো, 'না, আরেকটু লম্বা হলে ওদের আর পায়ের বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে কষ্ট করে নাচতে হতো না। স্টেজের উপর পায়ের পাতা সমান করে রেখেই নাচতে পারতো।'

শুধু সহোদর ভাইয়ের দোষ দিয়েই বা লাভ কি ? আমার অর্ধাঙ্গিনী, যাঁর বুদ্ধির আমি সমান ভাগীদার, তাঁর কথাও একটু বলা উচিত।

কয়েক বছর আগে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো এই শহরে এবং আরো নানা অঞ্চলে। কাগজপত্রে ভয়াবহ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিলো। পূর্ণ গ্রহণের কি পরিণতি, ঘরের বাইরে গ্রহণের সময় থাকা উচিত কি না, সেই সময় ভক্ষণাদি বিষয়ে শাস্ত্রীয় নিষেধ কতটা জরুরি, খালি চোখে গ্রহণের দিকে তাকানো কি রকম মারাত্মক এই সব নানাবিধ বিষয়ে প্রচুর উল্টোসোজা লেখা হয়েছিল।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের পরিণতি যাই হোক, সেই সময়টুকু কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে ভরদুপুরবেলায় চরাচর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো, নগরীর রাস্তাঘাট নিঝুম, জনমানব গাড়িঘোড়া কোথাও কিছু নেই। এমন সময় আমি আর আমার ছেলে ঠিক করলাম যা হয় হোক, পূর্ণ সূর্যগ্রহণের আকাশ আর সূর্য একবার দেখবোই। আমার স্ত্রী প্রথমে প্রাণপণ বাধা দিলেন, আমরা জোর করে দরজা খুলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

চারদিকে বাড়িঘরের জন্যে অন্ধকার আকাশটা ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। আমরা একটা কাছাকাছি ফাঁকা মাঠের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমার স্ত্রী পেছন থেকে শেষবার সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন, 'যাচ্ছো যাও। কি হবে কে জানে ? কিন্তু গ্রহণের খুব কাছে যেও না, একটু দূর থেকে দেখো।'

বলা বাহুল্য, আমার স্ত্রীর নিষেধাজ্ঞা শুনে সেদিন আমরা পিতাপুত্র সূর্যের খুব নিকটে যাওয়া থেকে বিরত ছিলাম।

কথাসূত্রে এই অবসরে একটু বিলেত থেকে ঘুরে আসি। বিলেতে গল্প আছে, সেই হলো বুদ্ধিমান লোক যে ক্রমাগত টাকার দাম কমে যাচ্ছে আর পাঁউরুটির দাম বেড়ে যাচ্ছে দেখে তার সমস্ত টাকা ব্যয় করে পাঁউরুটি কিনে জমিয়ে রাখে। এই বুদ্ধিমান সাহেবটির কাছেই টেকো সেলসম্যান কেশবর্ধক তেল বিক্রি করে এবং কার্টুনবাসী এই সাহেবটি চিরদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মনে প্রশ্ন তোলে, 'লোকটাকে খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছে, কোথায় যেন আগে দেখেছি ?'

প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে কোনো রচনা শেষ করতে নেই ইস্কুলে পণ্ডিতমশায় শিখিয়েছিলেন, তাই প্রথম বিদ্যাবুদ্ধি নিতান্তই সংস্কারবশত সরলভাবে শেষ করছি।

ব্যাপারটা হয়তো খুব সরল নয়, তবু বলি। ঘটনাটা আমার নাবালক বয়সের। সদ্য কলকাতা এসেছি, তথাকথিত লেখাপড়া করতে থাকি ছোটোমাসীর কাছে। ছোটোমাসী আমাকে শিখিয়েছেন প্রতিদিন অন্তত একটা করে ভালো কাজ করতে। কলেজ থেকে

দৈনিক চারটের মধ্যে ফিরে আসি। সেদিন বাসায় ফিরতে সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেলো। স্বভাবত উদ্বিগ্নমনা ছোটোমাসী বললেন, 'কি রে খোকন, তোর এত দেরি হলো ?' আমি বললাম 'সারাদিন কোনো ভাল কাজ করিনি, কলেজ থেকে ফেরার পথে একটা বুড়ি মেমসাহেবকে রাস্তা পার করিয়ে দিলাম।' ছোটোমাসী জানতে চাইলেন, 'একটা রাস্তা পার করাতে দেড়ঘণ্টা দেরি হলো ?' আমি বললাম, 'কি করবো বলো ? সে বুড়ি কিছুতেই রাস্তা পার হতে চায় না। শেষে জোর করে টেনে আনতে হলো এপারে।'

অভিনয় নয়

কলকাতা নামক এই ধূসর মরুভূমিতে একটি মধ্যসাপ্তাহিক মরূদ্যান আছে ; যেখানে সপ্তাহে একদিন সন্ধ্যায় বিদগ্ধ পুরুষ এবং সুন্দরী রমণীরা সমবেত হন। সেখানে সোনালি পানীয় এবং মেজাজি আড্ডা এবং কখনো কখনো চূড়ান্ত সুখাদ্য আমার এবং অনেকের জন্যে অপেক্ষা করে। সরাসরি বলা উচিত ঐ সান্ধ্য আসরে আমার অবারিত দ্বার।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সুস্থলে আমি কদাচিৎ যাই। গেলে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু যাওয়া হয় না। তার একটাই কারণ, অভিনয়। অভিনয়ের ব্যাপারে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয়, গায়ে জ্বর আসে।

হয়তো আমার মঞ্চ-কাঁপানো কণ্ঠস্বর অথবা ভাঁড়োপম স্থূল অবয়ব আমার অবচেতন মনে অভিনয় সম্পর্কে একটা অতিশীতল অনীহা রচনা করেছে। অথচ সেখানে গেলেই দেখতে পাই আমার বিখ্যাত বন্ধুরা দিনের সমস্ত ক্লান্তি হাতে ঠেলে দিয়ে সায়াহ্নের পর সায়াহ্ন কেমন সাবলীলভাবে মহড়া দিয়ে চলেছেন। বিখ্যাত লেখক যাঁর কলম ছুরির মত ধারালো, মৃত্যুঞ্জয়ী সার্জন যাঁর ছুরি মাখনের মত মসৃণ, রূপসী বন্ধুপত্নী যাঁর হাসি জন্মজন্মান্তের অনুরাগ-বিধুর, প্রবীণ সম্পাদক যাঁর প্রতিষ্ঠা প্রবাদপ্রতিম তাঁরা কত অনায়াসে, কত আয়াসে নাটকের মুখস্থ পার্টে গলা জোগাচ্ছেন।

যে গান ভালোবাসে না সে খুন করতে পারে। যে অভিনয় ভালোবাসে না সেও খুন করতে পারে। কিন্তু আমি অভিনয় ভালোবাসি না, তা তো নয়। আসলে আমি এখনো একটু চঞ্চল, একটু পরিহাস-প্রিয়, বাক্‌বিলাসী ; আমার পক্ষে অসম্ভব স্থির হয়ে বসে অন্যদের কথাবার্তা শোনা, বিশেষ করে সে যদি হয় মুখস্থ পার্ট এবং আগেও একবার শোনা হয়ে গিয়ে থাকে।

স্বীকার করি অভিনয় সম্পর্কে আমার ধ্যান-ধারণা খুব পরিচ্ছন্ন নয়। উল্টোদিক দিয়ে ব্যাপারটায় ঘুরে আসছি।

এ গল্পটা অবশ্য আগেও একাধিকবার অন্য সূত্রে বলেছি, তবে আমার অভিনয় অভিজ্ঞতার উদাহরণ হিসেবে এত ভালো যে না বলা ঠিক হবে না।

জীবনে মাত্র একবার আমি একটা থিয়েটারে পার্ট পেয়েছিলাম। ঠিক পার্ট বলা উচিত হবে না, কারণ আমার ভুবনবিখ্যাত কণ্ঠ ব্যবহার করার কোনো সুযোগ ছিলো না। নাটকের

একেবারে প্রথম দৃশ্যে পর্দা উঠতেই, বিছানায় শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী নায়কের বৃদ্ধ পিতার ভূমিকা ছিলো আমার, একবার আর্তকণ্ঠে 'ওঃ, ওঃ' বলে আমার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া এবং সেখানেই নাটকের শুরু।

কিন্তু এই সামান্য পার্টেও পরিচালক আমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিলেন। মহড়ার সময় যতবার, 'ওঃ ওঃ' করে মারা যাই, পরিচালক বলেন মরার পরে ওরকম শক্ত হয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবেন না, মৃত্যুর দৃশ্য হলে কি হবে, নাটকে সব কিছুর মধ্যেই লাইফ আনতে হয়, একটু লাইফ আনুন। বলা বাহুল্য মৃত্যুর মধ্যে কি করে জীবনসঞ্চার করতে হয় অদ্যাবধি সে আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বোধগম্য হয়নি।

মিথ্যাভাষণের অপবাদ এড়ানোর জন্যে এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি। এই মৃত পিতার ভূমিকার পূর্বেও আমার কৈশোরে একবার আমার মঞ্চে উঠবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সেবার অবশ্য আমার কিছুই করতে হয়নি। একলব্য নাটক, আমাকে দেয়া হয়েছিলো গুরু দ্রোণাচার্যের মূর্তির ভূমিকা, রক্ত-মাংসের দ্রোণাচার্যের পার্ট করেছিলো অন্য একজন। আমাকে মূর্তি হয়ে নিশ্চুপ, নিশ্চল বসে থাকতে হলো, আমাকে সামনে রেখে একলব্য অস্ত্রশিক্ষা করলো। মফস্বল শহরের আমবাগানে মশকবহুল সন্ধ্যায় প্রায় পনেরো মিনিটের সেই দৃশ্যে নট নড়নচড়ন স্ট্যাচু হয়ে বসে থাকা, সে স্মৃতিও আমার খুব মধুর নয়। সে বড়ো সুখের সময় নয়।

আমি জানি, আমার এই দুঃখময় অভিনয় জীবনের কথা পাঠ করে কোমলতমা পাঠিকার নয়নকোলেও একবিন্দু অশ্রু সঞ্চারিত হবে না। আমি এও জানি, বরং তিনি এখন ঠোঁট টিপে হাসছেন, এবং সেটাই আমার নিয়তি। সুতরাং হাসির কথাই বলি।

এক বেদনাঘন, বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা এক সন্ধ্যায় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি করুণ, হৃদয়স্পর্শী অভিনয় করছিলেন। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যেই করুণ রসের শুরু, আর সেই দৃশ্যে যাকে দর্শকের ভাষায় ফাটিয়ে দেওয়া বলে, তাই করলেন নায়িকা। সিন পড়ে যাওয়ার পর উইংসের অভ্যন্তরে নায়িকাকে অভিনন্দন জানালেন পরিচালক, 'এমন জীবন্ত, এমন প্যাথেটিক পার্ট এমন সুন্দর করছেন আজকে, ভাবাই যায় না। দর্শকরা কোনোদিন এই দৃশ্যে এতো হাততালি দেয়নি।'

নায়িকা শুকনো গলায় ডান পায়ের থেকে চপ্পল খুলতে খুলতে বললেন, 'এই চটিটার একটা পেরেক উঠে রয়েছে, সেটাই পায়ে ফুটে আমার চোখ দিয়ে জল বার করে দিচ্ছে। সাধে কি আর পার্ট এত করুণ হচ্ছে!'

এই কথা শুনে পরিচালক যেন হাতে চাঁদ পেলেন, তাড়াতাড়ি নায়িকাকে বললেন, 'ম্যাডাম, এখন চপ্পলটা খুলবেন না। দয়া করে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত পায়ে দিয়ে থাকুন। আর এর পর থেকে প্রত্যেক শোতেই পেরেক ওঠা অবস্থায় পায়ে দিয়ে আসবেন। এই পেরেক আপনার জীবনে আর বাংলার অভিনয়ের ইতিহাসে যুগান্তর এনে দেবে।'

আরেকটা মজার কাহিনী মনে আসছে। এক পেশাদারি নাটকের মঞ্চসফল নায়ক প্রযোজক মহোদয়কে অনুরোধ করেছিলেন, 'স্যার, ঐ ক্যাবারে নাচের সিনে যদি আপনি গেলাসে লাল রঙের সরবত না দিয়ে সত্যিই মদ খেতে দেন তাহলে অভিনয়টা আরো প্রাণবন্ত, আরো জমজমাট করতে পারি।'

প্রযোজক মহোদয় ব্যান্ডেল লোক্যালে চানাচুর বিক্রি করে কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। তারপর বহু ঘাটা-আঘাটা, নালা, খাল, বিল পার হয়ে হাতিবাগানের ঘাটে নৌকো এনে ভিড়িয়েছেন। এ ধরনের বাজে অনুরোধকে ঠাণ্ডা করতে তাঁর নিঃশব্দ পাথরপ্রতিম চাহনি, ইনডাস্ট্রির আপামরের ভাষায় সাপের চাউনি, যথেষ্টের চেয়েও বেশি কিন্তু নায়ক তো ফেলনা নয়। শিশির ভাদুড়ী কিংবা নির্মলেন্দু লাহিড়ী না হতে পারে কিন্তু ভদ্রলোকের বক্স অফিস খুব খারাপ নয়; প্রযোজক মহোদয় কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে দিলেন, বললেন, 'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি। কিন্তু মনে রাখবেন, শেষ দৃশ্যে বিষপানের দৃশ্য আছে, আপনি যেখানে আত্মহত্যা করছেন। সেই দৃশ্যে আপনার গেলাসে খাঁটি বিষ দেবো তো?'

এ সব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। উত্তর নেই এইরকম আরো অনন্ত প্রশ্নের। কিছুদিন আগে দূরদর্শনে কয়েক রবিবার সকালে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র প্রাঞ্জল এবং সরসভাবে অভিনয়ের ব্যাপারটা নতুন যুগের নাট্যোৎসাহীদের ব্যাখ্যা করলেন। সেখানে তিনি প্রথমেই বললেন, সব মানুষই অভিনয় করে, অভিনয় করতেই হয় মানুষকে। বাড়িতে হয়তো কেউ এসেছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগছে না, বিরক্ত হচ্ছি, কিন্তু তবু তাঁকে বলছি, 'এখনই চলে যাচ্ছেন? আরেকটু বসুন, এক পেয়ালা চা খেয়ে যান।'

সেক্সপীয়রের মতে, জীবনে এ রকম অভিনয় আমাদের সব সময়ই করে যেতে হচ্ছে।

সেক্সপীয়র সাহেব আরো বহু কথা—জন্মমৃত্যু, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ মানুষের সব কিছু নিয়ে সবরকম কথা বলে গিয়েছেন। এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটক দেখাতে গিয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন দেখলে?' ছেলে গম্ভীর মুখ করে বললো, 'ভালোই, তবে বইটা একেবারে কোটেশনে ভর্তি।' আরেকটি ছেলেকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিলো, 'সেক্সপীয়র কে?' সে অম্লানবদনে বলেছিলো, 'ঐ যে লোকটা আমাদের স্কুলের বার্ষিক উৎসবের নাটক লেখে।'

অভিনয় সংক্রান্ত এই এলেবেলে নিবন্ধ মহাকবি সেক্সপীয়রকে দিয়ে সমাপ্ত করতে পারলেই বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠা হতো। কিন্তু আমার স্বভাব মন্দ ; একটা প্রায় অপ্রাসঙ্গিক বাজে ঘটনা মনে পড়ছে। এক মূকাভিনেতার বাড়ির সামনে দিয়ে বছর কয়েক আগে নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণে যেতাম। মাঝেমধ্যেই তাঁর বাড়ির দরজায় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হতো। সেই মূকাভিনেতার বন্ধু ছিলেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি। মূকাভিনেতার সঙ্গে দেখা হতেই আমি প্রশ্ন করতাম, 'আচ্ছা অমুকে আপনার এত বন্ধু, আর আকাশবাণীতে আপনাকে একটা চান্স দেয় না।' মূকাভিনেতা ভদ্রলোক করজোড়ে বলতেন, 'দেখুন, আমি করি মূকাভিনয়, রেডিওতে আমার কি প্রোগ্রাম দেবে ?' আমিও নাছোড়বান্দা, দেখা হলেই ঐ একই প্রশ্ন করতাম। মূকাভিনেতা ভদ্রলোক শেষে আমার সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, আমাকে দেখলেই মূকাভিনয় করতেন।

ইঁদুর ও মদিরা

চঞ্চলা পাঠিকা, এই বিদ্যাবুদ্ধির এরকম অপ্রাকৃত এবং খটমটে শিরোনাম দেখে চট করে পাতা উলটিয়ে দিয়ো না। আসলে এই রচনার নাম অনায়াসেই দেওয়া যেতো সুরা ও রমণী অথবা নারী ও মদিরা। কিন্তু অনিবার্য কারণে এবং একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ইঁদুর বাদ দিয়ে নামকরণ করা গেলো না।

তবু ইঁদুরের রহস্যে প্রবেশ করার আগে ভদ্রতাবশত দু-একটা মদিরার গল্প বলে নিই।

প্রথম গল্পটি শুনেছিলাম শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর কাছে, পরে অবশ্য সেটা আমি অন্যত্র পাঠ করেছি। নার্সিংহোমে হাত পা ভেঙে এক ভদ্রলোক শয্যায় শায়িত। আগের দিন রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে ভদ্রলোক দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন এবং তারই ফলে এই অবস্থা। বিকালের দিকে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেখা করতে এলেন আহত ব্যক্তির সঙ্গে। 'কাল আমার কি হয়েছিলো বলতো ?' আহত ব্যক্তি বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন। বন্ধুটি বললেন, 'আর বলিস না, সাংঘাতিক ব্যাপার। সেই যে আমরা তোর জন্মদিন উপলক্ষে তোদের গাড়িবারান্দার ছাদে বসে সন্ধ্যারাত থেকে কয়েকজনে মিলে কয়েক বোতল মদ খেলাম।' আহত ব্যক্তি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আরে, সে পর্যন্ত আমার মনে আছে। কিন্তু তারপর পড়লাম কি করে ? কোথায় পড়লাম ?'

বন্ধুটি বললেন, 'তুই তো নিজে থেকে নিজের দোষে পড়লি। রাত বারোটার সময় তুই বললি যে আমি এবার পাখির মতো উড়তে পারবো। এই জন্মদিন থেকে ভগবান আমাকে একটা নতুন ক্ষমতা দিয়েছেন, আজ থেকে আমি ইচ্ছে করলেই পাখির মত উড়তে পারবো।' আহত ব্যক্তির কিছুই মনে নেই, সে চোখ গোল-গোল করে বললো, 'সর্বনাশ ! তারপর ?'

'তারপর আর কি ?' বন্ধুটি বললেন, 'তুই উড়তে পারবি শোনামাত্র মানিক আর বলাই বাজি রাখলো যে, তুই কিছুতেই উড়তে পারবি না, কোনো মানুষ কখনো উড়তে পারে না।

এই শুনে তুই ক্ষেপে গেলি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বারান্দার কার্নিসে উঠে দুই দিকে দুই হাত ছড়িয়ে পাখির মত উড়তে গিয়ে নিচে ধপাস করে পড়ে গেলি।'

আহত ব্যক্তি অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু তুই তো ছিলি সেখানে। তুই তো আমাকে বাধা দিতে পারতিস।' বন্ধুটি অধোবদনে স্বীকারোক্তি করলেন, 'কি আর বলবো, আমি তো নিজেও ভেবেছিলাম যে তুই নিশ্চয় উড়তে পারবি। তোর ওড়ার উপরে আমিও তো পঞ্চাশ টাকা বাজি রেখেছিলাম।'

দ্বিতীয় গল্পটি আমাকে বলেছিলেন এক পুলিশের দারোগা। দারোগা সাহেব একদিন রাত বারোটাব সময় থানায় ফোন পেলেন, এক খ্যাতনামা অভিনেতা (নাম বলা উচিত হবে না) তাঁকে ফোন করছেন, 'আমাব গাডি রাস্তায় রেখে আমি একটু অমুক-হোটেলে গিয়েছিলাম। এখন সেই হোটেলের থেকেই ফোন করছি। ভীষণ ব্যাপার হয়েছে।'

দাবোগা সাহেব ভাবলেন, গাডি নিশ্চয় চুরি হয়েছে। হামেশাই হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার গাডিটা রাস্তায় নেই ?' অভিনেতা বললেন, 'আরে গাড়ি না থাকলে তবু অন্য কথা ছিলো। গাডিটা আছে কিন্তু স্টিয়ারিং-হুইল, ড্যাস বোর্ড, ব্রেক পেডাল এমন কি সামনের কাচটা পর্যন্ত নেই।'

দারোগা সাহেব তাঁর চাকুবি জীবনে অনেক রকম চুরিব কথা শুনেছেন, এটা একটু বেশি অভিনব বলে মনে হ'লো তাঁব, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি ওখানে থাকুন আমি আসছি।' কিন্তু দারোগা সাহেবকে যেতে হলো না, তিনি বেরোতে যাচ্ছেন এমন সময় বিখ্যাত অভিনেতা টলতে টলতে থানার মধ্যে ঢুকলেন, 'দারোগাবাবু কিছু মনে করবেন না।

আপনাকে অযথা বিরক্ত করেছি। আমার গাড়ির সব কিছু ঠিকঠাক আছে, কিছুই চুরি যায়নি। ভুল করে পিছনের সিটে গিয়ে বসেছিলাম, তাই ওরকম মনে হয়েছিলো। ফোন করে ফিরে এসে সামনের সিটে বসতেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো।'

মদের এই প্রভাব এ কি শুধু মানুষদের ওপর ? অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মদের কি সম্পর্ক ? ঘোড়াকে রাম খাওয়ালে বেশি ছোটে এতো পুরনো কথা। মদ খেলে কুকুরও মাতাল হয় এ আমার স্বচক্ষে দেখা। একবার আমার একটা কুকুর রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়, বিশেষ চোট লাগেনি কিন্তু মৃত্যুভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো। সামনের বাড়ির এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাকে নিজের বরাদ্দ থেকে দু আউন্স হুইস্কি চামচে করে খাইয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুকুরটি চাঙ্গা হয়ে উঠলো এবং রাস্তায় ছুটে গিয়ে সমস্ত গাড়িকে তাড়া করতে লাগলো। সেদিন বহু কষ্টে তাকে দ্বিতীয়বার চাপা পড়ার হাত থেকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছিলাম।

কুকুর বা ঘোড়া নয়, সামান্য ইঁদুরের ওপর মদ নিয়ে গবেষণা করেছেন এক মার্কিন মনস্তত্ত্ববিদ, প্রোফেসর গেলর্ড এলিসন। এলিসন সাহেবের গবেষণা কোনো ভুয়ো বা ফাঁকা ব্যাপার নয়। এই গবেষণার ফলশ্রুতি নিউ ইয়র্ক টাইমসের মত সংবাদপত্রে বিশদভাবে বেরিয়েছে।

এলিসন সাহেব দেখতে পেয়েছেন যে যদি মদ ঠিকমত সরবরাহ করা হয় তবুও ইঁদুরের মধ্যে কিছু সংখ্যক কখনোই মদ খাবে না। বাকি কিছু সংখ্যক অল্পস্বল্প মদ খাবে। আর অল্প কিছু ইঁদুর যাকে বলে অ্যালকলহিক অর্থৎ পুরোপুরি মদ্যপ তৈরি হবে। এর একটা হিসেবও দিয়েছেন অধ্যাপক এলিসন, শতকরা দশ ভাগ মদ্যপ, শতকরা পঁচিশ ভাগ মদ স্পর্শ করে না, বাকিরা সময়-সুবিধামত পরিমিত পান করে। সবচেয়ে মজার কথা, মানুষের সমাজেও মদ্যাসক্তির ভাগাভাগিটা প্রায় একই রকম।

পরিমিত মদ্যপায়ী ইঁদুরেরা সাধারণত পান আরম্ভ করে নৈশাহারের দু ঘণ্টা আগে। নৈশাহারের পরে তারা জল ছাড়া কোনো পানীয় খায় না। অবশ্য ঠিক ঘুমুতে যাওয়ার আগে তারা কেউ কেউ আরেকটু মদ খায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মদ্যপ ইঁদুরদের নিয়ে। তাদের স্বভাব চরিত্র আচার আচরণ ঠিক মদ্যপ মানুষদের মতই। এই অ্যালকলহিক ইঁদুরেরা সকাল থেকেই মদ্যপান শুরু করে, যত দিন গড়াতে থাকে, তারাও মদ খেয়ে যায়। এরা অধিকাংশই খুব আলসে, এদের ঘুম ভালো হয় না। তার চেয়ে বড় কথা অন্য ইঁদুরেরা এদের মোটেই সম্মান বা গ্রাহ্য করে না। যে সব ইঁদুর মদ খায় না বা পরিমিত মদ্যপান করে ইঁদুর সমাজে তাদের বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখা হয়।

ইঁদুরের কথা আর নয়, মানুষের কথায় আসি। আরম্ভে সুরা ও রমণীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেখানেই আসছি।

ওমর খৈয়াম এক স্বপ্নসম্ভব পুষ্পকুঞ্জের কথা বলেছিলেন সেখানে খাদ্য ও কাজ, সাকী ও সুরা সবই ছিলো। দুঃখের বিষয় এ নিতান্তই পদ্যের পৃথিবী, মানুষের জীবনে এসব একসঙ্গে জোটে না।

এক বিদেশী পানশালার কথা মনে পড়ছে। সেখানে এক বেআক্কেলে মদ্যপের সঙ্গে আমার ক্ষীণ পরিচয় হয়েছিল। একদিন দেখি সে শুকনো মুখে বসে আছে। আমি

সহানুভূতি দেখাতে তার পাশে গিয়ে বসলাম, 'কি হলো, কি হয়েছে' জানতে চাইলাম। সে যা বললো সাংঘাতিক, আগের রাতে একজনের কাছে এক বোতল হুইস্কির জন্য তার বউকে বেচে দিয়েছে। আমি তখন বললাম, 'তা হলে এখন বউয়ের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে।' সে বললো, 'তা হচ্ছে। বউ না থাকায় আজ খুব কষ্ট হবে, আজ মদ খাবো কি বেচে ?'

দ্বিতীয় গল্পের নায়কের দেখা পেয়েছিলাম এই শহরেরই এক ক্লাবে। সেও শুকনো মুখে বসে ছিলো। জিজ্ঞাসা করাতে বললো, বউয়ের সঙ্গে গোলমাল চলছে। আমি বললাম, 'তা, ব্যাপারটা কি ?' সে বললো, 'বউ বলেছে তিরিশ দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।' আমি বললাম, 'তা হলে তোমার ভালোই তো হলো।' 'ভালোই তো হয়েছিলো', সে গেলাসে একটি দীর্ঘ চুমুক দিয়ে দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ছাড়লো, 'আজকেই মাস শেষ হয়ে গেলো, আজকেই তিরিশ দিনেব শেষ দিন।'

মদিরা কথামালার আপাতত শেষ গল্পটি অবশ্যই ইঁদুরকে নিয়ে। একটি ইঁদুর একটি বিড়ালকে নিয়ে একটি হোটেলে গেছে। সেখানে ইঁদুরটি পরিমিত এবং বিড়ালটি আকণ্ঠ মদ্যপান করেছে। যখন নেশাগ্রস্ত বিড়ালটি এলিয়ে পড়েছে, তখন ইঁদুরটি বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য এক প্লেট কড়াইশুঁটির অর্ডার দিলো। বেয়ারাটি ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার বন্ধু মিস্টার ক্যাট কিছু খাবেন না, ওঁর খিদে পায়নি ?' ইঁদুরটি বেয়ারাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'ওঁকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, মিস্টার ক্যাটের খিদে পেলে আমি কি আর এখানে থাকবো ?'

টর্চলাইট

একদা নিশীথকালে দুজন বিখ্যাত গুলিখোর একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। ঘনঘোর অন্ধকারে একজন গুলিখোরের হাতে একটি টর্চলাইট ছিলো। সেই টর্চলাইটে আলো জ্বালিয়ে পথ দেখতে দেখতে দুজনে হাঁটছিলো। যেমন হয়ে থাকে দুজন গুলিখোর পাশাপাশি হাঁটলে যা হওয়া উচিত, দুজনে মিলে উল্টোপাল্টা আজগুবি সব গল্প করছিলো। তাদের গন্তব্য স্থান বেশ দূরে ছিলো, হয়তো নেশার ঘোরে তারা ঘুরপথেই যাচ্ছিলো। অনেক অনেক হাঁটার পর এক গুলিখোর বললো, 'এ যে কিছুতেই পৌঁছাচ্ছি না, এর থেকে স্বর্গে যাওয়া তো সোজা। আর কত হাঁটবো রে বাবা ?' দ্বিতীয় গুলিখোর যার হাতে টর্চলাইট ছিলো সে আকাশের দিকে লম্বালম্বি টর্চলাইটটার আলো ফেলে বলল, 'ঐ তো স্বর্গ, সোজা পথ। আমাদের বাড়ির পথের মত অত ঘোরা রাস্তা নয়। যাবি ?' প্রথম ব্যক্তি এই প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলো, সে বললো, 'এ আর বেশি কথা কি ? সোজা এই আলো বেয়ে উঠে যাবো।' সুড়ঙ্গের মতো টর্চলাইটের আলোটা সরাসরি অন্ধকার আকাশ ভেদ করে উঠে গেছে, সেই ঊর্ধ্বপানে সে তাকিয়ে নিয়ে মালকোছা দিলো তার ধুতিতে আলো বেয়ে স্বর্গে উঠে যাওয়ার জন্যে। তার পরেই কি যেন চিন্তা করে সে থমকে দাঁড়ালো। টর্চলাইটধারী তাগাদা দিলো, 'কি রে, কি হলো দেরি করছিস কেন ? লাইট টিপে

টিপে আমার আঙুল ব্যথা হয়ে গেলো।' দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন বললো, 'না ভাই তোকে বিশ্বাস নেই। আমি উঠবো না।' প্রথম গুলিখোর বন্ধুর অবিশ্বাসে আহত হয়ে বললো, 'আমাকে ভয় পাচ্ছিস কেন ? আমি কি করবো ?' দ্বিতীয়জন বললো, 'আমি ওঠার সময় তুই যদি মাঝপথে আলো নিবিয়ে দিস, তাহলে তো আমি ঝপাং করে পড়ে মরে যাবো।'

টর্চলাইটের এই পৌরাণিক মোটাদাগের হাসির গল্পটি যাঁরা জানেন তাঁদের আজ আমি অন্য এক টর্চলাইটের করুণ কাহিনী শোনাতে চাই, সে কাহিনী এরকম কাল্পনিক, গুলিখোর বা হাস্যকর নয়।

আমার টর্চলাইটটা খুজে পাচ্ছি না। আমাদের বাড়িতে কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে সব শুদ্ধ একশো আট জায়গায় খুজতে হয়। জায়গাগুলো এইরকম, আলমাবির নিচে, আলনার পিছনে, তরকারির ঝুড়ির আড়ালে, আমাদের কুকুর গণেশের বিছানায়, ছোট জিনিস হলে আমার পাঞ্জাবির পকেটে, বড় জিনিস হলে মিনতির হাতব্যাগে অথবা আমাদের ডাকবাক্সে।

আমাদের হারিয়ে যাওয়া জিনিস ডাকবাক্সে কি করে প্রবেশ করে সে প্রশ্নে অন্য একদিন যাবো।

আমাদের টর্চলাইটটা ঠিক আমাদের নয়। বহুকাল আগে, সে প্রায় পচিশ বছর হলো এই লাইটটা আমাদের কালীঘাট বাড়িতে একটা চোর ভুল করে ফেলে যায়। চোর যখন দোতলার পাইপ বেয়ে আমাদের বাড়িতে চুরি করার যোগ্য কোনো জিনিস না পেয়ে বিফল-মনোরথ হয়ে নেমে যাচ্ছিলো তখন ভুল করে ছাদের কার্নিশের ধারে সে তার টর্চলাইটটা ফেলে যায়। আমার অগ্রজ বহুক্ষণ আগেই গৃহে চোরের প্রবেশ টের পেয়েছিলেন, এবং

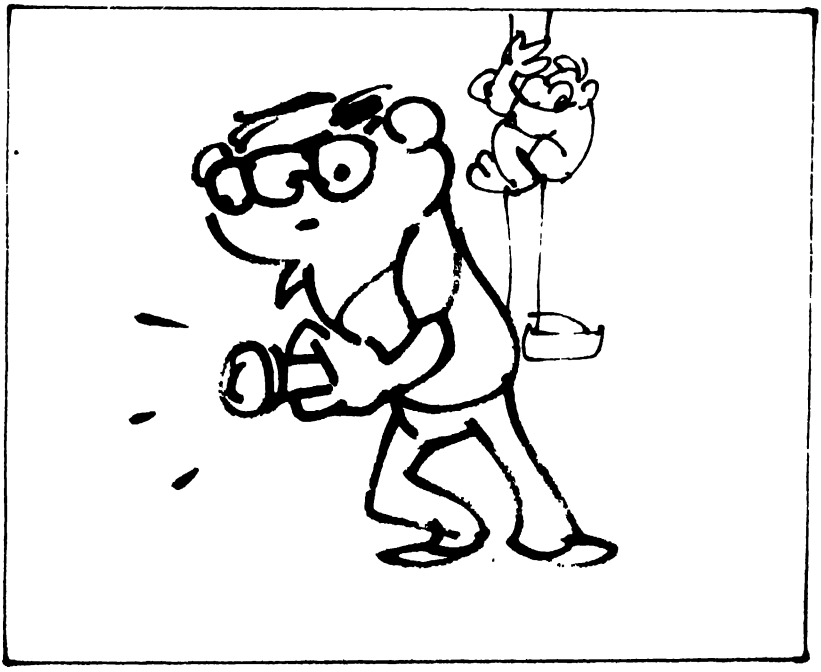

তিনি নীরবে চোরটিকে লক্ষ্য রাখছিলেন শুধু এই কৌতূহলবশত যে আমাদের বাড়িতে এমনকি জিনিস আছে যা চোরে নিতে পারে!

শেষ পর্যন্ত দাদা দেখলেন যে হতভাগা চোরের সম্পূর্ণ পরিশ্রম শুধু বৃথা হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু সে তার নিজের সম্পত্তি কার্নিশের একধারে ফেলে যাচ্ছে। কার্নিশেরই অন্য প্রান্তে অন্ধকারের মধ্যে গুটি মেরে বসে দাদা এতক্ষণ পর্যন্ত চোরের কার্যকলাপ নজর রাখছিলেন, এবার তাঁর মায়া হলো।

পাইপ বেয়ে চোর তখন প্রায় আধাআধি নেমে গেছে। দাদা কার্নিশের উপর থেকে মাথা বাড়িয়ে ডাকলেন, 'এই যে ভাই, আপনার টর্চটা।' সঙ্গে সঙ্গে চোর বেচারি একটা মোক্ষম লাফ দিয়ে নিচে নেমে ছুট দিলো। দাদাও টর্চলাইট হাতে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে চোরের পিছনে দুর্ভাগার আলোটা ফেরত দেওয়ার জন্যে দৌড়তে লাগলেন।

সে দৌড় দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিলো। আমাদের মহিম হালদার স্ট্রীটের বাড়ির পিছন দিক দিয়ে কালীঘাটের বাজার ধরে আদিগঙ্গার খাল পেরিয়ে চেতলার মধ্য দিয়ে একেবারে নিউ আলিপুরের সীমানায় দুর্গাপুর ব্রিজের নিচ পর্যন্ত। পুলের নিচের গোলকধাঁধায় লোকটা হারিয়ে যায়, দাদাও রণে ভঙ্গ দিয়ে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসেন।

এরপর থেকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় ঐ চোরের টর্চটি আমাদের সম্পত্তি হয়। আমার সেই স্মরণীয় অগ্রজ বহুদিন বিগত হয়েছেন। বাউণ্ডুলে, অস্থির চিত্ত, খ্যাপা দাদা তাঁর স্নেহাস্পদ ভাই, এই আমার জন্যে, ইহপৃথিবীতে স্মৃতি এবং ঐ চোরের টর্চলাইটটি ছাড়া কিছুই রেখে যাননি। ঐ টর্চলাইটটি আমার অতিপবিত্র উত্তরাধিকার সুতরাং এরপর থেকে ঐ আলোটিকে চোরের টর্চলাইট না বলে শুধু টর্চলাইট বলবো।

টর্চলাইটটি পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম মাঝেমধ্যে হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই বেরিয়ে পড়ে। দ্রব্যটি এত বেশি হারায় যে ওটি খুঁজে বার করার জন্যে আমার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে একটি সরল পন্থা বার করেছি।

লাইটটি হারিয়ে গেলে আর যত্রতত্র, একশো আট জায়গায় খুঁজি না। বাড়ির সবাই মিলে একত্র হয়ে একটা টেবিলের চারপাশে বসি। তারপর আলোচনা শুরু হয় লোডশেডিং নিয়ে। কারণ ওর মধ্যেই রয়েছে গুপ্তধনের চাবিকাঠি। লোডশেডিংয়ের সময় ছাড়া টর্চলাইট কাজে লাগে না। সুতরাং আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, শেষ কখন বা কবে লোডশেডিং হয়েছিলো। যখন ঘনঘন লোডশেডিং হয় তখন এ ব্যাপারটা নিয়ে খুব মতভেদ হয় না।

তারপরে প্রশ্ন, গত লোডশেডিংয়ের সময়ে কে টর্চ ব্যবহার করেছিলো এবং সর্বশেষ মোক্ষম জিজ্ঞাসা, লোডশেডিংয়ের পরে যখন আলো ফিরে এলো সেই মুহূর্তে যার কাছে টর্চলাইটটা ছিলো, সে কোথায় দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে ছিলো? বলা বাহুল্য, এই শেষ প্রশ্নটি নিয়ে বহু বাদবিসম্বাদ হয় এবং যেভাবেই হোক টর্চলাইটের হদিস মিলে যায়।

যাঁরা এ পর্যন্ত পড়ে ভাবছেন টর্চলাইটটি খুবই দামি মডেলের, সোনা, রুপো অন্তত তামার, কিংবা অন্য কোনো রহস্য আছে এর মধ্যে, তাঁরা কিন্তু ভুল ভাবছেন।

এবার টর্চটির রহস্য প্রসঙ্গে আসছি। প্রথমত ঐ টর্চটি আমরা বাড়ির কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জ্বালাতে পারে না, সুতরাং কারো ওটা চুরি করে লাভ হবে না। টর্চটি জ্বালানোর আগে সেটার পিছনে এক সেকেন্ড ব্যবধানে পরপর তিনবার আলতো করে এবং তারপরে অতর্কিতে একবার একটু জোরে চড় দিতে হবে। এই শেষ চড়টা খুব জোরে হলে চলবে না,

আবার খুব আস্তে হলেও চলবে না। চড় মারার সময় খুব সূক্ষ্মভাবে কান পেতে থাকতে হয়, টেলিফোনের লাইন কেটে যাওয়ার মত একটা মৃদু কট করে শব্দ হওয়া মাত্র টর্চটাকে হাতের মধ্যে বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে হবে এবং ভাগ্যপ্রসন্ন থাকলে ঐ ঘুরতে ঘুরতে আলো জ্বলে উঠবে।

আলো জ্বলে উঠলেই যে সমস্যার সমাধান হলো তা নয়। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে টর্চের মুখটা নিচের দিকে করলেই আলো নিবে যায়, ফলে গুলিখোরের টর্চলাইটের মত এটাকে স্বর্গপানে ধরে রাখতে হয়। অন্ধকারের মধ্যে চলাফেরার জন্যে পনেরো থেকে বিশ ডিগ্রি পর্যন্ত বাঁয়ে বা ডাইনে কাত করা যেতে পারে, কিন্তু খুব সাবধানে, কারণ নিবেও যেতে পারে

তবে নিবে গেলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ অনেক সময় একা-একাই স্বেচ্ছায় জ্বলে ওঠে। শুধু তাই নয়, বহু সময়েই সে কমে-বাড়ে নিজের খুশিমত ; এই নিবু নিবু হয়ে এসেছে হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠলো, আবার ধীরে ধীরে কমতে লাগলো, এরকম হামেশাই হয়।

টর্চটা সম্বন্ধে আরেকটা তথ্যও জানানো দরকার। আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে টেবিল বা তাকের পাশে টর্চটি পড়ে থাকতে দেখে কেউ দয়া করে ধরতে যাবেন না। পিছনে স্প্রিংটা আজ কিছুদিন হলো বিপজ্জনকভাবে শক্তিশালী হয়ে পড়েছে। হঠাৎ হঠাৎ পিছন দিক দিয়ে স্প্রিংটা ছিটকে বেরিয়ে আসে, তার পিছে পিছে বিদ্যুৎবেগে ছুটে আসে দুটি বড় ব্যাটারি, বুকে লাগলে দিশি পাইপগানের গুলির চেয়ে সে কম মারাত্মক নয়।

আজ কিন্তু এই অপূর্ব টর্চটিকে হাজার চেষ্টা করে উদ্ধার করা গেলো না। মন খারাপ করে অবশেষে তার এই অবিচুয়ারি লিখতে বসেছি। এমন সময় হঠাৎ লোডশেডিং। আলো নিবতেই কি আশ্চর্য, টর্চলাইটটা নিজেই ফিরে এলো। দেখি বইয়ের তাকের পিছনে অন্ধকারে সে একা-একাই জ্বলে উঠেছে। বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেলো। দাদা মৃত্যুর সময়ে বলে গিয়েছিলেন, 'গরিব মানুষের ফেলে যাওয়া জিনিস, হারাবি না, যত্ন করে রাখবি, লোকটাকে পেলে ফেরত দিবি।'

রং

শিবরাম চক্রবর্তী একবার তাঁর এক গল্পে রং ফলানোর বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছিলেন। শিব্রামীয় পানরীতির অমোঘ ব্যবহারে রং শব্দটি বাংলা ইংরেজি দুই দিক থেকে এসেছিলো। বাংলা রং, মানে বর্ণ, রং ফলানো মানে সোজা কথায় বাড়িয়ে বলা আর ইংরেজি রং অর্থাৎ Wrong মানে ভুল।

ইংবেজি ব্যাপারেএবার যাচ্ছি না, শুধু হাতের কাছে এসে গেছে যখন ব্যাপারটা একটু ছুঁয়ে থাকি।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়, অরভিল এবং উইলবার রাইট, প্রথম এরোপ্লেন চালিয়ে ছিলেন। এরোপ্লেন বিষয়ক এক খণ্ডকাব্যে বিখ্যাত রসিক কবি অগডেন ন্যাস লিখেছিলেন, 'টু রাইটস মেক এ রং', (Two rights make a wrong); ন্যাস সাহেব উচ্চারণের মিলের জন্যে একটুও বানানের তফাৎমানেননি। রাইট নামের বানানের প্রথমে যে ডবলিউ আছে সেটাকে উপেক্ষা করেছেন। সে যাহোক, দুই রাইটে মিলে একটা রং বানিয়েছে, বিমান সম্পর্কে কবির এই তির্যক উক্তিটি চমৎকার।

বাংলা রঙের ব্যাপারে রসাযন বিজ্ঞানী পরশুরাম ছিলেন প্রথম শ্রেণীর বোদ্ধা। তাঁর অসংখ্য গল্পে রঙের, বিশেষ করে গাত্রবর্ণের, তিনি অতুলনীয় বিশ্লেষণ করেছেন। ধুস্তরীমায়া অর্থাৎ দুই বুড়োর রূপকথা গল্পের নায়ক উদ্ধব পাল নিজের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে রাজকুমারী স্পন্দচ্ছন্দাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'অত ফরসা কি করে হলেন?' রাজকুমারী যখন বললেন যে তাঁর গায়ের রং-ই ঐ রকম, উদ্ধব সশব্দে হেসে বললেন,

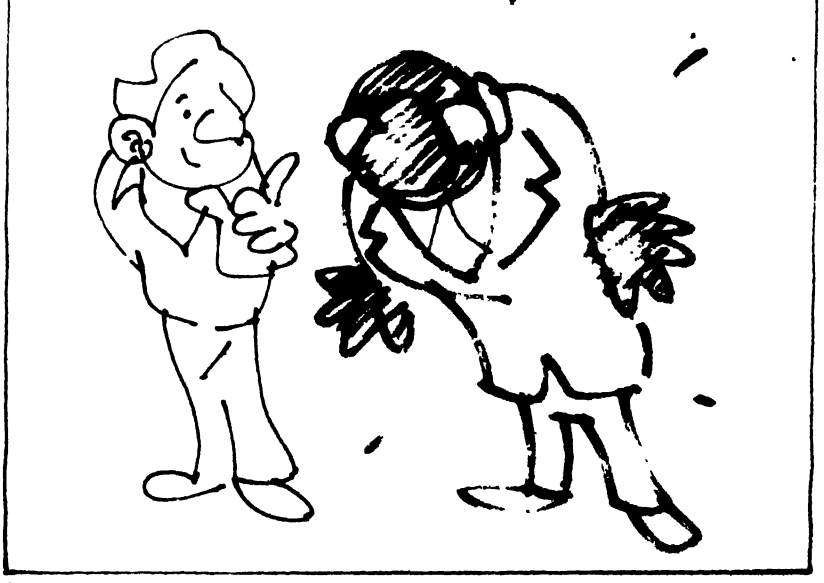

'ওগো চণ্ডপণ্ডা পদীরানী, রঙের ব্যাপারে আমাকে ঠকাতে পারবে না, ওই হলো আমার ব্যবসা। তুমি এক কোট আস্তরের উপরে তিন কোট পেন্ট চড়িয়েছো—হবক্স জিঙ্ক, একটু পিউড়ি আর একটু মেটে সিঁদুর। তা লাগিয়েছো বেশ করেছো, কিন্তু জমির আদত রংটি কেমন ?'

তাঁর অন্য এক গল্পে পরশুরাম এক আত্মাভিমানী বাঙালী কালো মেয়ের কথা লিখেছেন, যার আগে নাম ছিলো শ্যামা। ম্যাট্রিক দেবার সময় নিজেই নাম বদলে তমিস্রা করে, কারণ তার কালো রং সে শ্যামবর্ণ বলে চালাতে চায় না।

এই সূত্রে আমার নিজের কথাও একটু বলি। আমার মা বলতেন আমার গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কিন্তু আসলে তা নয়। আমার কৃষ্ণ ত্বক মাতৃস্নেহের তারল্যে কিছুটা ঝকঝকে মনে হতো স্বর্গতা জননীর দৃষ্টিতে। গায়ের রং নিয়ে এ বয়েসে আমার দুঃখ নেই। বাঙালী পুরুষের গায়ের রং শুধু বিয়ের রাতে কন্যাপক্ষের মহিলামহলে সামান্য আলোচ্য-বিষয়। তবে দু-একটা অসুবিধে আজও আছে। কলকাতায় নবাগত অনেক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক রাস্তাঘাটে আমাকে পেলে তামিল ভাষায় কথা বলে কিছু জানতে চান। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার বেশ দু-চারবার হয়েছে।

আরেকটা অভিজ্ঞতা হয়েছিলো বিদেশ যেতে গিয়ে। আমাদের গরিব দেশের পাসপোর্টে চোখের বর্ণ চুলের বর্ণ ইত্যাদি উল্লেখ কবতে হয় কিন্তু সুসভ্য শ্বেতাঙ্গ কোনো কোনো দেশে যেতে গেলে ভিসার দরখাস্তে গায়ের রং কিরকম তাও জানাতে হয়। আমার গায়ের রং কালো, অবশ্যই কালো কিন্তু আমি কৃষ্ণাঙ্গ নই, ব্ল্যাক বলতে যা বোঝায় আমি সে জাতের নই। আমি সাদা বা কালো নই, আমি ভারতীয় কিংবা বড়জোর বাঙালী। কিন্তু গায়ের রং তো ইণ্ডিয়ান বা বেঙ্গলি লেখা যাবে না। উদ্ধার করেছিলেন ভিসা অফিসার নিজেই, ফর্মের ঐ জায়গাটা ফাঁকা রেখেছিলাম, তিনি নির্দ্বিধায় লিখে দিলেন 'হুইটিস', মানে গমের মতো। সেই থেকে নিজের গায়ের রং সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে গেছে, যখনই কোথাও লালচে গমের দানা চোখে পড়ে নিজের গায়ের চামড়ার দিকে তাকাই, সেই সাহেব ভিসা অফিসারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মাথা নুয়ে আসে।

গায়ের রং মোটামুটি পাকা ব্যাপার। সাহেব-মেমরা অনেক সময় সমুদ্রতীরে যান গায়ের চামড়া রোদে পুড়িয়ে ট্যান করার জন্যে কিন্তু জনপদে ফিরে এসে তাঁরা আবার তাঁদের দুঃখের শ্বেতবর্ণ ফিরে পান। আমাদের কালো রঙ অনেক সময় অসুখ-বিসুখে, রোদ্দুরে ঘুরে, রাত জেগে বা অন্য কোনো কারণে আরো কালো হয়ে যায়, চেনাশোনা লোক পথে-ঘাটে দেখা হলে, 'কি হলো এত কালো হলে কি করে ?' পার্থক্যটা অবশ্য ভূত-চতুর্দশীর অন্ধকার আর শ্যামাপুজোর অমাবস্যার রাত্রির চেয়েও কম, তবু পরিচিত চোখে ধরা পড়ে। এদিকে গ্রামের লোক কলকাতায় এলে কলকাতার কলের জলে তাদের গায়ের রং চিকেশাভাব ধারণ করে, মাজা রঙের মেয়ে গৌরাঙ্গী হয়ে ওঠে। আবার গ্রামে ফিরে গেলে কয়েকদিনের মধ্যে যে-কে সেই।

হকার্স কর্ণারে দেখেছি রং উঠে যাওয়া সদ্য কাচা নতুন শাড়ি হাতে স্থূলাঙ্গিনী মহিলা চেঁচাচ্ছেন,'আপনি বলেছিলেন না পাকা রং, এই আপনার পাকা রং ?' প্রিন্টেড শাড়ির লাল ফুল, নীল পাতা, সবুজ পাখি—রং মেখে প্রায় একাকার হয়ে গেছে, সেই শাড়িটা দোকানদারের মুখের সামনে মেলে ধরেন ভদ্রমহিলা, কিন্তু দোকানদার নির্বিকার। শুধু নির্বিকার না, পাশের তাক থেকে আবার প্রিন্টেড শাড়ি নামাচ্ছেন আর বলছেন, 'মাসিমা, যা

হবার হয়েছে, এবার এই রামপুরের প্রিন্ট নিয়ে যান, এবার সত্যিই পাকা জিনিস দিচ্ছি।'

এর চেয়েও মারাত্মক গল্পের সেই দোকানদার। অনুরূপ পরিস্থিতিতে সে নাকি উলটো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'রংটা উঠে কি হলো ?' কেনা-দিদি জবাব দিয়েছিলেন, 'উঠে গিয়ে লাগলো অন্য কাপড়ে।' দোকানদার এবার আশ্বস্ত হলেন, 'ও তা হলে এক সঙ্গে কেচেছিলেন। বাকি কাপড়গুলো কি ছিলো ?' কেনা-দিদি এই প্রশ্নে খেপে গেলেন, 'আপনার চাদরের নীল রং লেগে গেছে সাদা তোয়ালেতে, বিছানার চাদরে, কর্তার গেঞ্জিতে, ছেলের পাজামায়।' এবার দোকানদার স্মিত হেসে বললেন, 'কেনা-দিদি, এবার দেখবেন রংটা কত পাকা। ঐ তোয়ালে, চাদর, পাজামা থেকে জন্মেও ঐ নীল রং উঠবে না। ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সেদ্ধ করলেও না।'

এ গল্প বানানো গল্প, কিন্তু যে-কোনো মহৎ সাহিত্যের মতো এর বিষয়বস্তু সত্যি ; পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যাঁর সাদা কাপড়ে কখনো পাকা দাগ পড়েনি অন্য কোনো কাপড়ের কাঁচা রঙের ? এবং সে রং আর ওঠেনি।

কাঁচা রঙের ব্যাপারটা আরো একটু পরিচ্ছন্ন করা যেতে পারে আমার নিজেরই একটি ঘটনায়। আমার পরমারাধ্যা পত্নীঠাকুরাণী একবার আমাকে একটি কলকাপেড়ে সাদা শাড়ি কিনে আনতে বলেছিলেন। এসব কঠিন কাজ সাধারণত তিনি নিজেই করেন, কিন্তু বোধহয় এই অসামান্য জিনিসটা বাজারে পাননি। আমিও পেলাম না, কিন্তু শততম একাদশ বিপণিতে এক বিক্রেতা একটি আশ্চর্য কথা বললেন, 'ফিকে নীল অথবা ফিকে হলদে রঙের কলকাপাড়ের শাড়ি নিয়ে যান স্যার। এক ধোপেই সাদা হয়ে যাবে।'

রঙের গল্প শেষ করার আগে আরো একটা ক্ষমা চাওয়ার মতো ব্যাপার আছে।

কিছুদিন আগে এক ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে কিছু খারাপ ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের পোষা মেনি বিড়াল গান্ধারী তিনটে বাচ্চা দিয়েছিলো। গান্ধারী নিজে আগাগোড়া সাদা আর বাচ্চা তিনটে হয়েছে চমৎকার সাদাকালো। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক পুরো এক রিল ছবি তুললেন আমাদের বাড়িতে। ফোটোগুলো ডেভেলপ করে আর প্রিন্ট করে এক ছুটির দিন নিয়ে এলেন। চমৎকার ঝকঝকে সব ছবি উঠেছে বিড়ালছানা ও তাদের মা সমেত বাড়ির সকলের। তবে অর্ধেকের বেশি ছবিই বেড়াল ছানাদের।

ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক রঙীন ছবি তুলেছিলেন এবং রঙীন ছবির খরচটাই আমার কাছে চেয়েছিলেন কিন্তু আমি তাঁকে অর্ধেক টাকা দিয়েছিলাম। সাদা-কালো বেড়াল ছানার রঙীন ফটো দিয়ে কি হবে, যদি তিনি তুলে থাকেন সেটা তাঁর বোকামি, তার মাশুল আমি দেবো কেন ? সেই ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক আর আমাদের বাড়িতে আসেন না। এখন মনে হচ্ছে পুরো টাকাটা দিয়ে দিলেই হতো।

রং সম্পর্কে শেষ কথা বলেছিলেন এক অনিদ্রা রোগী। নানা রকম ঘুমের ট্যাবলেট তাঁর মাথার কাছে সাজানো। একটা, দুটো বড়িতে তাঁর ঘুম আসে না, অন্তত তিন চারটে লাগে। বিভিন্ন ট্যাবলেট বিভিন্ন আকারের সাদা-কালো হলদে ইত্যাদি বিভিন্ন রঙের।

একই হোটেলে আমার পাশের বেডে ছিলেন ভদ্রলোক। দেখলাম একেক রঙের একটা করে ট্যাবলেট নিয়ে তিন চার রকম ট্যাবলেট একসঙ্গে জল দিয়ে খেয়ে ফেললেন। আমি বললাম, 'এটা কি করলেন ?' অনিদ্রা রোগী মৃদু হেসে বললেন, 'নানা রঙের ঘুমের ওষুধ মিলিয়ে খাই রঙীন স্বপ্ন দেখবো বলে।'

স্ত্রী ও মহিলা

দুটি গল্পের বিষয়বস্তু প্রায় একই, তবে দুটি দুরকমের। প্রথম গল্পটি গোলমেলে এবং খুব সংক্ষিপ্ত।

এক ভদ্রলোককে তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাল বিকালে আপনাকে বাজারের সামনে দেখলাম একজন মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।' অর্ধ প্রশ্নবোধক এইবাক্যের উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আরে না, উনি কোনো মহিলা নন, উনি আমার স্ত্রী।'

দ্বিতীয় গল্পটি অনেকের পরিচিত। আমি নিজেও আগে বলেছি। এ গল্পটিও কথোপকথনের ভঙ্গিতে বলাই ভালো। দুজনের মধ্যে দেখা হয়েছে, পুরনো চেনাজানা হঠাৎ-হঠাৎ আজকাল দেখা হয়।

প্রথমজন : পরশুদিন বিকেলে বাজারের সামনে তোমাকে দেখলাম একজন সুন্দরী মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছো। সুন্দরীটি কে ?

দ্বিতীয়জন : বলতে পারি তোমাকে, তবে এক শর্তে।

প্রথমজন কি শর্ত ?

দ্বিতীয়জন : বলো আমার স্ত্রীকে কোনোদিন বলবে না।

প্রথমজন : না বলবো না। আর তাছাড়া তোমার স্ত্রীকে আমি তো চিনিই না। কখনো দেখিনি।

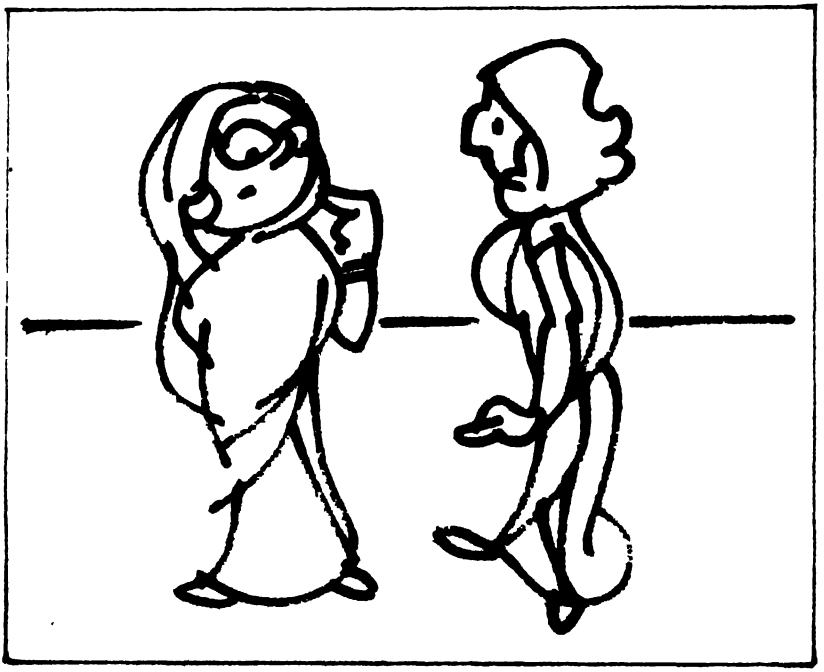

দ্বিতীয়জন : ঐ সুন্দরী মহিলাই আমার স্ত্রী।

এ দুটি গল্প মোটামুটি মন্দের ভালো। মহিলাদের বিপক্ষে বিশেষ যায়নি। স্বামী-স্ত্রী সংক্রান্ত যতরকম গল্প প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই স্ত্রী-বিরোধী। এর দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথম কারণ হলো, এ সব গল্পের রচনাকার হলেন পুরুষেরা, এ সবই পুরুষ সমাজের গল্প। দ্বিতীয় কারণটি আমার মনে হয় স্বামীদের বা পুরুষদের সম্পর্কে মহিলামহলে হয়তো কিছু কিছু গল্প থাকতে পারে, তার মধ্যে থাকতে পারে অতিশয় বিপজ্জনক এবং চনমনে কাহিনীমালা যা পুরুষদের কখনোই কর্ণগোচর হয় না।

স্ত্রী-শাসিত বিপর্যস্ত পতিদেবতাদের চমৎকার সব গল্প আছে বাংলা ভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্রে আছে, রবীন্দ্রনাথেও আছে, দজ্জাল গৃহিণী শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসের উপজীব্য। হাসির গল্পের সীমানায় পরশুরাম সুযোগ পেলেই মেনিমুখো স্বামীকে একহাত নিয়েছেন। ভীরু, গোবেচারা স্বামীর চরিত্র সৈয়দ মুজতবা আলীর রম্যরচনাতে বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর স্বামী মানেই আসামী থেকে নব্য সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের তির্যক কলমে গোবেচারা স্বামীর দুঃখের কাহিনী পড়ে বাঙালী পাঠক হেসে চলেছে তো চলেইছে।

সাহিত্যে যদি স্বামীবৃন্দ এত হাস্যকর ভূমিকা পেয়ে থাকেন তবে লোকগল্পে, বটতলার রসিকতায় পথচলতি টুকরো হাসির কথিকায় স্ত্রীদের এত হেনস্তা কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর এই মূর্খ কলমকারের জানা নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি যত খুচরো হাসির গল্পের সম্মুখীন হয়েছি তার মধ্যে স্বামীজব্দ কাহিনীর চেয়ে স্ত্রীজব্দ কাহিনীর সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

কলকাতা থেকে সামান্য দূরে এক মফঃস্বল শহরে আমার এক কনিষ্ঠ বন্ধু বাড়িতে কয়েক বছর আগে একবার কয়েক দিনের জন্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছেলেটি, নাম ধরা যাক রমেশ, কিছুদিন আগে বিয়ে করেছে। সে আমাকে নিমন্ত্রণ করে তার নতুন সংসার কেমন চলছে দেখে যেতে বলেছিলো।

গিয়ে দেখলাম ভালোই। নতুন বউটি মোটামুটি সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। বাড়িঘর ভালোই সাজিয়েছে। বাইরের ঘরে তক্তপোশের উপরে হারমোনিয়াম, বুঝলাম মেয়েটি সঙ্গীত চর্চাও করে। সব মিলে ভালোই লাগলো, মোটামুটি দুজনে মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়েছে।

শুধু একটা ছোট জিনিসে খটকা লেগেছিলো। নববধূ সকালে নিয়মিত হারমোনিয়াম নিয়ে গলা সাধতে বসে এবং সেই মুহূর্তে রমেশ ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়। তৃতীয় দিনের মাথায় আমি রমেশকে ধরলাম, 'বউমা গান আরম্ভ করলেই তুমি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও কেন ?' রমেশ অম্লান বদনে বললো, 'প্রাণ বাঁচানোর জন্যে।'

আমি একটু উষ্মা প্রকাশ করলাম, 'বউমার গান এমনকি খারাপ যে তোমার প্রাণহানি হবে।' রমেশ বললো, 'না, তা ঠিক নয়। আসলে হলো কি, এ পাড়ার লোকেরা স্ত্রীনিগ্রহ একেবারে সহ্য করে না। ঐ যে আজকাল বউ ঠেঙানো, বউপোড়ানো হয়েছে না—এ সব নতুন ফ্যাশন এ পুরনো পাড়ার লোকেরা সহ্য করবে না।'

আমি অবাক, 'বউমার গান গাওয়ার সঙ্গে তোমার ঐ স্ত্রী ঠেঙানোর কি সম্পর্ক ?' রমেশ বললো, 'বুঝছেন না, ওর ঐ গান গাওয়া শুনে পাড়ার লোকেরা অনায়াসেই ভাবতে পারে আমি ওকে পেটাচ্ছি তাই ও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে। সেই জন্য গান গাওয়া আরম্ভ হওয়া মাত্র আমি ছুটে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াই। পাড়ার লোকেরা দেখুক, আমি ওকে পেটাচ্ছি বা ঠেঙাচ্ছি না। ও একা একাই ওরকম করছে।'

স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার নিয়ে পরের কাহিনীটি বৈরাগ্য বিধুর, প্রায় সেই বিখ্যাত লালাবাবুর বেলা যায়' গল্পটির মতো।

এই ক্ষুদ্র কাহিনীর নায়কের নাম অনুকূলবাবু, নায়িকা অনুদেবী অনুকূলবাবুর স্ত্রী। অনুকূলবাবু বড় বেশি ধূমপান করেন, দৈনিক তিন চার প্যাকেট, প্রায় তিরিশ চল্লিশটা। এই নিয়ে অনুদেবীব সঙ্গে অনুকূলবাবুর অহরহ খিটিমিটি। রাতদিন অনুদেবী স্বামীকে গঞ্জনা দেন, কেনএত সিগারেট খাও ! বাড়িঘর নোংরা কর। তোমার গা দিয়ে মড়াপোড়া গন্ধ।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

যথারীতি অনুকূলবাবু মুখ বুজে সব সহ্য করে যান এবং গালি-গালাজের মাত্রা যেমন বেড়ে চলে সেই যন্ত্রণা উপশম করবার জন্যে সিগারেট খাওয়ার মাত্রাও বেড়ে চলে।

অনুকূলবাবুর পাশের বাড়িতে থাকেন প্রতিকূলবাবু। প্রতিকূলবাবুও খুব সিগারেট খান। কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে আজ দুদিন হলো প্রতিকূলবাবু সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। কি করে যেন অনুদেবী এ খবরটা পেয়ে গেছেন। ফলে তাঁর গঞ্জনা এখন আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। সেদিন রাত্রে অনুকূলবাবু শুতে যাবেন, সবে দিনের শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছেন, অনুদেবী বললেন, 'ঐ তো সামনের বাড়ির প্রতিকূলবাবু। কি রকম সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিলেন। তুমি পারো না ?'

অনুকূলবাবু সিগারেটে একটা জোর টান দিয়ে অতিশয় বিরস মুখে বললেন, 'না পারি না।' অনুদেবী আরো উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'কেন পারবে না ? তোমার মনে জোর নেই ? তোমার গায়ে মানুষের রক্ত নেই ?'

সিগারেটে শেষ সুখটান দিতে গিয়ে অনুকূলবাবুর গলায় বোধহয় একটু ধোঁয়া আটকিয়ে গিয়েছিলো কিংবা অন্য কোনো কারণে স্বভাবত শান্ত ভদ্রলোক হঠাৎ দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন, 'কি, আমার মনে জোর নেই ? দেখাচ্ছি তোমাকে।'

অনুকূলবাবু সিগারেটটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে বিছানা থেকে মাথার বালিশ আর আলনা থেকে একটা চাদর নিয়ে সোজা বাইরের ঘরে চলে গেলেন, যাওয়ার সময় স্ত্রীকে বললেন, 'আজ থেকে আমি বাইরের ঘরে আলাদা শোবো।'

যেমন কথা তেমন কাজ। যাকে বলে মনের জোর তাই দেখালেন অনুকূলবাবু। তিনি সেই যে বাইরের ঘরে বালিশ নিয়ে গেলেন, আর শোয়ার ঘরে এলেন না।

দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস যায়। শোয়ার ঘরে অনুদেবী আর বাইরেরঘরে অনুকূলবাবু, রাত আর যায় না। অবশেষে একদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পরে অনুকূলবাবু বাইরের ঘরে শুতে গেছেন হঠাৎ অনুদেবী এসে দরজায় দাঁড়ালেন, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনুকূলবাবু তাঁর দিকে তাকাতে অনুদেবী বললেন, 'ওগো, জানলায় দাঁড়িয়ে দেখো। ঐ পাশের বারান্দায়, ও বাড়ির প্রতিকূলবাবু আবার সিগারেট খাচ্ছেন !'

স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে আর একটা মনের জোরের কথা জানি। গল্পটার মধ্যে কিঞ্চিৎ ছমছমে ভাব আছে, তবু বলি। আমার এক সহকর্মী বেশকিছুদিন খুব মন ভার, মুখ কালো করে বসে থাকতো। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা না গলানোই ভালো তবু তার এই অবস্থা দেখে আমি তাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, 'তুমি মনের জোর করো, তোমার দুর্ভাবনা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।' সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলো, 'দাদা, শুধু মনের জোরে হবে না। গায়ের জোরও লাগবে। আমার অতো গায়ের জোর নেই।' আমি বিস্মিত হয়ে বললাম,

'গায়ের জোর ?' সে বললো, 'হ্যাঁ দাদা, আমার স্ত্রীকে তো দেখেননি, পাকা আশি কেজি ওজন। দূরে ছুঁড়ে ফেলতে গেলে শুধু মনের জোরে হবে না, বেশ গায়ের জোর লাগবে।'

শুভ বিবাহ

মধুমাস এসে গিয়েছে। দূরে বহুদূরে বসন্তের বনে সহকারশাখা নমিত হয়ে পড়েছে নবীন মুকুলের ভারে, ঝরে পড়া সজনে ফুলের মৃদু সৌরভে জড়িত হয়েছে মৌমাছিবৃন্দ, জ্যোৎস্নারাত মথিত করে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে কোকিলসখার আলাপ।

আমাদের ধূলি-মলিন, ভাঙাচোরা এই শহর। বসন্ত সেখানেও এসে গিয়েছে। গৃহস্থের জীর্ণ চৌকাঠ এবং ভাড়াটে বিয়ে বাড়ির বারান্দা রঙিন মণ্ডপে ভরে গেছে। আর আমাদের পুরনো ডাকবাক্স ভরে গেছে সিঁদুরের ফোঁটা লাগানো হলুদ রঙের চিঠিতে, যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ।

বিয়ের বিষয়ে আলোচনার প্রথমেই আসে বিয়ের বিজ্ঞাপনের প্রসঙ্গ। প্রতিটি রবিবাসরীয় সংবাদপত্রের প্রধান আইটেম পাত্র চাই, পাত্রী চাই। পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের শ্রেষ্ঠ নমুনাটি উপহার দিয়েছিলেন স্বর্গীয় শিবরাম চক্রবর্তী।

বিজ্ঞাপনটি ছিলো চমৎকার ; বিজ্ঞাপনের প্রথমাংশে যথারীতি পাত্রের বংশগৌরব, বিদ্যা, বয়েস, পদমর্যাদা ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত অথচ বর্ণাঢ্য বিবরণ ; তারপর পাত্রী সংক্রান্ত দাবিপত্রটি ছিলো খুবই স্পষ্ট, 'পাত্রীর নিজের বাড়ি থাকা প্রয়োজন। বাড়ির ফটো সহ আবেদন পাঠান।'

আপাতদৃষ্টিতে খটকা লাগলেও বহু পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের নিহিত অর্থ এর চেয়েও মর্মান্তিক। যা হোক, এই সুখি মরশুমে আমরা দাবিদাওয়ার আলোচনায় যাবো না। বরং আরো দু-একটা কথা বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে উল্লেখ করছি।

সেটা ছিলো দশমিক যুগের প্রথম পর্যায়ে। টাকা-আনা-পাই বদলিয়ে নয়াপয়সা, গজ-ফুট ইঞ্চির জায়গায় মিটার-সেন্টিমিটার। সব পত্রিকা দপ্তরে সরকারি নির্দেশ দশমিকের হিসেবে সমস্ত ছাপতে হবে। এক ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ের বিজ্ঞাপন দিতে এসেছেন, অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই ইঁঞ্চি। বিজ্ঞাপনের কেরানীবাবু বললেন, 'ওসব পুরনো ফুট ইঞ্চি চলবে না, মিটার সেন্টিমিটার করে দিন।' বিজ্ঞাপন দাতা নির্বিকারভাবে ফুট ইঞ্চি কেটে উচ্চতা পাঁচ মিটার দুই সেন্টিমিটার করে দিলেন। জানি না সেই দ্বিতল দীঘল মেয়েটির ঐ বিজ্ঞাপনে বিয়ে হয়েছিলো কিনা।

আরেকটি আশ্চর্য বিজ্ঞাপন আমি দেখেছিলাম এক রবিবারের পাতায়। সেটি যেমন করুণ, তেমনি ভয়াবহ। এক উচ্চাভিলাষী যুবক ঘরজামাই হয়ে জীবনে উন্নতি করতে চায়। সে লিখেছে, 'রাত্রিতে কমার্স পড়ি, দুপুরে টাইপ শিখি, কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবাহ করিয়া ভাইয়ের মত থাকিতে চাই।' টিউশনি করে বা বাজারসরকারি করে হয়তো কোনো পরিবারের ভাইয়ের মত থাকা যায় কিন্তু বিয়ে করে যে ভাইয়ের মত থাকা যায় না, এ কথা

সে হতভাগ্যকে কে বোঝাবে !

বিজ্ঞাপনের পর চিঠিপত্র। একটি পাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের উত্তরে আড়াইশো চিঠি প্রায় সমসংখ্যক দুরুদুরু হৃদয়া যুবতীর অবাস্তব আলোকচিত্র। যতবার যত জায়গায় ইচ্ছে মেয়ে দেখা, দাম-দর, সাইকেল স্কুটার থেকে গাড়ি, ফ্রিজ, টি ভি সেই অপমানকর অধ্যায়ের কথা বিদ্যাবুদ্ধিতে লেখা উচিত হবে না।

বরং মজার কথায় আসি। সেই গল্পটা জানেন, যেখানে প্রেমিকা তার প্রেমিককে বলছে 'তুমি সত্যি বলো, বিয়ের পরেও তুমি আমাকে এইরকম ভালোবাসবে ?' আর প্রেমিক জবাব দিচ্ছে, 'তুমি কি যে বলো, তুমি কি জানো না যে বিবাহিতা মহিলাদেরই আমি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি ?'

মনে আছে, নব্য স্বামীর প্রতি মহাত্মা স্টিফান লীককের সেই সুপরামর্শ ? যদি দ্যাখো বধূমাতা গলা নামিয়ে কিছু বলছেন, ধরে নেবে তিনি কিছু চাইছেন। যদি দ্যাখো তিনি গলা চড়িয়ে কিছু বলছেন, ধরে নেবে তিনি যা চাচ্ছেন, পাচ্ছেন না।

আর তারাপদ রায়ের সেই মোটা রসিকতাটি কি আপনি কখনো শুনেছেন ? তেমন খানদানি লোক কি আপনার সার্কেলের মধ্যে আছে যে তারাপদবাবুর রসিকতা নিজের কানে শুনেছে ?

বিয়ে সম্পর্কে তারাপদবাবু কি বলেছিলেন ?

কিছুই না। একটি ছোট স্বীকারোক্তি। তারাপদবাবু স্বীকার করেছেন, তাঁদের 'পুরো পরিবারে কারোর তেমন ভালো বিয়ে হয়নি, কোন একজন ছাড়া, সেই একজন হলেন তাঁর স্ত্রী।

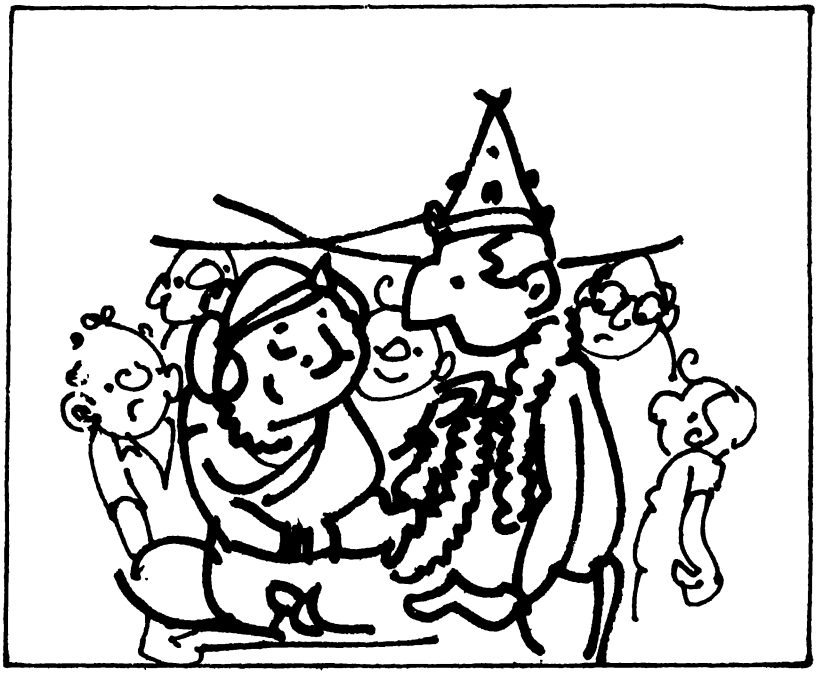

বাংলা ভাষায় লাভ ম্যারেজ বলে একটি কথা আছে, ভালোবাসার বিয়ে। এরই বিপরীতে সম্বন্ধ করা বিয়ে। আজকাল আবার কিছু কিছু হচ্ছে ভালোবাসার পরে সম্বন্ধ, আবার সম্বন্ধের পরে মেলামেশা, ভালোবাসা, তারপরে বিয়ে।

কোনটা কি রকম ভুক্তভোগীরা বলতে পারবে, আমি সে জটিল আলোচনায় যাবো না। তবে লাভ সম্পর্কে বিলিতি একটি রসিকতা জানি। সেখানে বিয়েকে টেনিসখেলার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। খেলার শুরুতে লাভ অল (Love all) ; এ লাভ মানে ভালোবাসা নয়, এর মানে শূন্য। আর প্রকৃত লাভ গেমে একপক্ষের শূন্য আর অন্যপক্ষের গেম।

বিয়ে যেখানে সত্যিসত্যিই গেম, সেই সোনালি-রূপালি হলিউডে, এক মহীয়সী চিত্রতারকা তাঁর পুরনো বান্ধবীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হলো ? কেমন লাগলো ?' সরলাপ্রকৃতির বান্ধবী খুব মিষ্টি করে বললেন, 'আলাপের কি আছে ? তোমার পছন্দ তো খারাপ নয়, তোমার কোনো স্বামীকেই আমার কখনো খারাপ লাগেনি।'

বিয়ের প্রসঙ্গে একটি অন্যরকম গল্পও বলা ভালো। অফিসের একটি ছেলে একদিন আমার কাছে ছুটি চাইতে এলো অর্ধেক বেলার জন্যে, বললো, 'দাদার বিয়ে আছে, বাড়িতে মা একা, আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।'

দাদার বিয়ের দিনে অফিসে এসেছে এরকম বড় একটা দেখা যায় না। তবে বাড়িতে মা একা, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে এ কথাটা ঠিক বোধগম্য হলো না। যা হোক তাকে যথারীতি ছেড়ে দিলাম। বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা না করে।

কয়েকদিন পরে ছেলেটি আবার এলো। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি ব্যাপার ?' সে আগের মতই বললো, 'দাদার বিয়ে আছে, বাড়িতে কেউ নেই।'

কি ব্যাপার ধাপ্পা দিচ্ছে নাকি ? এই গত সপ্তাহেই দাদার বিয়ে বললো। আমি জানতে চাইলাম, 'তোমার কয় দাদা ? সে বললো, আমরা দু ভাই, ঐ একজনই দাদা।' আমি বললাম, 'তা হলে ? তোমার দাদা তো গত সপ্তাহেই বিয়ে করলেন ? আজ আবার বিয়ে ?' ছেলেটি হেসে বললো, 'দাদা বিয়ে করবে কেন ? দাদা বিয়ে দেয়, পুরুতের কাজ করে। বিয়ের সিজন চলছে তো, তাই একটু চাপ চলছে।'

শুভবিবাহ সম্পর্কে এই সামান্য নিবন্ধ শেষ করার আগে অনেকদিন আগে আমার স্বকর্ণে শোনা একটি কথোপকথন লিপিবদ্ধ না করা অত্যন্ত অন্যায় হবে।

ঘটনাটা ঘটেছিলো আমার প্রথম যৌবনে, উত্তর বিহারের এক মফঃস্বল শহরে। আমি সেখানে গিয়েছিলাম এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে ছুটি কাটাতে।

শহরটি ছিমছাম। নদীর তীরে একটা রাস্তা, দু ধারে আম গাছ আর সেই রাস্তার পাশে একটা বড় মাঠ। সকালে বিকেলে ঐ রাস্তায় আর মাঠে আমি পায়চারি করতাম।

একদিন দেখি এক বিহারি ভদ্রলোক তাঁর নাবালক পুত্রকে সঙ্গে করে ঐ রাস্তাতেই বেড়াচ্ছেন। এঁরা বোধহয় এ শহরে নতুন এসেছেন। সম্ভবত আমারই মতো কোনো আত্মীয়জন বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন।

বাপ আর ছেলে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছে। ছেলেটি অত্যধিক কৌতূহলী, যত রকম সম্ভব প্রশ্ন করে চলেছে তার পিতৃদেবকে।

'বাবা, এটা কি গাছ ?'

'বাবা, এ গাছে কাঁটা নেই কেন ?'

'বাবা, এটা কি নদী ?'

'বাবা, নদীতে জল থাকে কেন ?'

এই রকম এবং আরো অজস্র প্রশ্নবাণে সে তার বাবাকে অস্থির করে তুলেছে।

পাশের মাঠে দুটো গাধা চরে বেড়াচ্ছিলো। সহসা শিশুটির দৃষ্টি সেই দিকে আবদ্ধ হলো। সামনের গাধাটিকে দেখিয়ে ছেলেটি প্রশ্ন করলো, 'বাবা ওটা কি ?'

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, 'ওটা একটা গাধা।'

ছেলেটি উত্তর পেয়ে একটু থেমে গিয়েছিলো। এই সময় দ্বিতীয় গাধাটি ওর নজরে এলো, সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্ন 'বাবা, পিছনের ওটা কি ?

দ্বিতীয় গাধাটিকে এক নজর দেখে নিয়ে বাবা উত্তর দিলেন,'ওটা গাধার বৌ।'

ছেলেটিকে এবার একটু চিন্তিত দেখালো, সে একবার অস্ফুট স্বরে বললো, 'গাধার বৌ।' তারপরেই আবার অতর্কিত প্রশ্ন, 'আচ্ছা বাবা, গাধারা তাহলে বিয়ে করে।'

এতক্ষণে উত্তরের মত উত্তর দিলেন পিতৃদেব,'হ্যাঁ খোকা, গাধারাই শুধু বিয়ে করে।'

লিফট

স্মৃতি থেকে উদ্ধার করছি, এই পঙ্‌ক্তিদুটি হয়তো একটু এদিক ওদিক হতে পারে তবে কবিতাটি নিশ্চয় কবি গোলাম মোস্তাফার,

দেখে শুনে বুঝিলাম করি তালিকা,
সবচেয়ে ভালো মোর ছোট শ্যালিকা।

আমার নিজের বিয়ে হয়েছে দুই দশকেরও আগে, প্রায় দুই যুগই বলা যায়। এতদিন পরে তালিকা প্রণয়ন করে ছোট্ট শ্যালিকাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণা করার আমার আর কোনো প্রয়োজন নেই।

তবু লিফটের সূত্রে আমার ছোট শ্যালিকা সম্পর্কে দু-একটা কথা লিখে রাখা চলে। তার প্রথমটি অপ্রাসঙ্গিক। আমার বিয়ের সময় আমার মাননীয়া স্ত্রী এবং তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আকারে-প্রকারে, আচার-আচরণে অনেকটা একরকম ছিলেন। যেমন হয়, মায়ের পেটের পিঠোপিঠি বোন বা ভাই হলে। আমার বিয়ের অব্যবহিত পরেই একদিন আমাদের বাড়িতে আমার শ্যালিকাকে দেখে আমার এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কে তোমার স্ত্রী আর কে তোমার শ্যালিকা বুঝতে তোমার অসুবিধে হয় না ?' আমি সোজাসুজি উত্তর দিয়েছিলাম, 'বোঝার খুব চেষ্টা করি না।'

এসব অনেককাল আগের কথা। সেদিনের সেই নবীনা শ্যালিকা, আজ ষড়ৈশ্বর্যময়ী রাশভারি সংসারিণী। কে তাকে দেখলে বলবে একদা তাকে নিয়েই আমি কবিতা লিখেছিলাম, 'রোদে হাওয়ায় একটি গোলাপ, একটিই শেষ গোলাপ সখি !' 'দেশ' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই।

এসব ব্যক্তিগত কথা আপাতত থাক। বরং সরাসরি এবারের মূল বিষয় লিফট প্রসঙ্গে চলে আসি। বলা বাহুল্য, ঐ লিফট সূত্রেই শ্যালিকার কথা এসেছে। এইখানে অতি গোপনে ব্রাকেটে একটা কথা বলে রাখি, (এই বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হলেন আমার স্ত্রী, তবে তাঁর চেয়েও সুন্দরী তাঁর ছোট বোন।)

কলকাতার এক সরকারি অতিথিশালায় আমরা সবাই একত্রিত হয়েছিলাম। মধ্যাহ্নভোজনের পর আমি শ্যালিকাকে নিয়ে মিঠে পান কিনতে বেরোলাম। আমার স্ত্রী-পুত্র এবং শ্যালিকার স্বামী পুত্রাদি অতিথিশালার উচ্চতম তলে চলে গেলেন শীতের রোদ পোহানোর জন্যে। পান কিনে ফেরার পথে ঘটলো সেই অঘটন। লোডশেডিং, চারতলা এবং পাঁচতলার মধ্যে ঘচঘচাং করে লিফটটা আটকে গেলো। এইরকম একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে শ্যালিকার উষ্ণ সান্নিধ্য, কিন্তু আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো। অন্যদিকে আমার শ্যালিকা প্রাণপণ চেঁচাতে লাগলেন, 'বাঁচাও, বাঁচাও'। ঐ অবস্থাতেও আমার মাথা ঠাণ্ডা ছিলো। আমি যত তাকে বলি, 'লোকে ভাববে আমি কোনো অশালীন আচরণ করছি, তুমি একটু কম চেঁচাও', কে কার কথা শোনে!

বহু চেঁচামেচি, কাঁদাকাটি অনুনয় বিনয়ের পর সেদিন লোকেরা আমাদের উদ্ধার করেছিলো প্রায় আধঘণ্টা পরে।

লিফটের প্রাচীন গল্পটা এক গ্রামবৃদ্ধকে নিয়ে। সে বেচারী কলকাতায় এসে জীবনে প্রথম লিফট দেখে। দেখে যে এক বৃদ্ধা মহিলা লিফটের ভিতরে ঢুকে উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেলো। দু মিনিট পরে লিফটটা উপর থেকে নেমে এলো, ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো এক পরমাসুন্দরী যুবতী।

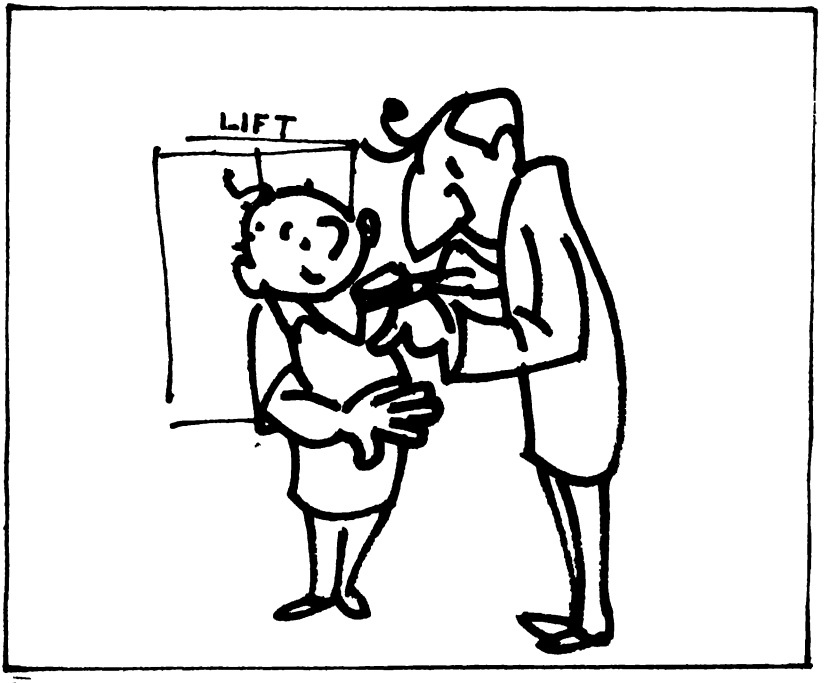

এই দৃশ্যটি দেখার পরে ঐ পাড়াগেঁয়ে বুড়োটি নাকি কপালে চড় দিয়ে আক্ষেপ করেছিলো, 'হায়, আমার বুড়িকে কেন সঙ্গে করে নিয়ে এলাম না। সে তো আসতেই চেয়েছিলো। আমিই রেখে এলাম। আমারই কপালের দোষ। আজ কলকাতা থেকে তাকে কেমন অল্পবয়সী ডাগরডোগর বানিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম।'

লিফটের ব্যাপারে অনেকদিন আগে কলকাতা শহরের পুরনো একটা হোটেলের একটা মজার ঘটনা বলার রয়েছে। তখন এই শহরে অনেক ইংরেজ ছিলো। সাহেব-মেমদের জন্যে খাস বিলেত থেকে খাঁটি সাহেব জ্যোতিষীরা আসতো। তারা কবে বিয়ে হবে, শাশুড়ী মারা যেতে পারে কি না, অদূর ভবিষ্যতে হোমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, বিপ্লবীদের হাতে নিহত হওয়ার আশঙ্কা, এমনকি জন সাহেবের মেমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ার ব্যাপারটা জন সাহেব আঁচ করছেন কি না ইত্যাদি হাজারো ব্যাপারে হাত গুনে বা ক্রিস্টাল বল দেখে জানিয়ে দিতেন।

সাধারণত এই সব সাহেব (মেমসাহেব জ্যোতিষীও ছিলো) যেদিন কলকাতায় আসতেন সেদিন কিছুটা প্রচারের আর কিছুটা গোছগাছের জন্যে সামান্য দু-চারজনের হাত দেখতেন পয়সা না নিয়ে।

সেবার এসেছেন ক্যাপটেন বিলি ইনার আই। সাহেব মেমদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এঁর নখদর্পণে। লণ্ডনে, নিউইয়র্কে হৈচৈ ফেলে কলকাতায় এসেছেন। জাহাজ থেকে নেমেছেন বোম্বাইতে,সেখানে কয়েক সপ্তাহ ভবিষ্যতের ঝড় তুলে কলকাতায়। প্রথম দিন হোটেলের ঘরে বিশ্রাম, সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ভাগ্যগণনা। হোটেলের স্থানীয় কর্মচারীরা কেউ কেউ আলাদা আলাদা বা দল বেঁধে এসে তাঁকে মুফতে হাত দেখিয়ে যাচ্ছে। তিনিও অল্পবিস্তর বলে যাচ্ছেন।

মাথায় কমদছাঁট চুল তার মধ্যে দীর্ঘ টিকি, পরনে খাকির পোশাক একটি লোক, হোটেলের কোনো কর্মচারী, সেও হাত দেখাতে এসেছে। দু-একজনের পরে ক্যাপ্টেন বিলি এরও হাত দেখলেন। একটা বড়ো আতসকাচ নিয়ে একবার ডানহাতের কররেখা আর একবার বাঁ হাতের কররেখা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, তারপর লোকটিকে বললেন, 'তোমার জীবনে অনেক আপস্ অ্যান্ড ডাউনস্ (ups and down) অর্থাৎ ওঠানামা আছে।' তিনি অবশ্য ইংরেজিতেই বললেন তবে পাশেই তাঁর দোভাষী বসে ছিলো, সে কিছুটা সাদা বাংলায় কিছুটা ভাঙা হিন্দিতে ভবিষ্যৎ জিজ্ঞাসু উক্ত টিকিধারীকে তার জীবনের ওঠানামার কথা জানালেন।

ফল যা ফললো সেটা মারাত্মক। লোকটি এই কথা শুনে প্রচণ্ড আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো, কারণ এর চেয়ে খাঁটি, এর চেয়ে সত্যি তার সম্পর্কে আর কিছুই হতে পারে না। কারণ সে হলো লিফটম্যান। তার শুধুই ups and downs—সারাদিন কেবলই ওঠা আর নামা।

চাকরিতে সে নতুন ঢুকেছে, কাজটা পাকাপাকি থাকবে কি না সে বিষয়ে তার মনে সংশয় ছিলো। এতটা যখন সাহেব বলতে পেরেছে, বাকিটুকুও নিশ্চয়ই পারবে। তাই সে আবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলো তার এই উত্থানপতন, পুনরাবৃত্ত আপস্ অ্যাণ্ড ডাউনস্ কতদিন চলবে।

এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাপ্টেন বিলি যথারীতি চিরাচরিত জ্যোতিষীসুলভ উত্তর দিয়ে আশ্বস্ত করলেন, 'না না, এই সামান্য মাস কয়েকের ব্যাপার। এই ইস্টারের পরেই আর আপস্

অ্যান্ড ডাউনস্ থাকবে না।'

সাধারণত এ ধরনের স্তোকবাক্যে সব ভাগ্য জিজ্ঞাসুরাই খুশি হয়। কিন্তু উত্থান-পতন, আপস্ অ্যান্ড ডাউনস্ থাকবে না জেনে এই টিকিধারী কেন এত মুষড়ে পড়লেন, গণৎকার সাহেবের সেটা কিছুতেই বোধগম্য হলো না।

লিফট সংক্রান্ত শেষ গল্পটি আমার নয়, আমি শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর কাছ থেকে চুরি করেছিলাম এবং তিনি এটা সদ্ব্যবহার করার আগেই আমার ডোডোতাতাই গল্পমালায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। দুটি শিশু অধীর প্রতীক্ষা করছে, সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে। তাদের বাবা আজ একটা লিফট নিয়ে আসবে। বাড়িতে কোথায় লিফট বসানো হবে, সে জায়গাটাও তারা ঠিক করে ফেলেছে।

কারণ আর কিছু নয়। আজ সকালে অফিস যাওয়ার সময় তাদের বাবা তাদের মাকে বলেছে, 'আজ হয়তো একটু তাড়তাড়ি আসবো, বড়সাহেব বলেছেন আজকে আমাকে একটা লিফট দেবেন।'

বলা বাহুল্য, তাদের বাবা যখন দিনের কাজের শেষে সন্ধ্যাবেলায় বড়সাহেবের গাড়ি থেকে শূন্য হস্তে নামলো শিশু দুটি ছুটে গেলো তাদের বাবার কাছে, 'বাবা বড়সাহেব তোমাকে লিফট দেয়নি ?'

বাবা সরলচিত্তে জবাব দিলেন, 'কেন দেবে না ? বড়সাহেবই তো নামিয়ে দিয়ে গেলেন।' ছেলে দুটি বললো, 'গাড়ি থেকে তুমি তো একা নামলে। বড়সাহেব তো লিফটটা নামিয়ে দেয়নি।'

হিমানীশের গল্পটা অবশ্য একটু অন্যরকম ছিলো। একদিন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর গাড়িতে নামিয়ে দেবেন বলে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আনন্দবাজার অফিসের সিঁড়ির পাশে লিফটের সামনে। হিমানীশ লিফটে করে উপরে উঠতে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে আমি বললাম, 'নীরেনদা লিফট দেবেন তাই দাঁড়িয়ে আছি।' হিমানীশ দ্রুত লিফট থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'ঠিক আছে। তাহলে নিয়ে যান।'

মদমত্ত

কয়েক বছর আগে মাতালের কাণ্ডজ্ঞান পাঠ করে এক সরল প্রকৃতির মদমত্ত পাঠক আমাকে প্রকৃত সুরাবিলাসী ধরে নিয়ে বিশেষ বিপাকে ফেলেছিলেন। সে কাহিনী অন্যত্র লিখেছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিদ্যাবুদ্ধির পৃষ্ঠায় আবার 'ইঁদুর ও মদিরা' লিখে একটু অসুবিধায় পড়ে গেছি। মদ যে খায় এবং মদ যে খায় না উভয়েরই মদের গল্পের প্রতি আসক্তি অতি প্রবল এবং সকলেরই জানা আছে অন্তত একটি না একটি কাহিনী, যেটা তাদের ধারণা মাতাল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প।

একটা খুব ভালো কাহিনী আমাকে শুনিয়েছেন এক প্রবীণ, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। তাঁর আদালতে অনেকদিন আগে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে তিনি পেয়েছিলেন। আগের দিন রাতে রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করার দোষে পেটি কেসে পুলিস পরদিন সকালে আদালতে চালান দিয়েছে।

ধুতিতে, পাঞ্জাবিতে ধুলো-কাদা মাখা, চোখের চশমার কাচ ভাঙা, কপালের কাছে কিছুটা ছড়ে গেছে কিন্তু আসামী অত্যন্ত নিরীহ ও ভদ্রপ্রকৃতির। হাতজোড় করে দোষ কবুল করলেন আসামী। আরো অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরও পঁচিশ টাকা জরিমানা হলো।

আদালতের নির্দেশ শুনে আসামী বিনীতভাবে প্রশ্ন করলো, 'হুজুর, এই যে পঁচিশ টাকা দেবো, এর একটা রসিদ পাবো তো?'

বিচারক একটু বিস্মিত হয়েছিলেন এই প্রশ্নে। তিনি বললেন, 'তা পাবেন না কেন?

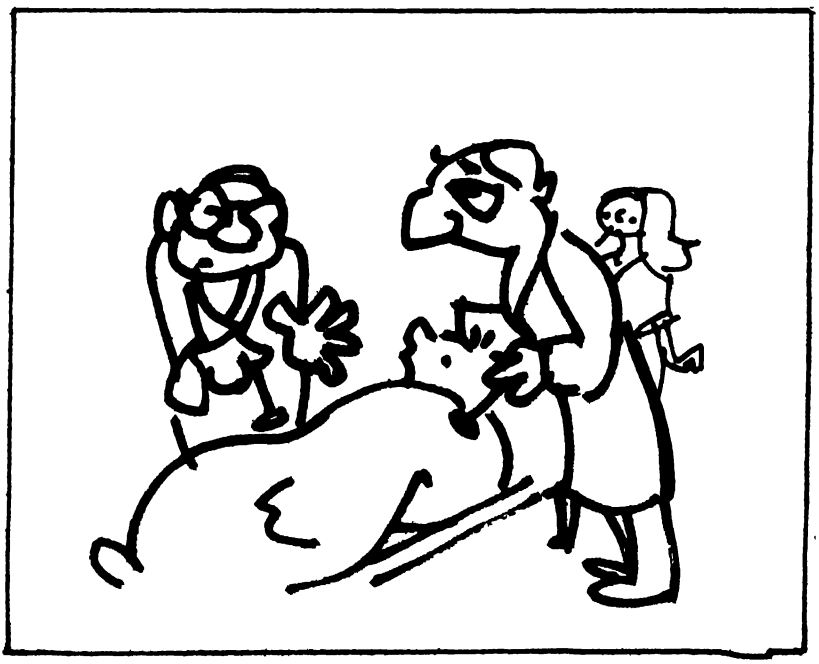

নিশ্চয়ই পাবেন।' তারপর একটু থেমে জানতে চেয়েছিলেন, 'কিন্তু আপনি এই রসিদটা দিয়ে কি করবেন ? কি কাজে লাগবে আপনার রসিদটা ?'

আসামী ভদ্রলোক অধিকতর বিনীত হয়ে বললেন, 'বাড়িতে নিয়ে বৌকে দেখাবো।' বিচারক আরও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার স্ত্রীকে আদালতের রসিদ দেখিয়ে কি করবেন ?' আসামী এবার পরিষ্কার করে বললেন, 'বৌকে রসিদটা দেখালে সে বুঝতে পারবে যে সব টাকাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দিইনি। কিছু টাকা অন্য কাজেও ব্যয় হয়েছে।'

সুরাপায়ীর জগৎ অত্যন্ত লম্বা এবং চওড়া। প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির, রাস্তাঘাট, বাজারহাট সর্বত্র তার অবস্থিতি। দিন ও রাতের যে কোনো সময়ে তাকে যে কোনো স্থানে আশা করা যেতে পারে। হয়তো সে সাতসকালেই মদ খায়নি কিন্তু গত রজনীর খোঁয়ারি সকালেও চলছে এবং বেলা বাড়তে বাড়তে সুরাবিলাসীর সংখ্যা রাত দুপুর নাগাদ তুঙ্গে পৌঁছাচ্ছে।

আদালতের কাঠগড়ায় প্রকাশ্য দিবালোক থেকে আমরা এবার একবার হাসপাতালের ওয়ার্ডে গভীর রজনীতে ঘুরে আসি। এক গুরুতর অসুস্থ রোগী বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছেন। তিনি আজকেই একটু আগে এই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন। দুদিক থেকে দুজন ডাক্তার তাঁকে দেখতে ঢুকেছেন। দুজনারই নৈশ ডিউটি, কিঞ্চিৎ টলছেন। টলতে টলতে রোগীর বিছানার দুপাশে এসে দুজনে দাঁড়িয়েছেন। তারপর দুজনেই প্রায় একসঙ্গে রোগীর চাদরের নিচে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নাড়ি দেখার জন্যে। রোগীর হাত চাপা পড়ে রয়েছে তার কাত হয়ে থাকা শরীরের নিচে। যা হোক একটু এদিক ওদিক করে দুই ডাক্তার চাদরের নিচে পরস্পরের কব্জির সন্ধান পেলেন এবং একজন অন্যজনের নাড়ি ধরে বসলেন নিজেদেরই অজান্তে।

তারপর দুজন ডাক্তার চাদরের নিচে পরস্পরের নাড়ি ধরে এরকম কথোপকথন করলেন—

'দারুণ মাতাল দেখছি।'

'খুব মদ খেয়েছে আজ।'

'সাত আট পেগ মদ খেয়েছে অন্তত।'

'তার চেয়েও বেশি হতে পারে।'

যত সব মাতালের কাণ্ড।'

'যত সব মাতালের কাণ্ড।'

এরপরের উপাখ্যানটি নির্জলা প্রভাত কালের, এক সরল মদ্যপের। ভদ্রলোকের সেদিন অফিস যাওয়া হয়নি। অবশ্য দোষ তাঁর নয়। একটা ছোট গোলমালের জন্য তিনি কাজে যেতে পারেননি।

আগের রাতে খুব মদ খেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সকাল বেলায়ও বেশ নেশা ছিল কিন্তু তবুও ঘুম চোখে অভ্যাসবশত অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। প্রথমেই দাড়ি কামানো। দাড়ি কামাতে গিয়ে গোল আয়নাটা তুলে নিয়ে তিনি দেখলেন আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না, নিজের কোনো ছায়া পড়ছে না। তখন তাঁর ধারণা হলো নিশ্চয়ই তিনি অফিসে চলে গিয়েছেন। বেলাও বেশ বেড়ে গেছে, এতক্ষণ তো অফিসে চলে যাওয়ারই কথা, আর সে জন্যেই আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। তবে অধিক বেলায় তাঁর এই ভ্রম সংশোধন হয়েছিলো, যখন তাঁর মনে পড়লো যে দাড়ি কামানোর আয়নার কাচটা

আগের দিনই ফ্রেম থেকে খুলে পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

অন্য এক সম্ভ্রান্ত মদ্যপকে জানি, যাঁর ভীষণ আত্মসম্মান বোধ। নতুন একটা পাড়ায় বাড়ি করে উঠে এসেছেন। আগের পাড়ায় মাতাল বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিলো। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতেন; পাড়ার লোক টিটকিরি দিতো।

নতুন পাড়ায় এসে ভদ্রলোক ঠিক করলেন আর টিটকিরি নয়, আর ধরা দেবেন না। এখনো তিনি সন্ধ্যার অনেক পরে, অনেকদিনই মধ্যযামে নেশাতুর অবস্থায় বাড়ি ফেরেন কিন্তু এ পাড়ার লোকে আর তাঁকে মাতাল বলে টিটকিরি দেয় না। ভদ্রলোক একটা চমৎকার বুদ্ধি বার করেছেন লোকে যাতে টলটলায়মান পায়ের ভিতরে পা অবস্থাটা ধরতে না পারে। নিজের গলির মুখে এসেই তিনি উল্টোমুখ হয়ে যান। এবার পিছন দিকে পা ফেলে ফেলে সন্তর্পণে বাড়ি ফেরেন। তাঁর এই পিছুহাঁটার ব্যাপারটা নতুন পাড়ার লোকেরা কয়েকদিনের মধ্যেই ধরে ফেলে। কিন্তু তারা তাঁকে মাতাল বলে টিটকিরি দেয় না, পাগল কিংবা উচ্চাঙ্গের রসিক ভেবে হাসাহাসি করে। নতুন পাড়ার অল্প বয়েসীরা ভদ্রলোককে আজকাল রসিকদা বলে ডাকে। তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে নতুন নামকরণ মেনে নিয়েছেন।

এই রসিকদা সম্পর্কে আরো একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। রসিকদার বিয়ের কিছুদিন পরেই রসিকদার স্ত্রী তাঁর স্বামীর গভীর মদ্যাসক্তির ব্যাপারটা অনুধাবন করেন। তারপরে যথারীতি, 'তুমি আর মদ খাবে না,' 'তুমি আবার মদ খেয়ে বাড়ি এলে আমার মরামুখ দেখবে,' ইত্যাদি নানা দেয়াল রসিকদাকে টপকাতে হলো। সহস্র অনুনয় বিনয়, রাগ-গোঁসা-ক্রোধ ইত্যাদি উপেক্ষা করে রসিকদা নিয়মিত গভীর রাতে টলটলে অবস্থায় বাড়ি ফিরতে লাগলেন।

তখন রূপালি পর্দায় সাহেব-বিবি-গোলাম সিনেমার খুব রমরমা চলছে। রসিকদার স্ত্রী অর্থাৎ রসিকবৌদি পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে সিনেমাটি কয়েকবার দেখেছেন। এবং এই সিনেমা থেকেই তাঁর মাথায় একটু চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেলো। সাহেব-বিবি-গোলামের নায়িকার মতো তিনিও মদ খাওয়া ধরবেন, স্বামীকে বাড়িতে আটকিয়ে রাখা যাবে। মদ খাওয়ার জন্যে আবার শিক্ষাও দেওয়া হবে। ঘরের বৌ মাতাল হলে যদি লোকটার হুঁশ ফেরে, মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে তো ভালোই।

রসিকদা এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলেন। সেই দিনই অফিস থেকে ফেরার পথে এক বোতল দু নম্বর ধেনো মদ কিনে আনলেন। সন্ধ্যাবেলা ঘরের মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে রসিকদা রসিকবৌদিকে মদ্যপানে হাতে খড়ি দিতে প্রস্তুত হলেন। মোড়ের পানের দোকান থেকে এক কেজি বরফ, দু বোতল সোডা ওয়াটার এনে স্বামী-স্ত্রী বেশ জমিয়ে বসলেন। রসিকদা খেয়াল করে রসিকবৌদিকে দিয়ে কয়েকটি বেগুনি ভাজিয়েছেন।

কিন্তু এক চুমুক মুখে দিয়েই রসিকবৌদি প্রচণ্ড একটা হেঁচকি তুললেন, তারপরে ক্রমাগত হিক্কা, হিক্কা আর হিক্কা। রসিকবৌদি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ, এই সাংঘাতিক জিনিস কি করে খাও তুমি ? আমার বুক জ্বলছে, মাথা ঘুরছে, বমি আসছে। তুমি কি আনন্দে এটা খাও। এই ছাইপাঁশ গেলো।' রসিকদা তখন মুখ খুললেন, 'তা হলে ভেবে দেখো। তুমি ভাবো আমি মদ খেয়ে খুব আনন্দে থাকি। তোমার এক চুমুক খেয়েই এই অবস্থা আর আমাকে দিনের পর দিন কত কষ্ট করে গেলাসের পর গেলাস এই জিনিস খেয়ে যেতে হচ্ছে।'

আবার মদমত্ত

এক দফায় মদমত্ত কুলোলো না। মাতাল কাহিনীর আদি অন্ত নেই, কুলকিনারা নেই, তাই আবার লিখতে হলো এই শেষ।

এই শেষ মদমত্তে সোবার নামে একটি শব্দের ব্যবহার করবো। শব্দটি ইংরেজি, সোবার অর্থাৎ sober, দুঃখের বিষয় বহু চেষ্টা করেও বাংলায় এর কোনো যথার্থ প্রতিশব্দ খুঁজে বার করতে পারিনি।

সোবার মানে শান্ত নরম বা বাধ্য নয়। চেম্বার্স বিশ শতকীয় এবং অক্সফোর্ড অভিধান সোজাসুজি সোবার অর্থে উভয়ে প্রথমে লিখেছে মাতাল নয়। 'মাতাল নয়' এই কথাটিতে কিন্তু কিছু স্পষ্ট হলো না, আসলে সোবার বলতে বোঝায় মদ খেয়েছে কিন্তু মাতাল নয়।

মাতাল আর সোবারের মধ্যে একদা এক সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছিলেন এক মদ্যপ, স্বয়ং তাঁর ভাষায়, 'আমি যখন মাতাল এবং বুঝতে পারছি আমি মাতাল, তখন আমি সোবার। আর যখন আমি মাতাল কিন্তু বুঝতে পারছি না আমি মাতাল,' তখন আমি মাতাল'।

জানি না মাতাল ও সোবারের এই ভেদাভেদ বিদ্যাবুদ্ধির সরলবুদ্ধি সাদামন সাদাচোখ পাঠক-পাঠিকাদের কতখানি বোধগম্য হলো। না হলে না হয়েছে, মাতাল বনাম সোবারের একটা অতি পুরনো ঘটনা বলি।

ঠিক ঘটনা নয়, এটি একটি বিয়ের সঙ্গে জড়িত। স্বীকার করি, আমার অন্য অধিকাংশ গল্পের মতোই এটিও আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। তার চেয়েও মারাত্মক গল্পটি সম্ভবত আমি নিজেই আরো একবার ব্যবহার করেছি।

তবু গল্পটি লিখছি, গল্পটি বড় রহস্যময়। গল্পটি এক ভদ্রমহিলার যিনি দেখতে সুন্দরী নন, যতটা সুন্দরী হলে পাণিপ্রার্থী পুরুষেরা ভিড় জমিয়ে ঘিরে থাকে। এই অনতি সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো এক ধনী মদ্যপের। ধনী ব্যক্তিটির মদ্যাসক্তি ছাড়া কোনো দোষ ছিলো না।

এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে উক্ত মদ্যপ ধনীটির বিয়ে হয়েছিলো প্রায় দশ বছর জানাজানির পর। কিন্তু বারবার বিয়ে ঠিক হতে হতে ভেঙে যায় আবার ভাঙতে ভাঙতে ঠিক হয়ে আসে। মেলামেশা চলছে, কিন্তু বছরের পর বছর যায়, বিয়ে আর হয়ে ওঠে না।

দুজনের বিয়ে হতে কেন এত দেরি হচ্ছিলো ? এ বিষয়ে ভদ্রমহিলার কন্যার জবানিতে ব্যাখ্যাটা এই রকম, 'আমার বাবা আর মার বিয়ে হওয়ার তো কোনো উপায়ই ছিলো না। বাবা মাতাল হলেই মা-কে বিয়ে করতে চাইতো। আর বাবা মাতাল হয়েছে বলে বাবাকে মা তখন বিয়ে করতে চাইতো না। আবার বাবার নেশা কেটে গেলে, বাবা যখন সোবার হতেন তখন মা বাবাকে বিয়ে করতে বিশেষ আপত্তি করতেন না, বরং রাজিই হতেন কিন্তু সাদা চোখে মাকে বাবার ভীষণ অপছন্দ, কিছুতেই বিয়ে করবেন না মাকে। সে এক মহা ঝামেলা, মিঞা যখন রাজি বিবি তখন গররাজি, বিবি যখন রাজি মিঞা তখন গররাজি।'

এই ভিসাস সার্কেল, এই বিষচক্রের কি করে অন্ত হয়েছিলো, কি করে এই দুজনের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়েছিলো সে এক দীর্ঘ কাহিনী, বিদ্যাবুদ্ধির পাতায় কুলোবে না।

মদের গল্প অনেক অনেক পুরনো। সভ্যতার সমান বয়েসী। মানুষের প্রাচীনতম বই ঋগ্বেদ, রমেশ চন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদে পড়েছি, মাতাল ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে, 'ইন্দ্র, তুমি মদ খেয়েছো (অর্থাৎ মাতাল হয়েছো), যাও এবার বাড়ি যাও, বাড়িতে তোমার বৌ

রয়েছে।' (৩ মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ৬ ঋক্)।

উপনিষদের ঋষি মদের ঘোরতর বিরোধী। মদ হলো পানের অযোগ্য, দানের অযোগ্য, গ্রহণের অযোগ্য, আদয়ম আপয়ম অগ্রাহ্যম।'

ইসলাম ধর্মে মদ্যপান মহাপাপ। শুধু পান নয়, যে এর রস নেয়, যে রস নেবার জন্যে নিযুক্ত, যে পান করে, যে বহন করে, যে পান করতে দেয়, যে বেচে, যে কেনে, যার জন্যে কেনে, তারা প্রত্যেকে অভিশপ্ত। হাদীস শরীফে আছে হজরত মুহম্মদকে এক ব্যক্তি বলেছিলো, 'আমি মদ ওষুধের জন্যে তৈরি করি।' হজরত বলেছিলেন, 'মদ ওষুধ নয়, মদই ব্যাধি।'

ধর্মের উপদেশ, শাস্ত্রের নিষেধ, সমাজের অনুশাসন, স্ত্রীর অশ্রুজল, প্রতিবেশীদের গঞ্জন, লোকনিন্দা সবকিছু উপেক্ষা করে তবু মানুষেরা মদ খেয়ে যাচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

মদ মানুষকে কি দেয়—জীবনের একঘেয়েমি থেকে ক্ষণিকের পলায়ন, মুহূর্তের বিস্মৃতি, তার ক্লান্ত, শ্রান্ত, অপমানিত জীবনে একটু প্রসন্নতার ছায়া। এক অফিসের কেরানীকে একজন বলেছিলো, 'তুমি মদ খেয়ে কেরিয়ার নষ্ট না করলে এতদিনে বড়বাবু হতে পারতে।' তখন সে বলেছিলো, 'কিন্তু বড়বাবু কেন, মদ খেলে আমার নিজেকে তো বড় সাহেব মনে হয়।'

এ সব বেদনার কথা যাক। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

তার চেয়ে রসিকবাবুর কথায় যাই। এর আগে 'মদমত্তে' রসিকবাবুর কাহিনী পাঠ করে কেউ কেউ তাঁকে চিনে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে এই সূত্রেই তাঁর সম্পর্কে আরো দু-চারটি কথিকা আমার কর্ণগোচর হয়েছে।

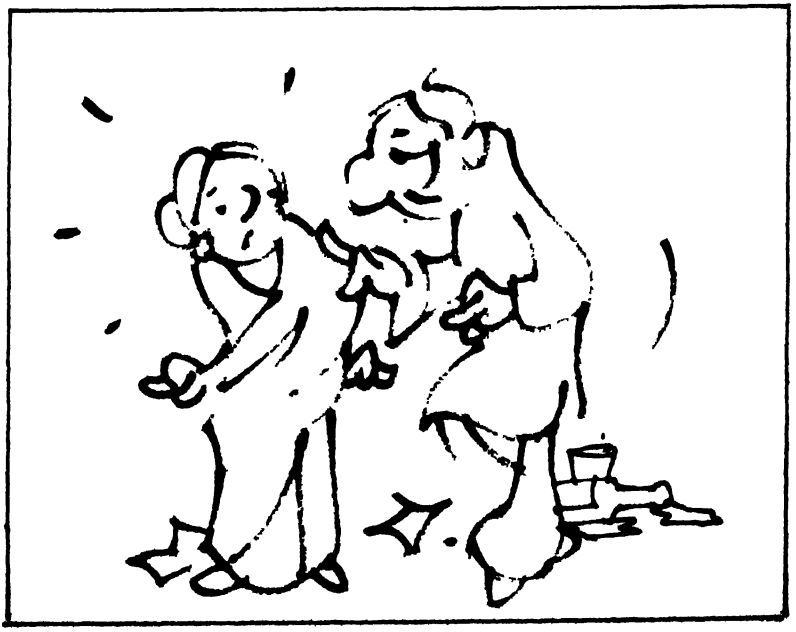

আমি মাত্র দুটি বলবো। তার মধ্যে আবার শেষেরটি হলো একটি শোকসংবাদ এবং সেই শোকসংবাদেই মদমত্ত কথামালার সম্পত্তি।

দুটি ঘটনার একটি রসিকবাবুর শেষ জীবনের, আর একটি জীবনশেষের।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রসিকবাবুব চাকরিতে উন্নতি হলো। হাতে পয়সা এলো। তখন বাংলা মদ ছেড়ে বিলাতি মদ মানে হুইস্কি, ব্রান্ডি এসব খাওয়া ধরলেন। তবে যে রকম হয়, মদে তাঁর শরীরের দফারফা হয়ে গিয়েছিলো, লিভার নার্ভ সবই বেসামাল।

রসিকবৌদি ডাক্তার ডাকলেন। এ সব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের যা কাজ ডাক্তারবাবু তাই করলেন, প্রথমেই বললেন, 'মদ একেবারে বন্ধ।' অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন রসিকবাবু, 'ডাক্তারবাবু, একেবারে ছাড়তে পারবো না। চল্লিশ বছরের অভ্যেস, একদম না খেলে পেট ফুলে ফেটে মরে যাবো।' রোগীর এই রকম মরিয়া অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঠিক আছে কিন্তু দেড় পেগের বেশি নয়।' কিন্তু দেড় পেগ নস্যি রসিকবাবুর কাছে, তিনি পুরো পাঁইটের খদ্দের। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে মাছের বাজারের দাম-দর শুরু হলো, 'দেড়-সাত, দুই-ছয়, আড়াই-পাঁচ এইরকম নেমে উঠে অবশেষে তিনে সাব্যস্ত হলো।

কয়েকদিন পরে রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে শুনে ডাক্তারবাবু রসিকদাকে দেখতে এলেন। তখন বেশ রাত হয়েছে। এসে দেখেন রোগীর পদপ্রান্তে মদের বোতল গড়াচ্ছে, রোগী মদে চুর হয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। তাঁর মাথাব কাছে সাশ্রুলোচনা রসিকবৌদি।

রসিকদার বিশেষ জ্ঞান নেই। ডাক্তারবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাতজোড় করে উঠে বসতে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে গেলেন। কোনোরকমে তাঁকে সাব্যস্ত করে মাথার নিচে একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে ডাক্তারবাবু রসিকবৌদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঁর এ অবস্থা হলো কি করে ?'

রসিকবৌদি জানালেন, 'সন্ধ্যা থেকে এক বোতল মদ খেয়েছে'। ডাক্তারবাবুর চোখ কপালে উঠলো, 'এক বোতল ? আমি না মাত্র তিন পেগ খেতে বলেছিলাম !'

বসিকবৌদি এবার বললেন, 'সেদিন আপনি তো তিন পেগ বলে চলে গেলেন। তারপর উনি চাকর পাঠিয়ে গলির মোড়ের মহেশ ডাক্তারকে ডাকলেন এবং মহেশবাবুর সঙ্গেও আপনার মতো দাম-দব করে তিন পেগ বরাদ্দ করিয়ে নিলেন। বিকেলের দিকে বাজারের রমেশডাক্তারকে ফোন করে আনালেন, আবার তাঁর সঙ্গে দাম-দর ধস্তাধস্তি, সেখানেও তিন পেগ বরাদ্দ হলো। তারপর থেকে আর আমার কথা গ্রাহ্য করছে না, কেবলই বলে ডাক্তারেরা আমাকে তিন ইনটু তিন নয় পেগ পথ্য বরাদ্দ করেছে। তুমি মূর্খ মেয়েছেলে, এর মধ্যে মাথা গলাচ্ছো যে। তোমার জন্যে মারা পড়বো না কি ? আমি মারা গেলে তোমার খুব ফুর্তি হবে, না ?'

শ্রীযুক্ত রসিক মদ্যপের কিন্তু সেবার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়নি। প্রাণে বেঁচে উঠেছিলেন। তবে ডাক্তার এরপর তাঁর মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন এবং তখনই তিনি মারা পড়েন, তবে সেটা মদ না খাওয়ার জন্যে নয়। ঘটনাটি বিয়োগান্ত তাই কালো বর্ডারে লিখছি।

শ্রীযুক্ত রসিক মদ্যপ ইহলীলা সংবরণ করেছেন। তিনি ডাক্তারের পরামর্শে মদ্যপান সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে কাঁধে তাঁর খুব ব্যথা হয়। ডাক্তার সেই ব্যথার জায়গায় অ্যালকহল লাগাতে বলেছিলেন। বহুদিনের পিপাসার্ত রসিকবাবু মাথা উলটিয়ে কাঁধের সেই অ্যালকহল জিব দিয়ে চাটতে গিয়ে ঘাড় ভেঙে মারা গিয়েছেন।

কাঠগড়ায়

কাঠগড়ায় মানে আদালতের কাঠগড়ায়।

কাঠগড়ায় দু'ভাবে যাওয়া যায়। সাক্ষী হয়ে অথবা আসামী হিসেবে।

হযবরল গল্পে সুকুমার রায়ের অবিস্মরণীয় ন্যাড়া একটা লোভে পড়ে বোকার মতো আসামী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, সাক্ষীরা পয়সা পাচ্ছিলো, ন্যাড়াটা বোকা, সে ভাবলো আসামীরাও বুঝি পয়সা পাবে। আসলে ঐ আশ্চর্য মামলায় শেষ পর্যন্ত কোনো আসামীই ছিলো না, ন্যাড়াকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আসামী দাঁড় করাতে না পারলে পুরো মামলাটাই পণ্ড হয়ে যেতো।

এই মামলার ঐতিহাসিক বিচারের ঘটনা সবাই জানেন। ন্যাড়ার তিন মাস জেল আর সাত দিনের ফাঁসি হয়ে গেলো।

তবে বাংলা সাহিত্যে অন্যায়ভাবে ফাঁসি ন্যাড়ারই যে প্রথম হয়েছে তা নয়, এর বহু আগে সেই আদিযুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভুবনের ফাঁসি দিয়েছিলেন। ভুবনের ফাঁসি হয়েছিলো চুরির অপরাধে। সামান্য চৌর্যবৃত্তির জন্য ফাঁসি হয় না, বড়জোর দু-পাঁচ বছর জেল হতে পারে, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র কি এটা জানতেন না ?

নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু, 'মাসী, তুমিই আমার ফাঁসির কারণ,' বিখ্যাত এই বাক্যটিতে মাসীর সঙ্গে ফাঁসির ধ্বন্যাত্মক মিলটুকুর জন্যেই বিদ্যাসাগর মহোদয় ভুবনকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

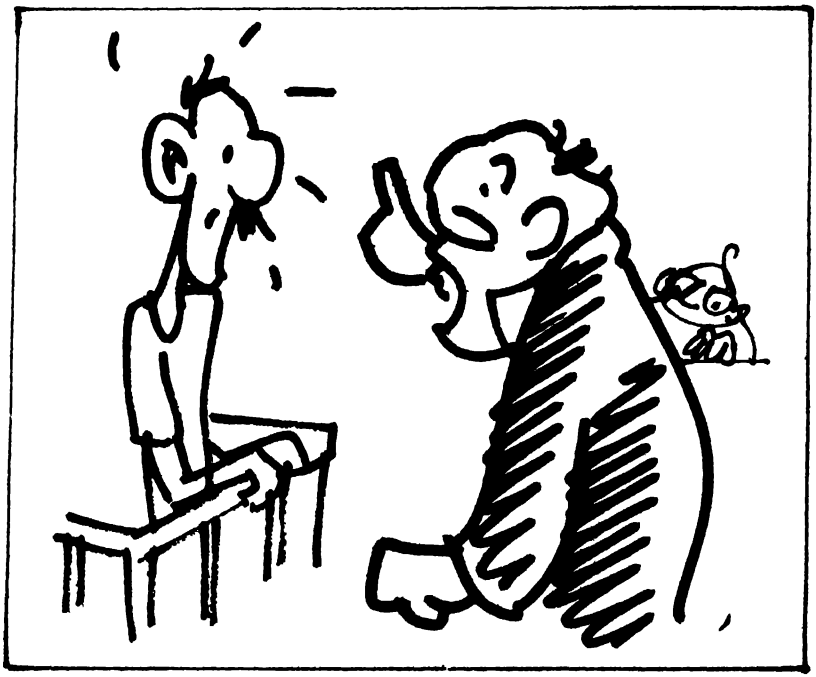

সুকুমার রায় অথবা বিদ্যাসাগর, ন্যাড়া বা ভুবনের প্রতি যতটা অন্যায় করেছিলেন আইন-আদালতের গোলকধাঁধায় প্রতিনিয়ত নিরীহ নাগরিক এর চেয়েও কঠিন অন্যায়ের সম্মুখীন হয়। বিচার ব্যবস্থায় অবিচার, এক অতি জটিল ও প্রাচীন সমস্যা। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদার কথা কবি বলেছেন, আমরা তার মধ্যে যাবো না। আমাদের সময় অল্প, জায়গা কম। আসুন এই দু'দণ্ড আমরা কষ্টেসৃষ্টে বিদ্যাবুদ্ধির পৃষ্ঠায় একটু হেসে নিই। তবে সাবধান, আদালতের মধ্যে হাসতে যাবেন না, আদালত অবমাননার অপরাধে অভিযুক্ত হলে সে বড়ো মারাত্মক ব্যাপার।

চলুন ঐ মফস্বল কোর্টের বটতলায় গিয়ে একটু দাঁড়াই। অনেকটা বাজার বা মেলার মতো। ইতস্তত বেশ কয়েকটা পান বিড়ি সিগারেটের দোকান, সিঙ্গাড়া মিষ্টি ইত্যাদি বিক্রি হচ্ছে আর কয়েকটা দোকানে। মাটির ওপরে মাদুর বিছিয়ে একজন লোক দাঁতের মাজন বেচার চেষ্টা করছে বিনা পয়সায় তাসের ম্যাজিক দেখিয়ে, তার চারপাশ ঘিরে রীতিমত ভিড়। ভিড়ের মধ্যে মাথা না গলালে বোঝাই যায় না যে ব্যাপারটা কি ? জুতো সারাইয়ের মুচি, নাপিত, হজমিগুলিওয়ালা এবং স্বপ্নাদ্য ওষুধের বিক্রেতারা আশেপাশেই রয়েছে।

একটু একপাশে সবচেয়ে বড় মিষ্টির দোকানটায় কয়েকটা বেঞ্চিতে বেশ কয়েকজন উকিলবাবু, মুহুরিবাবু, মক্কেল, সাক্ষী গিজগিজ করছে। একটা বেঞ্চির শেষপ্রান্তে বসে রয়েছেন এক জবরদস্ত উকিলবাবু, তাঁর সামনে হাত জোড় করে এক গোবেচারা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে। উকিলবাবু তাকে বলছেন, 'তোমার তা হলে চুরির মামলা। কিন্তু তোমার মামলার খরচ চালাবে কি করে ? আমাকেই বা কি দেবে ? তোমার টাকা-পয়সা কিছু আছে ?'

লোকটি অতি বিনীত ভাবে জানালো তার টাকা-পয়সা কিছুই নেই তবে একটা গরু আছে। উকিলবাবু বললেন, 'ঠিক আছে। তা হলে ঐ গরুটা বেচেই মামলার খরচপত্তর, আমার ফিস হয়ে যাবে।'

লোকটি এই প্রস্তাবে সম্মতি জানালো। এবার উকিলবাবু মামলাটা বোঝার জন্যে মক্কেলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা পুলিস তোমার নামে কিসের মামলা দিয়েছে ? কি চুরি করেছিলে ?'

লোকটি আরও কাঁচুমাচু হয়ে বললো, ঐ যে গরুটার কথা বললাম, ঐ গরু চুরির মামলা আমার বিরুদ্ধে।' এ মামলা উকিলবাবু নিয়েছিলেন কিনা এবং চোর আর গরুকে খালাস করিয়ে, তারপর গরু বেচে নিজের পয়সা আদায় করতে পেরেছিলেন কিনা সে খবর আমার জানা নেই।

এর চেয়েও বেশি বিপদে পড়েছিলেন বিলেতের এক বিচারক, যিনি আগে ব্যবহারজীবী ছিলেন। তাঁর কোর্টে এক ব্যক্তির বিচার হচ্ছিলো রাহাজানির মামলায়, আসামীকে দেখে জজসাহেবের কেমন চেনাচেনা মনে হয়, তিনি তাকে প্রশ্ন করেন, 'তোমার তো এর আগেও রাহাজানির মামলায় সাজা হয়েছিলো।' লোকটি বললো, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু সে আমার উকিলের দোষে।' বিচারক বললেন, 'উকিলের দোষ, সেটা বুঝবো কি করে ?' লোকটি করজোড়ে বললো, 'হুজুর, সে মামলায় আপনিই তো আমার উকিল ছিলেন।'

অন্য এক মামলার কথা লিখেছিলেন সৈয়দ মুস্তবা আলী। সে মামলায় আসামীকে দেখে বিচারক একটু রেগে গেলেন,'আজ পাঁচ বছরের বেশি হয়ে গেলো, বলতো কতবার আমার কাঠগড়ায় দাঁড়ালে ?' আসামী অম্লানবদনে বললো,'তা হুজুর আপনার যদি পাঁচ বছরেও প্রমোশন না হয় আমি তার কি করবো ? এর আগের হুজুরেরা সবাই তো দু' বছর-আড়াই

বছরের মাথায় প্রমোশন পেয়ে চলে যেতেন, শুধু আপনারই কিছু হচ্ছে না।'

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্‌সের ছেলে স্যার হেনরি ডিকেন্‌স্‌ জজিয়তি করতেন। একদিন এক দাগী আসামীকে সাজা দিতে যাচ্ছেন তখন কাঠগড়া থেকে লোকটি চেঁচিয়ে উঠলো, 'হেনরি, তুমি তোমার বাবার পায়ের নখের যুগ্যিও নও।' একটু থমকে গেলেন স্যার হেনরি, তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার বাবা সম্পর্কে কি জানো?' লোকটি দৃঢ়ভাবে বললো, 'আমি তাঁর বহু বই পড়েছি।' হেনরি বললেন, 'রেকর্ডে দেখেছি তুমি তো সব সময় হল্লা মারামারি গুণ্ডামি করে কাটাও। বই পড়ো কখন?' লোকটি বললো; 'জেলে থাকার সময় পড়েছি।' স্যার হেনরি ডিকেন্‌স্‌ নাকি মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'তোমাকে আবার জেল দিচ্ছি। বাবার বাকি বইগুলো এবার পড়ে শেষ করো।'

অনেকদিন আগে আমি একটা মফস্বল শহরে কিছুদিন ছিলাম। আমাদের পাশাপাশি দুই পাড়ায় ফুটবল খেলা, পুজো, ক্লাব এইসব নিয়ে খুব রেষারেষি। এই রেষারেষি সব সময় সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো না, অনেক সময় রীতিমত মারামারি হতো।

একবার ঐ মারামারি শেষ পর্যন্ত রক্তপাতে এসে পৌঁছালো। অবশেষে পুলিস, থানা, উকিল, মোক্তার অনেক হই-হল্লা করে ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত গড়ালো।

মামলার দিন কাঠগড়ায় উঠে আমাদের দিকের সাক্ষীরা, সবাই আমাদের পাড়ার লোক, নির্বিচারে সত্যমিথ্যা যা কিছু আমাদের পক্ষে যাবে হলফ করে তাই বলে এলো। কারো বাক্যে এক বিন্দুও নড়ন-চড়ন হলো না, অতি পাকা শেখানো সাক্ষীর মতো সব গড়গড় করে বলে গেলো।

বিপক্ষ দলের উকিলবাবু প্রমাদ গনলেন। তাঁর শেষ ভরসা আমাদের পাড়ার একটি দশ বারো বছরের ছোট মেয়ে, সেই হলো মূল সাক্ষী, স্টার উইটনেস। তার সাক্ষ্যের উপর পুরো মামলাটা নির্ভর করছে। মারামারির শেষ ঘটনাটা মাথায় লাঠি মারার ব্যাপারটা ঘটেছিলো ঐ মেয়েটির বাড়ির বারান্দার পাশে।

মেয়েটি কাঠগড়ায় হলফ নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বিপক্ষের উকিলবাবু প্রশ্ন করলেন, 'তুমি তো বাচ্চা মেয়ে, তুমি জানো, আদালতে যদি মিথ্যা কথা বলো, তাহলে কি হবে?' মেয়েটি একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'জানি'।

উকিলবাবু তার এই অদমিত ভাব দেখে ধমকে উঠলেন, 'কি জানো?' মেয়েটি অধিকতর নিঃশঙ্কভাবে উত্তর দিলো, 'তা হলে আমরা জিতবো আর আপনার পক্ষ হেরে যাবে।'

হারজিতের ব্যাপার এখানেই শেষ নয়। একবার এক জমিদার তাঁর ইংরেজি শিক্ষিত ম্যানেজার সাহেবকে কলকাতায় একটি মামলার তদ্বির করতে পাঠিয়েছিলেন। মামলার বিচারের ফল বেরোলে দেখা গেলো জমিদারবাবুই জিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার সাহেব ইংরেজি কেতায় টেলিগ্রাম পাঠালেন। 'Justice has triumphed' অর্থাৎ ন্যায়ের জয় হয়েছে।

এই তারবার্তা পেয়ে জমিদারবাবু কি বুঝলেন, কে জানে। ম্যা[illegible] তিনি তার করে জানালেন, 'তবে তো সর্বনাশ। শিগগির আপীল [illegible]।'

কাঠগড়ায় শেষ গল্পটি সিধেল চোরকে দিয়ে শেষ [illegible]।

বেকসুর খালাস হয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে এলো পা[illegible]চোর। উকিলবাবুর বুদ্ধিতেই সে খালাস পেয়েছে। আদালতের বারান্দা[illegible]জ্ঞতা জানিয়ে সে

উকিলবাবুকে বললো, 'আমি আপনার বাসায় যাবো।' উকিলবাবু চমকে উঠলেন, 'বাসায় ?' চোরটি উকিলবাবুর শঙ্কা মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারলো, 'ভয় পাবেন না স্যার, দিনের বেলায় যাবো।'

সুচিকিৎসা

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ডমরুচরিতেএক আশ্চর্য চিকিৎসার কথা লিখেছিলেন। সে কাহিনী যথেষ্ট বিস্তৃত, আমরা কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে এখানে একটু বলে নিচ্ছি।

ডমরুর জ্বর হয়েছে, কম্প জ্বর। বেচু কবিরাজকে খবর দেয়া হলো। বেচু জাতে কৈবর্ত্ত, আগে চাষ করতো। এখন কবিরাজ হয়ে বিলক্ষণ পসার হয়েছে। বেচু এসে ডমরুর নাড়ি ধরে শ্লোক পড়তে লাগলো,

"কম্প দিয়া জ্বর আসে
কম্প দেয় নাড়ি।
ধড়ফড় করে রোগী
যায় যমবাড়ি॥"

নাড়ি পরীক্ষা করার পর বেচু ডমরুকে বিষবড়ি দিলো। সামান্য বিষবড়ি নয়, একেবারে নতুন ওষুধ, সম্প্রতি সে নিজে মনগড়া করে প্রস্তুত করেছে।

ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে ডমরুর স্ত্রীর মনে যাতে কোনো সন্দেহ না থাকে সেই জন্যে বেচু নিজেও দুটো বড়ি খেয়ে নিলো।

বড়ি খাওয়ার তিন ঘণ্টা পরে ওষুধের গুণ প্রকাশিত হলো। ডমরুর চোখ লাল হয়ে উঠলো, বুক ধড়ফড় করতে লাগলো। প্রাণ যায় আর কি!

ডমরুর অবস্থা দেখে তাঁর বন্ধু আধকড়ি বেচুর খোঁজ করতে গেলেন। বেচু ঘরে ছিলো না। অনেক খুঁজে দেখা গেলো যে সে এক পানাপুকুরের জলে গা ডুবিয়ে বসে আছে। তারও চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। পানাপুকুরের পচা পাঁক তুলে সে মাথায় দিচ্ছে।

আধকড়ি বেচুকে বললেন, 'বেচু, তুমি ডমরুকে কি ওষুধ দিয়েছো ? তোমার ওষুধ খেয়ে ডমরু মারা পড়তে বসেছে।' মাথায় কাদা দিতে দিতে বাজখাঁই স্বরে বেচু বললো, 'বড়ি খেয়ে আমিই বা কোন ভাল আছি।'

চিকিৎসা-অচিকিৎসা-সুচিকিৎসার ছোট-বড় অনেক কাহিনী আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের এ গল্পটির কোনো তুলনা নেই।

অন্য ধরনের একটা আধুনিক গল্প এ মুহূর্তে মনে পড়ছে।

এক রোগী গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাতে, বিখ্যাত দিক্‌পাল ডাক্তার। রোগী ডাক্তারকে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, সন্ধ্যাবেলা বড় ক্লান্ত, অবসন্ন লাগে অথচ ঘুমও ভালো করে আসতে

চায় না।' ডাক্তারবাবু নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বললেন, 'আপনার কিছু হয়নি। রাতে শোয়ার আগে একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে শোবেন। ভালো হয়ে যাবেন।'

ছয় মাস পরে ঐ রোগী আবার একবার ঐ ডাক্তারবাবুকে দেখাতে এলেন। আবার ডাক্তারবাবু ভালো করে দেখলেন, তারপর বললেন, 'আপনার কিছু হয়নি। রাতে শোয়ার আগে বড় এক গেলাস জল খেয়ে শোবেন। ভালো হয়ে যাবেন।'

বিমূঢ় রোগী বললেন, 'কিন্তু মাত্র ছয় মাস আগে আপনি আমাকে শোয়ার আগে ব্র্যাণ্ডি খেতে বলেছিলেন, এখন বলছেন জল!' ডাক্তারবাবু মৃদু হাসলেন, তারপর নিশ্চিন্ত কণ্ঠে রোগীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চিকিৎসাশাস্ত্রের কি দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে আজকাল, জানেনই তো, ছয়মাস কেন, দু-তিন মাসের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়মিত বদলে যাচ্ছে।'

তা বদলাক, অনবরত বদলাক। মূল অসুবিধা হলো এই চিকিৎসাব বদলের খবর ডাক্তারদের মত বহু রোগীই রাখে। আজকাল বহু রোগীই এত ওয়াকিবহাল যে তারা শুধু ডাক্তারদের পক্ষেই বিপজ্জনক তা নয়, নিজেদের পক্ষেও বিপজ্জনক। অনেক রোগীই ডাক্তারের কাছে যায় নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী সে নিজের যে চিকিৎসা চালাচ্ছে তার প্রতি চিকিৎসকের অনুমোদন আদায় করতে। পেটেন্ট ওষুধের এই স্বর্ণযুগে যে কোনো ওষুধের দোকানে খোঁজ নিলেই জানা যাবে যে তাদের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ অর্থাৎ চার ভাগের তিন ভাগ ওষুধ বিক্রি হয় প্রেসক্রিপশনের বাইরে, অর্থাৎ অসুস্থ ব্যক্তি নিজের খেয়াল ও মর্জিমত ওষুধ কেনে যতক্ষণ পর্যন্ত রীতিমত মরণাপন্ন না হচ্ছে।

ডাক্তারি বিদ্যার সবচেয়ে ভালো সময় ছিলো গত শতাব্দীর শেষ আর এই শতাব্দীর শুরুতে। সেই সময় চিকিৎসকেরা আর অনুমানে চিকিৎসার মধ্যে যাচ্ছেন ; , চিকিৎসাশাস্ত্র

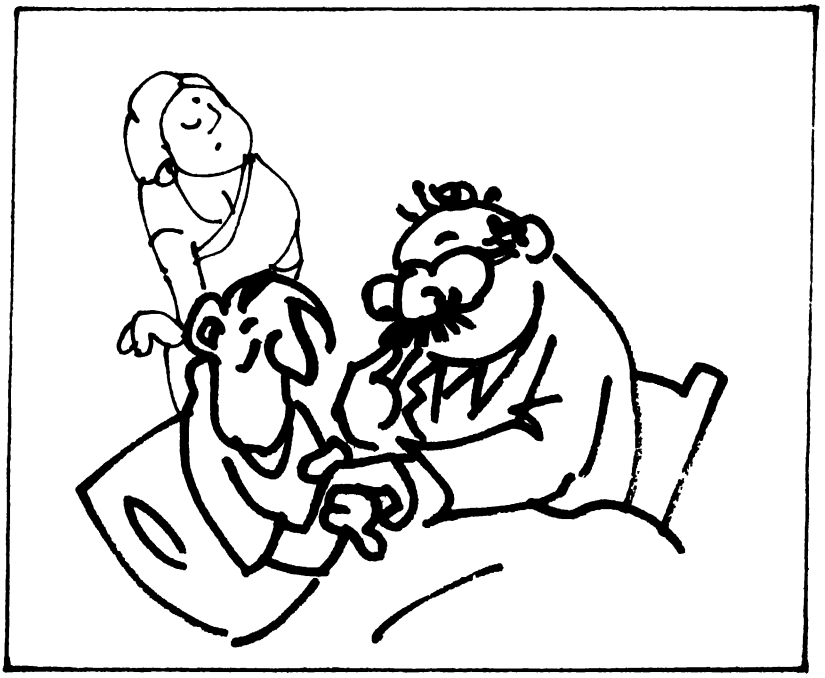

শারীরবিদ্যা মোটামুটিভাবে চিকিৎসক সমাজের আয়ত্তে এসে গেছে কিন্তু রোগীরা তখনো কিছু জানতে পারেনি। তারা চিকিৎসকের ব্যবস্থার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এরপর ধীরে ধীরে সবাই সব কিছু জানতে লাগলো, রক্ত পরীক্ষা, এক্স-রে, অ্যান্টিবায়োটিক সকলের হাতের আমলকি হয়ে গেলো। রক্তে চিনি বা ইউরিয়ার অনুপাত নিয়ে বহুলোক এমন ভাষায় কথা বলে যা তিরিশ-চল্লিশ বছর আগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিষয়বস্তু ছিলো।

বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে একটু গুরুগম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। ত্রৈলোক্যনাথ দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম, হালকা কথাতেই ফিরে যাই।

প্রথমে আমার নিজের ডাক্তার সাহেবের কথা বলে নিই। তিনি এই শহরের একজন কৃতবিদ্য চিকিৎসক, গভীর রাত পর্যন্ত ধনকুবের, ডাকসাইটে আমলা, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে আর অভিজাত গৃহিণীকুলে তাঁর চেম্বার গমগম করে। বিশেষ প্রয়োজনে ছয় মাস বছরে তাঁর কাছে একবার যাই। এই বিশেষ প্রয়োজনটা হলো দু'রকম। প্রথম হলো, চিকিৎসার প্রয়োজন, দ্বিতীয় বিশ্রাম। অফিসে-বাড়িতে চাকরি করে, সাহিত্য করে, আড্ডা দিয়ে, সামাজিকতা করে, বাজার করে, নিজের ছেলে পড়িয়ে আমার কোনো বিশ্রাম জোটে না। শুধু কালেভদ্রে চার ঘণ্টা, আমার ডাক্তারের চেম্বারে আমার বিশ্রাম জোটে। যত অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই যাই ডাক্তার সঞ্জয় সেনের ওখানে আমাকে চার ঘণ্টা বসে থাকতে হয় এবং বহুদিন পর ঐ চার ঘণ্টা নিথর বিশ্রামে আমি ভালো হয়ে যাই, ডাক্তার সেন যখন দেখেন তখন আমার ক্লান্তি নেই, উত্তেজনা নেই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি আমাকে 'ভেরি গুড' সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দেন।

এবার চিকিৎসা বিষয়ে একটা অতি পুরনো গল্প বলি। গল্পটা যদিও অনেকেরই জানা কিন্তু এত ভালো যে আরেকবার বলা যায়।

এক ব্যক্তির গরু হারিয়েছে। সারাদিন ধরে সে বনে-বাদাড়ে, মাঠে-ঘাটে, ঝোপ-জঙ্গলে গরু খুঁজেছে। তার হাঁটু ছড়ে গেছে, গোড়ালি কেটে গেছে, সারা শরীর বুনো কাঁটায় রক্তাক্ত। সে এলো ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু তাকে দেখলেন, দেখে দুটো ট্যাবলেট দিলেন, বললেন রাতে খেয়ে উঠে খেয়ে নিতে।

পরদিন সাতসকালে সেই রোগী এসে আবার হাজির, সে রীতিমত উত্তেজিত, 'ডাক্তারবাবু, আপনি সাক্ষাৎ দেবতা, আপনার ওষুধের কি গুণ।' এরকম প্রশংসা শুনে ডাক্তারবাবু যথেষ্টই বিচলিত হলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ব্যাপারটা কি, ব্যথা-বেদনা সব সেরে গেছে!' রোগী যা বললো সে এক তাজ্জব বৃত্তান্ত, 'কাল রাতে শোয়ার আগে যেই ট্যাবলেট দুটো খেয়েছি, অমনি শুনি ঘরের পিছনে উঠোনে হাম্বা-হাম্বা ডাক। ছুটে গিয়ে দেখি, ঠিক তাই, ওষুধটা খাওয়ামাত্রই গরুটা ফিরে এসেছে। আর এরপর কি গায়ে ব্যথা থাকে। ব্যথাও সেরে গেছে।'

তাঁর ওষুধের এই অত্যাশ্চর্য গুণ দেখে সেই ডাক্তারবাবু কতটা খুশি হয়েছিলেন সেটা অবশ্য বলা কঠিন।

চিকিৎসা সম্পর্কে অন্য একটা গল্প বলি, মার্কিনি গল্প। যথারীতি একটু সোভিয়েত বিরোধী। এক আমেরিকান শল্য-চিকিৎসক গেছেন মস্কোয় এক হাসপাতালে। সেখানে

তিনি নানারকম অপারেশন দেখছেন, সমস্তই ঝকঝকে, তকতকে, সুচিকিৎসার অতি ভালো বন্দোবস্ত।

আমেরিকান ডাক্তার এক অপারেশন থিয়েটারে দেখলেন এক রোগীর কানের নিচে বিরাট অংশ কেটে নিয়ে ডাক্তাররা অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে একটা বিরাট অপারেশন করছেন। তিনি রাশিয়ান ডাক্তারদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কিসের অপারেশন হচ্ছে? রোগীর কানে কি হয়েছে?'

স্বল্পভাষী রাশিয়ান ডাক্তার জবাব দিলেন, 'এর কানে কিছু হয়নি।' মার্কিনী চিকিৎসক বললেন, 'তা হলে?' এবার রাশিয়ান ডাক্তার জানালেন, 'রোগীর গলার টনসিল অপারেশন হচ্ছে।' আমেরিকান ডাক্তার বেশ অবাক হলেন, 'তা গলার টনসিল, এঁর কান কাটছেন কেন?'

রাশিয়ান ডাক্তার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তারপর নিচু গলায় বললেন, 'জানেন না, আমাদের এখানে মুখ খোলা বারণ। কাউকেই কোনো কারণেই মুখ খুলতে দেয়া হয় না। তাই আমরা কানের পিছন দিক দিয়ে টনসিল অপারেশন করি।'

তাস

তাস অর্থাৎ তাসখেলা সম্পর্কে কিছু লেখার কোনো নৈতিক অধিকার আমার নেই। তাস খেলতে আমি পারি না, আইনকানুন কিছু কিছু জানি কিন্তু খেলাটা আমার আসে না; আর অতক্ষণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে বসে থাকার চরিত্র আমার নয়।

এ বিষয়ে লিখিত প্রমাণ আছে। শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একবার লিখেছিলেন, 'একে তো বাজখাঁই গলা—কোনো রকম ভদ্রতা-সভ্যতার ধার ধারতো না তারাপদ,...আমাদের তাস খেলায় সেভেন নো ট্রামপস ডেকে হেসে উঠলো হো হো করে।'

এখানে তাস খেলা মানে ব্রিজ খেলা, তাস খেলা বলতে সাধারণত ব্রিজ খেলাকেই বোঝায়। যাঁরা ব্রিজ খেলা জানেন না, তাঁদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি ব্রিজ খেলায় নিলামের মত ডাকতে হয়, যে পক্ষ সর্বোচ্চ ডাক দেয় খেলায় তারাই কর্তৃত্ব করে। বলা বাহুল্য সুনীল-কথিত ঐ সেভেন নো ট্রাম্পস হলো সর্বোচ্চতম ডাক। আমার তাসের হাত যতই খারাপ হোক, চিরদিনই আমার সর্বোচ্চ ডাকের দিকে ঝোঁক। আমার স্বভাবেরই দোষ, উপনিষদের আপ্তবাক্য মেনে নিয়ে আমার অল্পে সুখ নেই।

এই সর্বোচ্চ ডাক ডাকতে গিয়ে জীবনে আমি বহু বন্ধু হারিয়েছি। তাস খেলায় কেউ আমার পার্টনার হতে চায় না। আবার কেউ কেউ আমার নির্বুদ্ধিতাকে গালাগাল করবার জন্যে আমার পার্টনার হয়।

তবে তাস খেলা এমনিই ব্যাপার যে বিপক্ষ দুর্বল বা বোকা হলে খেলা জমে না। সে রকম খেলা জিতে মোটেই সুখ নেই। ফলে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের লোকেরাও চিরকাল বিরক্ত হয়ে আমাকে গালাগাল করেছেন, 'কি করে হরতনের গোলামটা এখানে দিলেন, কেন

ট্রাম্প করলেন না, কি করে যে সাতটা নো ট্রাম্পস্ ডাকলেন,' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই শতকের প্রথম ভাগের এক বাঙালী মনীষীর তাস খেলার উপর খুব রাগ ছিলো। অবশ্য তাঁর রাগ ছিলো আলস্য, অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা, কর্মবিমুখতা, চা পান ইত্যাদি বাঙালীর নানা চরিত্র দোষের উপরে। তার মধ্যে তাস খেলাও একটি। তাঁর বক্তব্য ছিলো, স্টিমার ডাঙায় আটকে না গেলে তাস খেলার কোনো মানে হয় না।

স্টিমার ডাঙায় আটকানোর ব্যাপারটা এ কালের পাঠক-পাঠিকা নাও বুঝতে পারেন। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এমন কি পশ্চিমবঙ্গে তখন যাতায়াতের প্রধান ভরসা ছিলো স্টিমার, লঞ্চ, নৌকো ইত্যাদি জলযান। নৌকোর কথা আলাদা, স্টিমার, লঞ্চ এগুলো নদীর জলের নিচে ওঠা অদৃশ্য চড়ায় অনেক সময় আটকে যেতো, উদ্ধাব পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতো। সেই কর্মহীন অবকাশে কেউ যদি সতরঞ্চি বিছিয়ে তাস পেটাতে বসে তা হলে বলার কিছু নেই, কিন্তু অন্য কখনো কাজ ফেলে তাস খেলা মোটেই বরদাস্ত হবে না।

এক ভদ্রমহিলা তাঁর স্বামীর তাসপ্রেম মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। ভদ্রলোকও তাস বলতে অজ্ঞান, সন্ধ্যার পর অফিস ছুটি হতেই তাসের আড্ডায়। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত তাস খেলা, অনেকদিন রাস্তায় ট্রাম-বাস, গাড়ি-ঘোড়া সব বন্ধ হয়ে যায়। তখন দু মাইল আড়াই মাইল নির্জন রাস্তায় বাড়ি ফেরা।

একদিন ঐরকম ঘোর রাতে বাড়ি ফেরার পথে দুই ব্যক্তি ছোরা দেখিয়ে তাঁর হাতঘড়িটি ছিনিয়ে নিলো, সঙ্গে খুচরো দুচার টাকা যা ছিলো সেটুকুও। এতকাল স্ত্রীর গালাগাল অপমানে যা হয়নি এই এক ধাক্কাতেই ভদ্রলোক তাঁর তাস খেলা ছেড়ে দিলেন। স্ত্রী দেখলেন মন্দের ভালো হয়েছে, ঘড়ি, টাকাপয়সা যায় যাক,তাস খেলা তো দূর হয়েছে, স্বামী

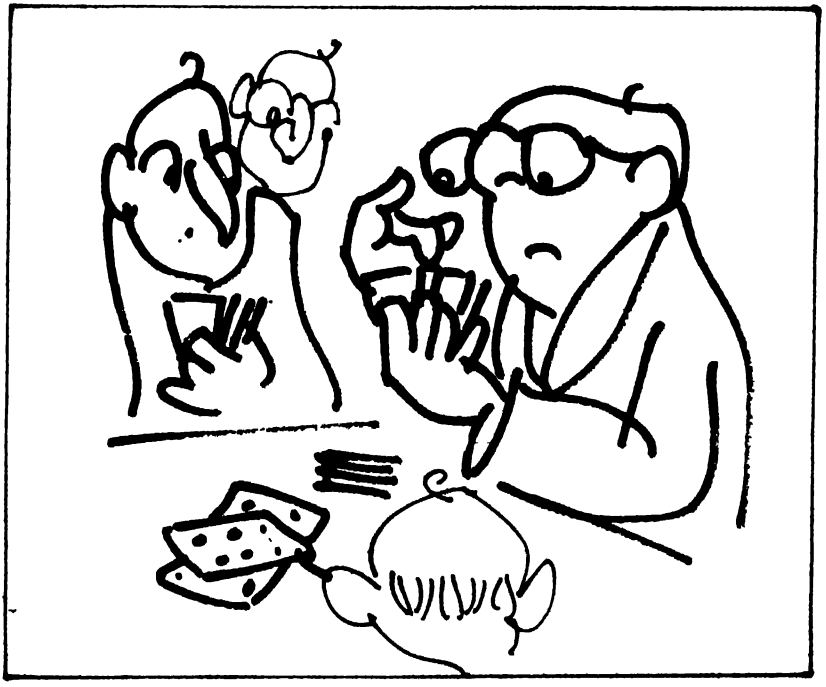

বাড়ি ঠিক সময়ে ফিরছে।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ স্বামী রাতে বাড়ি ফিরলেন না। ভোর বেলা বাসায় ফিরে দেখেন স্ত্রী বাইরের ঘরে সারারাত জেগে বসে রয়েছেন, তাঁর রণচণ্ডিনী মূর্তি। স্বামীকে দেখামাত্র তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'তুমি আবার তাস খেলা আরম্ভ করেছো। আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন।'

স্বামী বেচারী করজোড়ে বললেন, 'আরে না। না গিন্নি, তাস খেলিনি। মা কালীর দিব্যি নিচ্ছি তাস খেলিনি। আমার বন্ধুদের ফোন করে দ্যাখো, সত্যি তাস খেলিনি।'

গৃহিণী চোখ পাকিয়ে বললেন, 'তাস খেলোনি ? আমি তোমাকে আর তোমার তাসুড়ে বন্ধুদের মোটেই বিশ্বাস করি না।' ভদ্রলোক ঢোঁক গিলে বললেন, 'না, না বন্ধুদের ব্যাপার নয়। দাঁড়াও তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। আমি যে শেয়ার ট্যাক্সিতে আসি সেই ট্যাক্সিতে প্রায় প্রতিদিনই এক মহিলা আসেন। অনেকদিন পাশাপাশি বসি। সব থেকে শেষে নামি আমি। আর তার ঠিক আগেই নামেন তিনি। পাশাপাশি বসে এসে, আমাদের ভালোই আলাপ পরিচয় হয়েছে। তা কাল হলো কি, ঐ মহিলা, মিস জলি, নামার সময় হঠাৎ আমাকেও নামতে বললেন। কি আর করি নামলাম, মিস জলি বললেন, তাঁর নাকি জন্মদিন। গেলাম তাঁর বাড়িতে। বাসায় আর কেউ নেই। তিনি আমাকে বসিয়ে রেখে হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তারপর দেখি কয়েক প্যাকেট চীনে খাবার আর এক বোতল ব্রাণ্ডি নিয়ে এসেছেন। কি আর করি অনুরোধে পড়ে তাঁর সঙ্গে খাবার আর মদ খেতে হলো। মদ খেতে খেতে আর কিছু মনে নেই। সকালবেলা এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে দেখি মিস জলির বিছানায় শুয়ে আছি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে চলে এসেছি।'

স্ত্রী বেচারা যথেষ্ট সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের সঙ্গে এতক্ষণ এই গল্প শুনছিলেন, এবার বললেন, 'ওসব জলি ফলি জানি না, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো তাস খেলো নি।'

অবশ্য এরকম তাস খেলার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ তাসের জুয়া। স্বর্গীয় অদ্বৈত মল্লবর্মনের বিখ্যাত উপন্যাসটির নামে সুর মিলিয়ে কে যেন একবার রসিকতা করেছিলেন, 'তিতাস একটি খেলার নাম।' তিতাস মানে তিন তাস, মানে ফ্ল্যাশ খেলা, যা পুরোপুরি জুয়া।

তাস খেলা সম্পর্কিত যা কিছু প্রচলিত রসিকতা তার অধিকাংশই তাসের জুয়া নিয়ে।

প্রথমে একটি গার্হস্থ্য গল্প বলে নিই। প্রৌঢ়া মা, খুব বেশিদিন বিয়ে হয়নি ছেলে এবং সেই ছেলের বউ। একদিন ছেলের বউ বাড়ি নেই, সেই অবসরে মা ছেলেকে ধমকাচ্ছেন, 'ছি, ছি, খোকা তুই কি ! তুই বউমাকে তাস খেলা শিখিয়েছিস, তাও শুধু তাস খেলা নয়, তাসের জুয়া ধরিয়েছিস ?' খোকা বললো, 'মা, কোনো উপায় ছিলো না।' মা বললেন, 'মানে ?' খোকা বললো, 'মা, তোমার ছেলের বউ একটি পাকা চোর। পকেটে যা টাকাপয়সা থাকে সব চুরি করে।' মা বললেন, 'স্বামীর টাকা বউ নিলে চুরি হয় না।' খোকা বললো, 'ঠিক তাই। বউয়ের টাকা স্বামী নিলে সেটা জুয়া হয় না। বউকে জুয়া খেলা শিখিয়েছি। যত টাকা চুরি করে সব টাকা জুয়ায় হারিয়ে উদ্ধার করে নিই। একেবারে সমান-সমান।'

তবে সব সময় জুয়ায় হারানো এত সোজা নয়। এক বিখ্যাত জুয়াড়ি সম্পর্কে একবার একজন বলেছিলো, 'উনি তাসের জুয়ায় এতো জেতেন কিন্তু ঘোড়দৌড়ের রেসে একদম সুবিধা করতে পারেন না কেন ?'

কেউ এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি, শুধু সেই খ্যাতনামা জুয়াড়ির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেছিলো, 'ও তাসগুলোকে যেভাবে শাফ্‌ল করে সেভাবে ঘোড়াগুলোকে শাফ্‌ল করতে পারলে দেখতে রেসের সব বাজিই ও মাত করতো।'

এবারের শেষ গল্পটিও, দুঃখের বিষয়, তাসের জুয়া নিয়ে। খারাপ ব্যাপার সংক্ষিপ্ত করাই ভালো।

জুয়ার আড্ডায় নানা রকম কারচুপি হয়। এবং সে কারচুপি মেনে না নেওয়া সাধারণ খেলোয়াড়দের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। জুয়ার আড্ডার মহাজন নিজেও তাস খেলছিলেন, হঠাৎ হাতের তাস ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'এভাবে খেলা চলবে না। ভীষণ জোচ্চুরি হচ্ছে। আমি যেভাবে শাফ্‌ল করে তাস সাজিয়েছিলাম, সেভাবে আমার হাতে তাস আসে নি।'

সুতরাং, সাধু সাবধান ! মার্ক টোয়েনের কথা মনে রাখবেন। মহাত্মা টোয়েন বলেছিলেন, মানুষের জীবনে দু অবস্থায় জুয়ায় যাওয়া উচিত নয়, যখন তার হাতে টাকা নেই আর যখন তার হাতে টাকা আছে।'

আবার ডাক্তার

বিদ্যাবুদ্ধির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। মাঝে-মধ্যেই বেসামাল হয়ে পড়ছে। আবোল তাবোল বকছে। একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব যেন। আবার ডাক্তার ডাকা যাক্।

সামান্য ক্রীড়াকৌতুকের জন্যে মাননীয় ডাক্তারবাবুদের এভাবে বারবার আহ্বান করাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া বিদ্যাবুদ্ধির লেখকের ডাক্তার-অন্ত প্রাণ। তার দুর্বল হৃদয়, চঞ্চল স্নায়ু এবং সচ্ছল আকারের কথা কে না জানে, এবং তিনটি ব্যাধির জন্যে তাকে অনবরত ডাক্তারের মুখাপেক্ষা থাকতে হয়।

তবুও গোটা কয়েক ভালো গল্প হাতে এসে গেছে চিকিৎসকদের নিয়ে, না লিখে রাখলে ভুলে যাবো, এই ফ্যাকাসে কলমের এখনো যে কয়েকটি প্রশ্রয়পরায়ণ, সদাশয় পাঠক-পাঠিকা টিকে আছেন তাঁদের প্রতি যথার্থই অন্যায় করা হবে।

প্রথম গল্পটি মর্মান্তিক, শুনেছি একজন সদ্যমুকুলিতা ডাক্তারের কাছে। মেয়েটি ডাক্তারি পাশ করে কলকাতার কোনো এক হাসপাতালে ইনটার্ন। আমাকে একটি দুর্ঘটনার গল্প সেই নবীনা ডাক্তার বলেছিলো। তিনজন বন্ধু মোটরগাড়িতে করে প্রমোদভ্রমণে গিয়েছিলো, হঠাৎ পথের দুর্ঘটনায় তিনজনেই মারা যায়। এরা তিনজনের একজন কলকাতারই একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার, অন্যজন অধ্যাপক আর তৃতীয়জন ব্যবসায়ী।

মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে পৌঁছাতে প্রথম ব্যক্তি যখন চিত্রগুপ্তকে আত্মপরিচয় দিলো, চিত্রগুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'ও তুমি কলকাতার হাসপাতালে ডাক্তার ছিলে, সেখানে ডাক্তারি পড়েও ছিলে ; বা বেশ বেশ ! তা যাও ঐ ডানদিকের পারিজাতভবনের মধ্য দিয়ে স্বর্গে চলে যাও।'

ডাক্তারবন্ধুর পিছে পিছে চিত্রগুপ্তকে কোনো কিছু না বলেই অধ্যাপক ও ব্যবসায়ী যখন স্বর্গের পথে পা বাড়িয়েছে, চিত্রগুপ্ত তখন আটকিয়ে দিয়ে বললো, 'আরে তোমরা যাচ্ছো কোথায় ?' অধ্যাপক ও ব্যবসায়ী বললো, 'হুজুর, ইহজীবনে আমরা পরমবন্ধু ছিলাম। আমাদের তিনজনেরই কর্মফল একই হবে। একই ধরনের কাজকর্ম আমরা করেছি। ডাক্তার যদি স্বর্গে যায়, আমরাও যাবো।'

চিত্রগুপ্ত তখন জেনে নিলো এরা দুজন কে কি করে। তারপরে জানালো, 'দ্যাখো, তোমাদের তিনজনেরই অনেক পাপ আছে। তিনজনকেই নরক বাস করতে হবে। তবে তোমাদের ডাক্তারবন্ধু তো কলকাতার মেডিক্যাল কলেজের হাসপাতালে ছাত্র আর ডাক্তার ছিলো, তার নরকভোগ ইহজীবনেই হয়ে গেছে। তাই সরাসরি স্বর্গে গেলো। তোমাদের তো তা হয়নি, তোমাদের নরকে যেতেই হবে।'

ইনটার্ন ডাক্তারিকার এই গল্পটি অবশ্যই সত্যি নয়, কিন্তু এর সারমর্মটি মারাত্মক। এবার এক প্রবীণ ডাক্তারের গল্প বলি।

সেই যে এক বৃদ্ধ ডাক্তার। এক শীতবৃষ্টির মহা দুর্যোগময় গভীররাতে কল পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বাবা, তোমরা কি ভিজিট দিতে পারবে ?' যখন ওপ্রান্তের থেকে ফোনে জানালো, 'পারবো ;' তিনি বলেছিলেন, 'তা হলে আর আমার মত বুড়োমানুষকে নিয়ে টানাটানি করো না।'

এ গল্প বোধহয় একদা বলেছি। এবার এই বৃদ্ধ ডাক্তারের পরের কাহিনীটি বলছি।

সেও এক মহা দুর্যোগের রাত। মহীয়সী খনা বলেছিলেন, যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ। সেই ধন্য রাজার পুণ্য দেশে এক মাঘের মধ্যরাতে অঝোর বৃষ্টি,

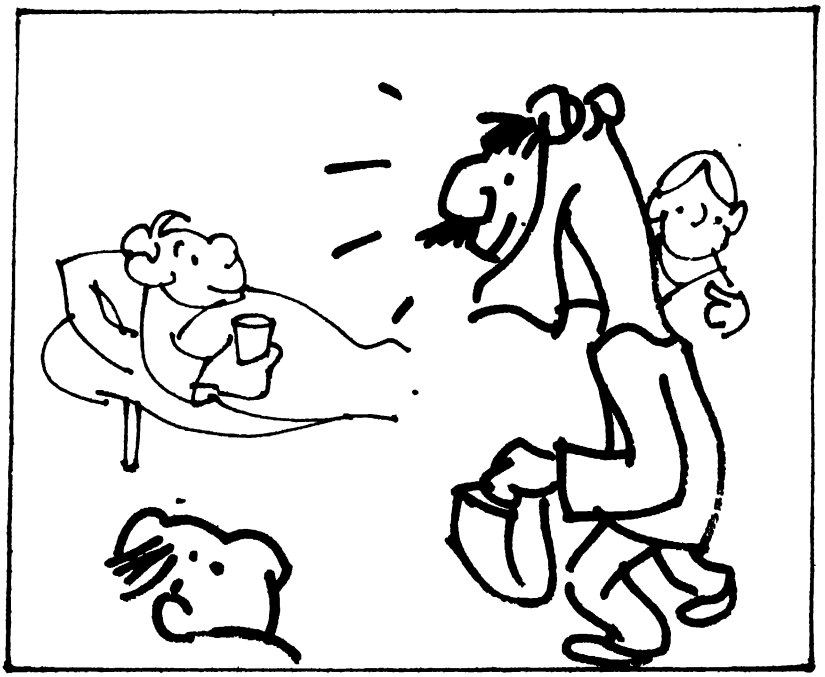

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া.। বৃদ্ধ ডাক্তার লেপ মুড়ি দিয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এমন সময় নিয়তির মত টেলিফোন বেজে উঠলো, ক্রিং ক্রিং ক্রিং। বেশ কিছুক্ষণ বাজার পর ডাক্তারবাবুর ঘুম ভাঙলো, তিনি জড়ানো চোখে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে ফোনটা ধরলেন। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। এই দুর্যোগের ক্ষণে তাঁর এক রোগী মরমর তারই বাড়ি থেকে ফোন এসেছে।

হিপোক্রেটিক ওথ নামে একটা প্রাচীন ব্যাপার আছে ডাক্তারবাবুদের, মাঝে মধ্যে বিবেকের একপাশে সেটা একটু পোকার মত নড়াচড়া করে, এবং বহু ডাক্তারের বহুরকম দুঃখভোগের কারণ ঐ একটাই।

এই জলঝড় ঠাণ্ডার রাত্রিতে, বিশেষত রোগীর বাড়ি তাঁর বাড়ি থেকে দশ মাইল দূরে, সল্ট লেকের শেষ মাথায় ডাক্তার রীতিমত দোনামনা করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নীতি ও বিবেকের শাসনে এবং ফোনেব ওপার থেকে মুমূর্ষু ব্যক্তির স্ত্রীর করুণ আর্তনাদে তাঁকে সাড়া দিতেই হলো।

একটা অতি পুরনো বিলিতি গাড়ি ডাক্তারবাবুর। খুব সম্ভব রোভার, সেটা ঠাণ্ডার মধ্যে সহজে স্টার্ট নিতে চায় না। তাব উপরে জলঝড়ে কখন কোথায় থেমে যায় তারও কোনো ঠিক নেই। এদিকে ড্রাইভার বেচারি আজ কদিন হলো ম্যালেরিয়ায় ভুগছে।

অবশেষে রোগীর স্ত্রীকে, 'আসছি' বলে, ফোন নামিয়ে রেখে ডাক্তার ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি জামাকাপড়, স্টেথসস্কোপ, ডাক্তারি বাক্স নিয়ে প্রস্তুত হলেন এবং গ্যারেজের দরজা খুলে রোভার গাড়িটা বার করে 'জয় দুর্গা' বলে অকুস্থলে রওনা হলেন।

বৃষ্টির বেগ এবং হাওয়া এখন তীব্রতর হয়েছে। কনকনে বরফজমা শৈত্যপ্রবাহ ঝাঁপিয়ে পড়ছে কলকাতা মহানগরীর নির্জন রাতে। রাস্তায় হাঁটুজল, কোথাও বা তারও বেশি। মনুষ্যজন তো দূরের কথা একটা কুকুর পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

রাত এখন একটা। ডাক্তারবাবু রোগীকে দেখতে যাচ্ছেন, কাঁকুরগাছির পরে রোভার গাড়িটা বিদায় গ্রহণ করলো, কোনো কিছু না বলে হঠাৎ থেমে গেলো। এক হাঁটু জলের মধ্যে ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে গাড়ি সারানোর আনাড়ি চেষ্টা না করে এবার এই বৃষ্টির মধ্যে ডাক্তারবাবু দ্রুতপদে বেরিয়ে পড়লেন।

প্রায় অচেনা সল্ট লেকে অনেক ঠাণ্ডা, অনেক বৃষ্টি,অনেক ঘোরাঘুরির পর ডাক্তারবাবু বাড়িটা খুঁজে পেলেন। দেখেই বুঝতে পারলেন এটাই রোগীর বাড়ি। একতলার বাইরের ঘরে আর দোতলার সব কটা ঘরে আলো জ্বলছে। কাচের জানলা দিয়ে তাঁরাও ডাক্তারবাবুকে দেখেছিলো, ছুটে এসে দরজা খুলে দিলো। একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে ডাক্তারবাবু সরাসরি রোগীর শয়নঘরে চলে গেলেন। রোগী একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে খাটে বসে হরলিকস্ খাচ্ছেন।

ডাক্তারবাবু একটু বিরক্ত হলেন, 'আপনার কি হয়েছে ?' রোগী বললেন, 'দুপুরে একটা নেমন্তন্ন খাই। বিকেলের দিকে পেটটা ফুলে গেলো। রাতে খেতে বসে কেমন আইঢাই লাগতে লাগলো। একেক সময় মনে হচ্ছিলো দমবন্ধ হয়ে আসছে। শোয়ার পর কেমন ভয় হতে লাগলো। তাই আপনাকে ডেকে পাঠালাম। অবশ্য এখন একটু ভালো বোধ করছি।'

ডাক্তারবাবু বাক্যব্যয় না করে রোগীর বুক পিঠ স্টেথসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, তার মুখ ক্রমশ গম্ভীর হতে লাগলো। তারপর প্রেসার নিলেন তিনবার চারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। নাড়ি ধরেও বসে রইলেন কয়েক মিনিট।

অনেকক্ষণ গুম মেরে থেকে তারপর রোগীর স্ত্রীকে বললেন, 'আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কে কোথায় আছেন খবর দিন।' স্ত্রী রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছেন, 'আমাদের কি হবে ডাক্তারবাবু ?' রোগী ইতিমধ্যে শয্যাশায়ী হয়েছেন। ডাক্তারবাবু স্থির গলায় বললেন, 'আমি তো আছি। এখন সবাইকে তাড়াতাড়ি আসতে বলুন।'

বাইরে তখন বৃষ্টির তোড় দ্বিগুণ, বাতাসের বেগ চতুর্গুণ, শোঁ শোঁ শব্দ আর হাড় হিম করা ঠাণ্ডা। একে একে ফোন যেতে লাগলো কাছে দূরে।.একেকটা পরিবার স্বামীস্ত্রী কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সারারাত ধরে জলঝড়ের মধ্যে আসতে লাগলো কাকের বাচ্চার মত ভিজে চুপসে, ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ রোগীর পাশে ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে ছিলেন। সকাল হতে বৃষ্টিজল কেটে গেলো, ডাক্তারবাবু উঠলেন, বললেন, 'এবার আমি যাই।' তখন উদ্বিগ্ন আত্মীয়েরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যাচ্ছেন ? কিন্তু ওঁর কি অবস্থা।' ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওঁর কিছুই হয়নি। একটু বদহজমের মত হয়েছিলো, সে কেটে গেছে। সে জন্যে নয়। ঝড়-জল-ঠাণ্ডার রাতে বাড়ি থেকে বেরোতে কেমন লাগে সেটা বোঝানোর জন্যে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। এবার যাই, ধন্যবাদ।'

পরকীয়া

খুব সম্ভব শিবরাম চক্রবর্তী থেকে টুকে, সেই যে একবার আমি একটা খুবই মজার কথা লিখেছিলাম, তুমি নিশ্চয় খুব হেসেছিলে।

সেই যে একজন একবার তার সহধর্মিণীর চিবুক আলতো করে ধরে, দুই নয়নের দিকে অবশ দৃষ্টিপাত করে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেছিলেন, 'জানো, মাইরি, তোমাকে আজকে একদম পরস্ত্রীর মত দেখাচ্ছে। সুইটি, সুইটি।'

এর জবাবে স্ত্রীরত্নটি কি বলেছিলেন, তা অবশ্য আমি জানি না। তবে পরম্পর শুনেছি, তিনি বলেছিলেন, 'যাঃ'। যদি সত্যি তাই হয়ে থাকে তা হলে আরো বিপদ, কারণ মহিলা বচনমালার ঐ 'যাঃ'শব্দটির অর্থ বিদ্যাবুদ্ধির কথাকার মোটেই জানে না। 'যাঃ' শব্দটি ক্ষুব্ধ, অভিমানী অথবা তৃপ্ত, আনন্দিত অব্যয় কোনো পুরুষ মানুষই হয়তো জানে না, এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তারাপদ রায় একেবারেই বলতে পারবে না।

বিদ্যাবুদ্ধির সরলমতি পাঠিকা, তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো এক বিকেলবেলায় বর্ধমান লোক্যালে। শ্রীরামপুর স্টেশনে তুমি তোমার পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে নেমে গেলে, তার আগে পর্যন্ত বিদ্যাবুদ্ধির মাতাল কাহিনীগুলি তুমি শোনাচ্ছিলে তাদের। জানি না তুমি কতটা আধুনিকা, পরকীয়ার গল্পগুলিও তাদের রসিয়ে বলতে পারবে কি না। কি পারবে না পারবে সে তোমার কৃতিত্ব, কিন্তু পরকীয়া বড় বিপজ্জনক জিনিস, আমি একটু রেখে-ঢেকে লিখছি।

জনার্দনবাবু একজন সেলস অফিসার। মাঝে মধ্যেই অফিসের কাজে তাঁকে বাইরে

যেতে হয়। তিনি সস্ত্রীক বসবাস করেন এক বহুতল ফ্ল্যাটে, তাঁর বাড়ির সামনেই আরেকটি বহুতল ফ্ল্যাটে থাকেন তাঁর এক পুরনো বন্ধু।

রোববার সকালে জনার্দনবাবু থলে হাতে বাজারে যাচ্ছেন, ফুটপাথে বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। বন্ধুটি একটু ইতস্তত করে জনার্দনবাবুকে বললেন, 'দ্যাখো, জনার্দন, তোমাকে একটা কথা বলবো বলবো বলে ভাবছি। রাতে তোমাদের শোয়ার ঘরের সামনের জানলাটা বন্ধ করে শুয়ো। আমাদের এদিকটা থেকে সব দেখা যায়।'

জনার্দন একটু সঙ্কুচিত হলেন, 'সে কি ? জানলাটা খোলা ছিলো নাকি ? কবে দেখলে ?' বন্ধুটি বললেন, 'কেন গতকাল রাতেও চোখে পড়লো, জানলাটা খোলা, নীল আলোটা একটু অস্পষ্ট, তবু বেশ আবছা আবছা হলেও বোঝা যায়। পরশু রাতেও দেখেছি।' জনার্দনবাবু কাল-পরশু শুনে আশ্বস্ত হলেন। বললেন, 'তুমি কি নেশাটেশা করেছিলে নাকি ? কাল-পরশু আমি কোথায়, আমি তো টুরে ছিলাম। তুমি ভুল দেখেছো।'

এই জনার্দনবাবুরই সাহেব কাউন্টারপার্ট মিস্টার জনের গল্পটি একটু অন্যরকম। মিস্টার জন তাঁর অর্ধাঙ্গিনী মিসেস জনকে সন্দেহ করেন। কিন্তু তিনি নিজে কিছু ধরতে না পেরে প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগালেন এবং মেমকে জানিয়ে গেলেন তিনি শহরের বাইরে যাচ্ছেন এক সপ্তাহের জন্যে। এক সপ্তাহ বাদে ফিরে আসার পর গোয়েন্দা রিপোর্ট দিলেন 'মেমসাহেব প্রতিদিন সন্ধেবেলা, আপনি যে কদিন ছিলেন না, সাজগোজ করে, সেন্ট পাউডার রুজ মেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন।' জন সাহেব বললেন, 'আমি তো এসব জানি। আমিও লুকিয়ে এসব লক্ষ করেছি আগে।'

ডিটেকটিভ বললেন, 'তারপরে মেমসাহেব এক সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

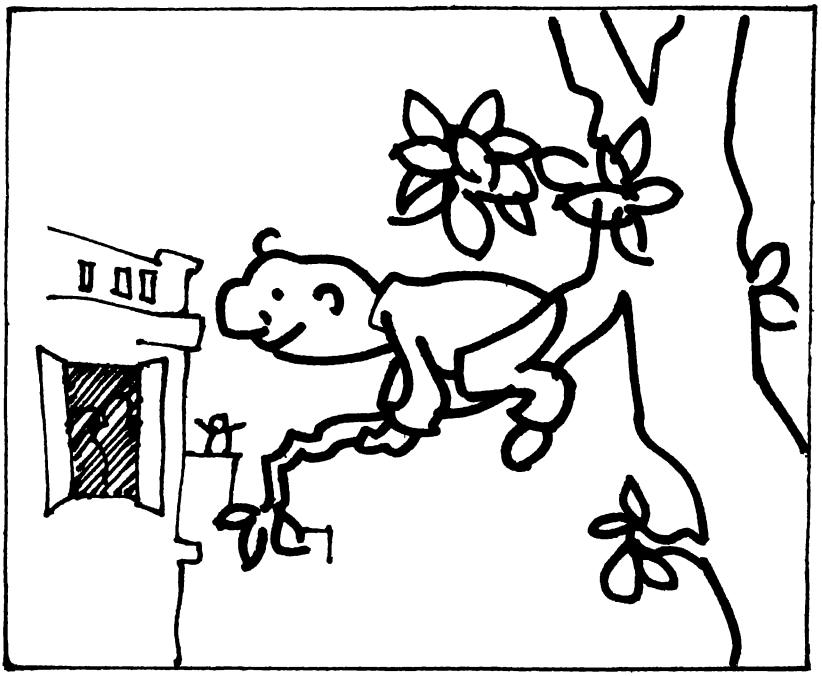

একটু পরেই সেখানে এক সুবেশ, সুন্দর যুবক এসে দাঁড়ালো। তারপর দুজনে দুজনের কোমরে হাত দিয়ে হলের মধ্যে ঢুকে গেলেন।' জন সাহেব গোয়েন্দাকে থামিয়ে বললেন, 'এও আমি আগে লক্ষ করেছি।'

এবার গোয়েন্দা বললেন, 'সবুর করুন। আরো বলছি। সিনেমা ভাঙার পর দুজনে হাত ধরাধরি করে চলে গেলেন একটা বারে। সেখানে যথেষ্ট খাদ্য ও পানীয় খেলেন, তারপর বলরুমে গিয়ে নাচলেন।' সত্যজিৎ রায়ের ঘরে বাইরের ভিক্টর ব্যানার্জির মত শান্ত কণ্ঠস্বরে জন সাহেব বললেন, 'তা না হয় হলো, এ তো আমিও আগে দেখেছি। তারপর কি হলো বলুন।'

গোয়েন্দা প্রবর এবার সংক্ষিপ্ত করলেন তাঁর রিপোর্ট, 'এর পরে মেমসাহেব তাঁর পুরুষবন্ধুকে নিয়ে আপনাদের বাড়িতে গিয়ে শোয়ার ঘরে ঢুকলেন। তারপর কয়েক মিনিট পরে আলো নিবিয়ে দিলেন। জন সাহেব এতক্ষণে উত্তেজিত হলেন, 'তারপরে ? তারপরে কি হলো ?'

গোয়েন্দাটি এবার বললেন, 'তারপরে তো আর কিছু বলতে পারবো না। আমি আপনার বাড়ির সামনের গাছের ডালে বসে দেখছিলাম, ঘর অন্ধকার হওয়ার পর আর কিছু দেখতে পেলাম না। বাধ্য হয়ে নেমে এলাম গাছ থেকে।'

জন সাহেব দুঃখিত হয়ে বললেন, 'আরে তাই তো হয়েছে অসুবি গাছের উপরে বসে কয়েকদিন আমিও ওয়াচ করেছি। কিন্তু ঐ অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় কিছুই ধরতে পারলাম না। অনুমানের উপর বউকে কিছু বলি কি করে বলুন তো ?'

পরকীয়া প্রেম অবশ্য কোনো নতুন বা আধুনিক ব্যাপার নয়। যেদিন থেকে বিবাহ নামক প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির সূচনা হয়েছে তার পরদিন থেকে পরকীয়ার শুরু। পুরো ব্যাপারটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আধুনিক রাধাকৃষ্ণ, বৈষ্ণব কবিতার এমন কি মহাভারতের কৃষ্ণলীলার চেয়েও অনেক পুরনো।

সংস্কৃত শ্লোকে নির্দেশ রয়েছে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখার, কিন্তু হিন্দু সামাজিক অনুশাসন বিশেষ করে পুরাণ, সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থে পরকীয়াকে প্রায় মেনেই নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সমাজ যেন কিছুটা উদার বা উদাসীন ছিলো। প্রাতঃস্মরণীয়া যে পঞ্চসতী, তার মধ্যে একমাত্র সীতা ছাড়া কেউই একবল্লভা নয়। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী এবং তৎসহ শ্রীকৃষ্ণ ; তারা এবং মন্দোদরী দুজনেই দেবরবিবাহ করেছিলেন, ব্যাপারটা অবশ্য অশাস্ত্রীয় ছিলো না। অহল্যার ঘটনাটা খুবই গোলমেলে, রীতিমত ব্যভিচার। শুধু সীতা, বিনা দোষে জনকতনয়াকে কলঙ্কিত হয়ে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছিলো এবং শেষ পর্যন্ত পাতাল প্রবেশ।

ব্যভিচারের ব্যাপারে ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত কঠোর। একবারের ব্যভিচার সত্তর বছরের প্রার্থনার পুণ্য ধ্বংস করে দেয়। পবিত্র আল্-কোরআনে ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারীকে একশো করে কশাঘাত করার নির্দেশ আছে। হাদীশ শরীফে কাব্যময় ভাষায় বলা হয়েছে, দৈবাৎ যদি কোনো রমণীর প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ে তবে দ্বিতীয়বার তার প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। কারণ প্রথম দৃষ্টি বৈধ হলেও দ্বিতীয় দৃষ্টি বৈধ নয়। (রফিক উল্লাহ্ সম্পাদিত হাদীশ শরীফের বঙ্গানুবাদ থেকে)।

অতঃপর বাইবেল। টেন কম্যাণ্ডমেন্ট অর্থাৎ দশ আদেশনামা ব্যভিচারকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। শুধুমাত্র এই একটি বিষয় দশটির মধ্যে দুটি আদেশনামায় রয়েছে। সাত নম্বর আদেশে সরাসরি বলা আছে, ব্যভিচার করবে না। আর শেষ আদেশের প্রারম্ভে বলা আছে

পরস্ত্রীকে কামনা করবে না।

ধর্ম নিয়ে আর বেশি কচকচি করা ভালো হবে না। তবু বাইবেলে যখন এসেছি গির্জা থেকে একবার ঘুরে আসি।

এক ভদ্রবেশী পাষণ্ড গির্জায় গিয়েছিলো ছাতা চুরি করতে। তার স্বভাবচরিত্র খারাপ,সে কিন্তু জাতচোর নয়। লোকটি আজ কয়েকদিন হলো তার ছাতা হারিয়ে ফেলেছে। সম্ভব-অসম্ভব অসংখ্য জায়গায় সে খোঁজাখুঁজি করেছে। যে রেস্তোরাঁয় সে চা খায়, যে সব পানশালায় সে মদ্যপান করে, বাস কোম্পানি-ট্রাম কোম্পানির লস্ট প্রপার্টি অফিসে সর্বত্র সে চেষ্টা করেছে কিন্তু নিজের হারানো ছাতাটিকে উদ্ধার করতে পারেনি।

ছাতাটি খুব পুরনো ছিলো না। প্রায় নতুনই বলা চলে। ছাতা হারিয়ে লোকটি চিন্তিত হলো, একটা ছাতার দাম কম নয়। তিন পেগ হুইস্কির খরচা হয়ে যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে সে ঠিক করলো গির্জায় গিয়ে গির্জা থেকে ছাতা চুরি করবে।

মন্দির-মসজিদ থেকে জুতো এবং গির্জা থেকে ছাতা চুরি করা সোজা। গির্জায় প্রার্থনা করতে ঢোকার সময় লোকেরা ছাতা বারান্দায় রেখে যায়। লোকটি ঠিক করলো প্রার্থনা শেষ হওয়া মাত্র তড়িঘড়ি উঠে পড়ে সে বারান্দা থেকে সবচেয়ে ভালো ছাতাটি হাতে করে বেরিয়ে আসবে।

কিন্তু তার আর ধৈর্য হলো না। সেদিন গির্জায় পাদ্রীসাহেব দশ কম্যাণ্ডমেন্টের বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলছিলেন। যখন তিনি কম্যাণ্ডমেন্টের আলোচনা শেষ করে এসেছেন লোকটি উঠে পড়লো। বারান্দার বাইরে এক বুড়ো পাদ্রী দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি লোকটিকে চলে যেতে দেখে এগিয়ে এলেন। লোকটি পাষণ্ড হলেও সত্যবাদী। সে বললো সে প্রার্থনার জন্যে গির্জায় আসেনি। সে এসেছিলো ছাতা চুরি করতে। দশ কম্যাণ্ডমেন্ট শুনে সে আর ছাতা চুরি করছে না। বৃদ্ধ যাজক বিস্মিত হলেন, এত দ্রুত হৃদয় পরিবর্তন সচরাচর দেখা যায় না। লোকটি তখন বললো যে পাদ্রী সাহেব যখন বললেন, 'পরস্ত্রীকে কামনা করবে না', তখনই তার মনে পড়েছে যে গত সোমবার সন্ধ্যায় তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর ঘরে ছাতাটা ফেলে এসেছে। আজ আবার সন্ধ্যায় প্রতিবেশী থাকছে না, সে যাবে। গেলেই ছাতাটা পেয়ে যাবে। তাই চুরি করার দরকার পড়লো না।

অচলার প্রেম

এবারের নিবন্ধের নাম হওয়া উচিত ছিলো 'আবার পরকীয়া' কিংবা 'পরকীয়ার পরে' অথবা অনুরূপ কিছু। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু পরকীয়া প্রেম বা ব্যভিচার। জটিল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে, তাই নামটাও জটিল হলো।

আগে একটা কথা পরিষ্কার করে নিই। সব পরকীয়া ভালোবাসাই কিন্তু ব্যভিচার নয়। পরকীয়া প্রেম অনেক সময়েই দূর থেকে, সে অধরা, অছোঁয়া নিতান্তই নিরামিষ। সত্যজিৎ রায়ের পিকুর মা অথবা লেডি চ্যাটারলির মত নয়। নিরামিষ পরকীয়া প্রেম, যা কামগন্ধহীন, যার তুলনা শুধু নিকষিত হেম ; সেই স্বপ্নময় ভালোবাসা পৃথিবীর সমস্ত রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস, মধুর কবিতা এবং সোনালি গানের মূল বিষয়বস্তু।

আমরা মোটা আলোচনায় যাচ্ছি না। বিষয়টি জটিল, আগে দুটো সরল বিলিতি গল্প বলে নিই।

প্যারিস শহরের এক রেস্তোরাঁয় বসে সকালে দুই বন্ধু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে চা খাচ্ছে। হঠাৎ এক বন্ধুর চোখ খবরের কাগজের এক জায়গায় পড়তে সে আঁতকিয়ে উঠলো, সে অন্য বন্ধুকে দেখালো তারপর পড়ে শোনালো। ঘটনাটি সামান্য নয়, মাদাম দুভালের স্বামী মঁশিয়ে দুভাল গতকাল রাতে অতর্কিতে বাড়ি ফিরে এসে তাঁর স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে এক অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখতে পান। মঁশিয়ে দুভাল কয়েকদিন আগে লণ্ডনে গিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে ফেরার কথা ছিলো তাই হয়তো দুভাল-পত্নীর এই অসতর্কতা।

সে যা হোক, দুভালসাহেব বাড়ি ফিরে সেই হতভাগ্য প্রেমিককে দড়ি দিয়ে জানলার

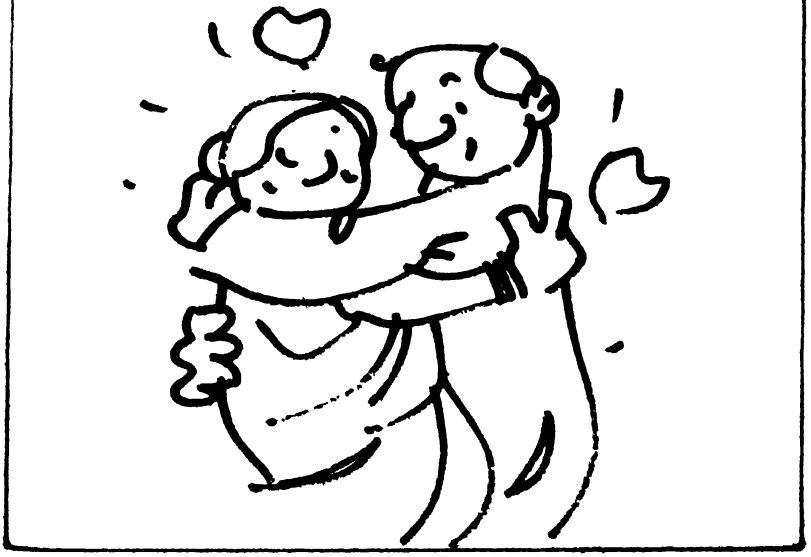

গরাদের সঙ্গে বাঁধেন। তারপর নির্মমভাবে একঘণ্টা চাবুক মারেন এবং অবশেষে তাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে প্যারিস শহরের শীতের বরফজমা, কনকনে ঠাণ্ডায় রাস্তায় লাথি মেরে বাড়ির মধ্য থেকে বের করে দেন। পুলিশের গাড়ি দুর্ভাগ্যকে উদ্ধার করে রাস্তা থেকে তুলে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যে বন্ধুটি খবরের কাগজটি অন্য বন্ধুকে পড়ে শোনাচ্ছিলো, সে বললো, 'কি সাংঘাতিক। সামান্য অবৈধ প্রেমের জন্যে এতো লাঞ্ছনা! কি সাংঘাতিক ব্যাপার।' যে শুনছিলো সেই দ্বিতীয় বন্ধুটি খবরটা শুনে অনেকক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললো, 'এর চেয়ে আরো সাংঘাতিক হতে পারতো।'

প্রথম বন্ধু বিস্মিত, 'এর থেকে আর কি সাংঘাতিক হবে।' দ্বিতীয় বন্ধুটি বললো, 'কাল না হয়ে পরশুদিন হলেই আরো সাংঘাতিক হতো। পরশুদিন রাতে যে আমি ছিলাম দুভালমেমের বাড়িতে, সেদিন যদি দুভাল ফিরতো!'

দ্বিতীয় কথিকাটি বিপরীতমুখী। আগের গল্পের স্বামী মারমুখী। আর এ গল্পে ভীরু, ভালোমানুষ স্বামী তাদের একজন যারা বৌকে দখলে রাখতে পারে না, সাহেবরা যাদের শিং গজিয়েছে বলে উপহাস করে।

এক ব্যক্তির অফিসে খুব ক্লান্ত লাগছে। অথচ অফিস ছুটি হতে এখনো তিন-চার ঘণ্টা বাকি। এখন ভরদুপুর। তার সাহসের অভাব, অফিস থেকে পালাতে ভরসা করছে না। তার সহকর্মী তাকে বললো, 'আরে, ভয়ের কি আছে? আজ তো বড়সাহেব অফিসে নেই। খুব সাজগোজ করে, ভুরভুরে আতর মেখে বেরিয়েছে। কোথাও ফুর্তি করতে গেছে, সহজে ফিরবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, কেউ তোমাকে ধরবে না।'

ক্লান্ত কর্মচারীটি সংশয়াকুল চিত্তে গৃহপানে রওনা হলো। তার বাড়ি কাছেই। পনেরো মিনিটের মধ্যে দেখা গেলো সে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে অফিসে ফিরে আসছে। সে ফিরে এসে হাঁফাতে লাগলো। একটু বিশ্রাম নেয়ার পরে তার পূর্ব পরামর্শদাতা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি এমন ভয় পেয়ে ফিরে এলে কেন?'

কর্মচারীটি বললো, 'তোমার পরামর্শ শুনে আজ আমি ঘোর বিপদে পড়েছিলাম।'

'কি বিপদ?' কিছুই বুঝতে পারছে না পূর্ব পরামর্শদাতা।

'কি বিপদ?' অফিস কেটে চলে যাওয়া বন্ধুটি ব্যাখ্যা করে বললো, 'চাকরি যেতে বসেছিলো। আজ চাকরি খোয়াতাম। বড় সাহেবের কাছে অল্পের জন্যে ধরা পড়িনি যে অফিস পালিয়েছিলাম।'

পরামর্শদাতা পুনরায় প্রশ্ন করলো, 'তার মানে?'

বন্ধুটি বললে, 'তার মানে? বাড়ি ফিরে শোয়ার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছি, হঠাৎ শুনি বৌ কার সঙ্গে খুব হেসে হেসে কথা বলছে। জানলার ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখি বড়সাহেব আমার বিছানায় শুয়ে। ভাগ্যিস হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে যাইনি। তাহলেই ধরা পড়ে যেতাম। অফিস পালানো ধরতে পারলে সাহেব নিশ্চয়ই আমাকে বরখাস্ত করতো। সেই ভয়েই তো একছুটে ফিরে এলাম অফিসে।'

'মানুষেরা যাকে বীরত্ব বলে, ঈশ্বর যাকে ব্যভিচার বলেন,' লর্ড বায়রন ডন জুয়ানে লিখেছিলেন, 'সেটা খুব বেশি সেই সব অঞ্চলে যেখানে আবহাওয়া উষ্ণ।'

উষ্ণ আবহাওয়ার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ভালো করেননি বায়রন, বরং আমাদের প্রাচ্যদেশীয়দের মনে হয় বায়রন সাহেবের শীতল শ্বেতাঙ্গ দেশগুলিতেই চিরদিন ব্যভিচার প্রবল ছিলো এবং এখনো আছে।

বায়রন সাহেবের বেশ কিছুকাল আগে উইলিয়াম সেক্সপীয়ার নামে এক নাট্যকার অত্যন্ত অনাসক্তভাবে পরকীয়া সম্পর্কে দুচার হাজার কথা লিখেছিলেন। সেক্সপীয়ারের মতো হৃদয়সন্ধানী মানুষকে অনাসক্ত বলছি এ কারণে যে তিনি নিজের সঙ্গে নিজেরই বিরোধ ঘটিয়েছেন।

'বিনা কারণে বাড়াবাড়ি' অর্থাৎ 'মাচ এডু (কিংবা এ্যডু অথবা আডু বা অ্যাডু) এবাউট নাথিং' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে নাট্যকার মহিলাদের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে মানা করেছেন, 'কারণ পুরুষেরা চিরদিনের প্রতারক, তাদের এক পা সাগরে আরেক পা তটভূমিতে, পুরুষেরা কোনোদিন কোনো একটা কিছুতে স্থির নয়।'

চমৎকার ! চার শতাব্দী পরের এক অস্থিরচিত্ত পুরুষমানুষ হিসেবে এ না হয় মেনে নেয়া গেলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মহাকবির আটাশিতম সনেটের হীরের মতো উজ্জ্বল দুটি পঙক্তি মনে পড়ছে। 'আমার প্রেমিকা শপথ করেছে সবটাই তার খাঁটি, বিশ্বাস করি ; যদিও জেনেছি মিথ্যাও বলে সে।'

ব্যর্থ অনুবাদে উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের এতবড় সর্বনাশ এর আগে কেউ করেনি। অধিক মূর্খতা প্রকাশ করে লাভ নেই। বরং সরাসরি মাতৃভাষায় যাই।

মাতৃভাষা এবং শরৎচন্দ্র এবং এই নিবন্ধের শিরোনামায় চলে আসি। 'অচলার প্রেম' নামক একটি সত্য ঘটনামূলক কাহিনী দিয়ে পরকীয়ার আলোচনা পরবর্তী সংখ্যার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছি।

এই গল্প এক প্রৌঢ় বাংলার অধ্যাপককে নিয়ে। তিনি একান্ত সরল এবং নীতিপরায়ণ। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিজের সন্তানের মত দেখেন, তাদের নিত্যশুভার্থী।

তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের সিলেবাসে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' পাঠ্য ছিলো। আমার নিজের পাঠ্যবিষয় অন্য থাকলেও গল্পটা আমি শুনেছিলাম বাংলার ছাত্রদের, বিশেষ করে কবি দেবতোষ বসুর কাছ থেকে।

ঐ প্রৌঢ় অধ্যাপকই ছিলেন বাংলা বিভাগের প্রধান। তিনি নিজেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন 'গৃহদাহ' পড়ানোর।

প্রধান অধ্যাপক মহোদয় একবারো চিন্তা করে দেখেননি তাঁর নিরীহ এবং গোবেচারা দর্শন ছাত্রছাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই এমন সব বিষয় জানে, এমন সব বিষয় পড়েছে যার কাছে সনাতনপন্থী শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' নিতান্তই শিশুশিক্ষা কিংবা বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ।

অধ্যাপক মহোদয় 'গৃহদাহ' নিজের হাতে রাখলেন, কিন্তু কিছুতেই পড়াচ্ছেন না। তখন অনার্স দু' বছরের। তাঁর চিন্তা যে দু বছরে ছেলেমেয়েগুলোর একটু বয়স বাড়বে, তারা একটু পরিণত হবে, তখন গৃহদাহের গূঢ় তত্ত্ব তাদের বোঝানো যাবে।

ফলে অনার্সের টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত 'গৃহদাহ' পড়ানো হলো না। তখনো প্রধান অধ্যাপকের যথেষ্ট মনোবল তৈরি হয়নি বইটি পড়ানোর মত। তিনি মাঝে মধ্যে ছেলেমেয়েদের দিকে তাকান আর মনে মনে অঙ্ক কষেন ছেলেমেয়েরা 'গৃহদাহ' পাঠের যোগ্য হলো কিনা। অবশেষে ছাত্রছাত্রীরাই তাঁকে চেপে ধরলো, 'স্যার, আমাদের আর কবে গৃহদাহ পড়ানো হবে ?' তখন অধ্যাপক টেস্ট পরীক্ষার পরে একদিন স্পেশ্যাল ক্লাসের বন্দোবস্ত করলেন শুধু শরৎচন্দ্রের ঐ উপন্যাসটি পড়ানোর জন্যে।

স্পেশ্যাল ক্লাসের আরম্ভ হওয়ার কথা ছিলো বেলা এগারোটায়। অধ্যাপক খুবই সময় সচেতন কিন্তু সেদিন প্রায় পৌনে বারোটা পর্যন্ত তাঁর দেখা নেই। ছাত্রছাত্রীরা যখন অধীর

হয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখা গেলো গেট দিয়ে তিনি ঢুকছেন। কিন্তু এ কোন তিনি ? যেন তাঁর গুরুদশা হয়েছে। একগাল না-কামানো দাড়ি, লাল চোখ, এলোমেলো চুল, ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে,তাঁকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলো। তিনি গুম হয়ে ক্লাসে এসে ঢুকলেন, কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। মিনিট পাঁচেক থম মেরে বসে থেকে তিনি বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, 'না আমি পারলাম না। আমার পক্ষে সম্ভব নয় এ কাহিনী তোমাদের পড়ানোর', বলতে বলতে তিনি দ্রুত পদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, শেষ মুহূর্তে দরজায় দাঁড়িয়ে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বললেন, 'কিছুই বলতে পারলাম না, শুধু একটা কথা বলে যাচ্ছি তোমাদের। মনে রেখো অচলার প্রেম পবিত্র ছিলো না, পবিত্র ছিলো না।'

শেষ পরকীয়া

পাড়াগাঁয়ের পুকুরপাড়ে ছাইয়ের গাদার আড়ালে মানকচু কিংবা ধুতরো ফুলের ঝোপের পিছনে বসে যে সব গ্রামবৃদ্ধ স্নানরতা রমণীদের ঘাটের দিকে জুলজুল চোখে তাকিয়ে থাকেন, গ্রাম্যগঞ্জনা এবং কখনো কখনো মৃদু বা ততো-মৃদু-নয় প্রহার ও গলাধাক্কা তাঁদের নিবৃত্ত করতে পারে না এই দার্শনিক অভ্যাস থেকে।

বিদ্যাবুদ্ধি লেখক হয়তো এখনো ততটা বুড়ো এবং/অথবা নির্লজ্জ হন নি কিন্তু তাঁরও হয়েছে ঐ একই দশা, ছাইয়ের গাদার পিছনে বসে দর্শনসুখ না ভোগ করলেও পরকীয়া লিখে তাঁর ফুর্তি হয়েছে প্রচুর, জীবনে এই প্রথম এমন নিষিদ্ধ কাজের আনন্দ পেলেন তিনি।

যাঁরা জানতেন না যে, এই রকম জটিল ও নিষিদ্ধ বিষয়ে আমার এতো অগাধ জ্ঞান এবং যাঁরা পরকীয়ামালা পাঠ করে বিচলিত বোধ করছেন তাঁদের জন্যে এবার প্রথমেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কথিত কাহিনী দিয়ে শুরু করি। বিদ্যাসাগর মহোদয়ের যৎকিঞ্চিৎ অপূর্ব মহাকাব্য 'ব্রজবিলাস' (১৮৮৪, ২য় সংস্করণ), যা কিনা কবিকুলতিলকস্য কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য প্রণীত ; সেখান থেকে সংক্ষিপ্তাকারে আমি উপস্থাপন করছি।

এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নারী এক সুপণ্ডিত কথকের কথায় মোহিত হয়ে তাঁর প্রতি ঘনিষ্ঠ হন এবং অবশেষে সেবাদাসী হয়ে পড়েন। একদিন পণ্ডিত কথকতার সময় ব্যভিচার বিষয়ে বললেন। যে নারী পরপুরুষে উপগতা হয় নরকে তাকে অনন্তকাল কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হয়। কণ্টকাকীর্ণ লোহার শিমুল গাছকে উপপতিরূপে তাকে গ্রহণ করতে হয়। যমদূতেরা তাকে সেই গাছ আলিঙ্গন করতে বাধ্য করে সেই ব্যভিচারিণীর সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়, রক্ত পড়তে থাকে ; সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ করতে থাকে। তবু তার রক্ষা নেই। পণ্ডিতমশায় তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন স্ত্রীজাতিকে সাবধান করে দিয়ে যে, 'ক্ষণিক সুখের অভিলাষে পরপুরুষে উপগতা হওয়া উচিত নহে।'

এই ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শুনে সেই সেবাদাসী তৎক্ষণাৎ সাবধান হয়ে গেল। সে আর সেদিন সন্ধ্যায় কথকঠাকুরের শয়নগৃহে প্রবেশ করল না।

পণ্ডিতমশায় যখন তাকে ডেকে পাঠালেন এবং জানতে চাইলেন, 'আজ কি হল ?' সেবাদাসী শোকাকুল বচনে শিমুল গাছের উপাখ্যান শুনে তার ভয় হয়েছে এবং তার পক্ষে আর শয়নগৃহে গুরুদেবকে সঙ্গ দেওয়া সম্ভব নয়, সেটা জানিয়ে দিলেন।

তখন পণ্ডিত সহাস্যে বললেন, 'আরে পাগলি, তুমি এই ভয়ে আজ শয্যায় আসছ না ! আমরা পূর্বাপর যেমন বলে এসেছি, আজও তাই বলেছি। শিমুলগাছ আগে ওরকম ভয়ঙ্কর ছিল বটে ; কিন্তু শরীরের ঘষায় ঘষায় লোহার কাঁটাগুলো-ক্রমে ক্ষয় পাওয়াতে শিমুল গাছ তেল হয়ে গিয়েছে। এখন আলিঙ্গন করলে সারা শরীর শীতল ও পুলকিত হয়।'

বিধবার সঙ্গে প্রণয় বা ঘনিষ্ঠতা বোধ হয় সে অর্থে পরকীয়া পর্যায়ে পড়ে না। তবে খানদানি বিধবা সম্পর্কে সৈয়দ মুজতবা আলি এক আশ্চর্য কাহিনী লিখেছিলেন তাঁর চাচাকাহিনীতে। সে বিধবা কিন্তু কোনো মানুষের বিধবা নয়, সে সিংহের বিধবা।

বরোদার মহারাজা সয়াজী রাওকে ইথিওপিয়ার রাজা একজোড়া সিংহ উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু পুরুষ সিংহটি মারা যায়। তখন সেই বিধবা সিংহীর ঘরে একটি গুজরাটি সিংহ বর হিসেবে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। খাঁচার দরজা দিয়ে বর ঢুকলেন আস্তে আস্তে। হঠাৎ সিংহী এক লাফ দিয়ে এসে পড়ে সিংহের ঘাড়ে। মুহূর্তের মধ্যে নতুন বর নিহত হল। মুজতবা লিখেছেন, বরোদার মহারাজা সিংহের সিংহীর দ্বারা নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে মুচকি হেসে বলেছিলেন, এদেশের খানদানি বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নূতন বিয়ে করতে চায় না! হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানালে যে ?'

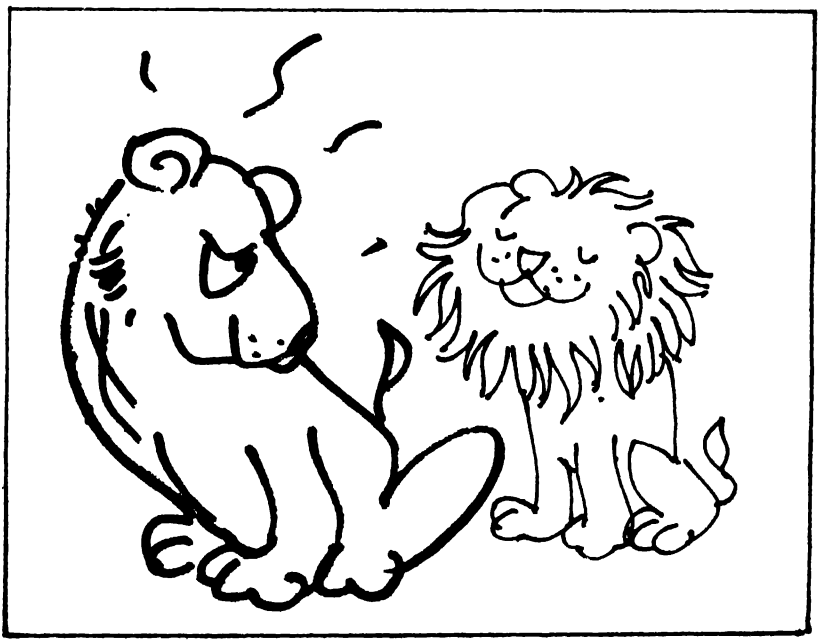

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বৈধতা-অবৈধতা সংক্রান্ত এ যাবৎ সবচেয়ে মারাত্মক গল্পটি অবশ্য পরশুরাম বিরচিত, সেই অসামান্য 'ভূশণ্ডীর মাঠে'। সে গল্প লিখতে গিয়ে পরশুরামের পর্যন্ত কলমের কালি শুকিয়ে গিয়েছিল। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামী। এই ডবল ত্র্যহস্পর্শযোগে ভূশণ্ডীর মাঠে যুগপৎ জলস্তম্ভ, দাবানল ও ভূমিকম্প শুরু হয়েছিল।

সিংহ বা ভূতের পরকীয়ার সমস্যা ছেড়ে এবার আমরা একটু মানুষের পরকীয়ায় মনোযোগ দেব।

প্রথমেই সেই বিখ্যাত কমার্শিয়াল আর্টিস্টের গল্পটি বলে নিই। এই শিল্পী ভদ্রলোক এক বিজ্ঞাপন কোম্পানির ধরাবাঁধা কাজ করেন। তাঁর নিজস্ব স্টুডিওতে সেদিন তিনি খুব ক্লান্ত অবস্থায় বসে আছেন। কিছু কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। অথচ এক আলুলায়িত বসনা, টানটান সুন্দরী সামনেই সোফার উপরে শুয়ে একটা গোলাপ ফুলে চুম্বন করছে। একটা লিপস্টিকের বিজ্ঞাপনের জন্যে ছবিটা তৈরি করতে হবে, তাড়াতাড়িই করতে হবে। কিন্তু আজ নানা হাঙ্গামা ছিল সারা দিন। শিল্পীর কাজ করতে ভালো লাগছে না।

মডেল সুন্দরীর দিকে কিছুক্ষণ নিথর তাকিয়ে থেকে তুলি হাত থেকে নামিয়ে শিল্পী বললেন, 'মিসেস দাস, আজ থাক। বড় মাথাটা ধরেছে। আপনি বরং এই সামনের চেয়ারটায় এসে বসুন, একটু চা খাই।' শিল্পী পাশের টেবিল থেকে দুটো পেয়ালা নিয়ে বাড়ি থেকে আনা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। মডেল সুন্দরী কাপড়চোপড় গোছগাছ করে সামনের চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে শিল্পীর সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলেন, কোনো প্রণয় ভালোবাসার ব্যাপার নয়, টুকটাক সাধারণ কথাবার্তা।

এমন সময়, যেমন হয়, সিঁড়িতে চপল চটির শব্দ। শিল্পীর স্ত্রী হঠাৎ হঠাৎ স্টুডিওতে এসে পড়েন, আজও তাই হয়েছে। ঘটনার গুরুত্ব বোঝা মাত্র শিল্পী আঁতকে উঠলেন, তাঁর স্ত্রী যদি তাঁকে এখন চা খেতে খেতে সুন্দরী মডেলের সঙ্গে গল্প করতে দেখে, তাহলে সমূহ সর্বনাশ।

শিল্পী মডেলকে বললেন, 'সর্বনাশ, আমার স্ত্রী আসছেন। আপনি তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় এলোমেলো করে সোফাব উপর শুয়ে পড়ুন। আমার স্ত্রী যদি আপনাকে আমার সঙ্গে চা খেতে দেখতে পান, ঘোর বিপদ হবে।'

এক ধর্মযাজক একদা এক বক্তৃতাকালে বলেছিলেন, 'দশজন কুমারীর সঙ্গে আমি থাকব তবু একজন বিবাহিতার সঙ্গে নয়।' পরকীয়াবিদ্বেষী সেই ধর্মযাজকের সঙ্গে, বলা বাহুল্য, সেই সভার সব পুরুষ শ্রোতাই একমত হয়ে হর্ষধ্বনি দিয়ে বলেছিলেন, 'আমরাও তাই চাই।'

পরকীয়ার প্রধান অসুবিধা হল, মহিলাটির স্বামী-দেবতাকে নিয়ে। যে ভদ্রলোক জীবনে কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যেও স্ত্রীর প্রতি কোনো রকম মনোযোগ দেন নি, তিনিই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন সেই মহিলার প্রতি অন্য কোনো পুরুষমানুষ সামান্য মনোযোগ দিলে।

তবে সেই সব পুরুষমানুষ, যাঁরা বিশ্বপ্রেমিক, যাঁরা মহিলা দেখলেই গদ্‌গদ হয়ে প্রেমে পড়েন, যাঁরা ভাবেন মহিলামাত্রেই সুরসিকা, তাঁদের প্রতি আমার অনুরোধ, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে মাঝে-মধ্যে দু-একটা রসিকতা করার চেষ্টা করে দেখবেন, তাতে হয়তো ভুল ভাঙতে পারে।

পরকীয়া, যাকে সাধুভাষায় বিবাহোত্তর প্রণয় বলা চলে, ব্যাপারটা কিন্তু মোটের উপর

যতই ভালো হোক উত্তরোত্তর খরচের ব্যাপার। এই তো গত শীতে একজন দুঃসাহসী সাহিত্যিককে দুটি কাশ্মীরী শাল কিনতে হয়েছিল, একটি তাঁর নবনী বান্ধবীকে উষ্ণ রাখার জন্যে, অপরটি তাঁর প্রবীণা স্ত্রীকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে।

দুটি ক্ষুদ্র কাহিনী দিয়ে এই পরকীয়া কথামালা শেষ করছি। এক ভদ্রলোক একদিন তাঁর স্ত্রীর প্রণয়ীকে হাতেনাতে ধরে ফেললেন। প্রণয়ীটি মোটেই ভীত বা বিব্রত না হয়ে বললেন, 'দেখুন হাতাহাতি বা মারামারি করে লাভ নেই। তার চেয়ে আসুন তাসের জুয়া খেলি, আপনার স্ত্রী আমার হবে না আপনারই থাকবে জুয়া খেলে সেটা ঠিক করে ফেলি।' স্বামী ভদ্রলোক উদাসীনভাবে বললেন, 'দেখুন, জুয়াটাকে সামান্য একটু ইন্টারেস্টিং করার জন্যে যদি একটা টাকা বাজি সঙ্গে থাকে তাতে কি আপনার আপত্তি হবে?' মোদ্দা কথা, ভদ্রলোকের কাছে তাঁর স্ত্রীর মূল্য এক টাকাও নয়।

তবে অন্য গল্পটি একটু আলাদা। মৃত্যুকালে স্ত্রী স্বামীর হাত ধরে বলেছেন, 'ওগো, আমার মৃত্যুর পরে তুমি কাউকে প্রাণ ভরে ভালোবেসো।' স্বামী আবেগবিধুর কণ্ঠে বললেন, 'অসম্ভব, এ জীবনে আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।' স্ত্রী বললেন, 'আমার গয়নাগাঁটি সব তার জন্যে রেখে যাচ্ছি, তুমি তাকে দিও।' এতক্ষণে স্বামী মৃত্যুপথযাত্রিণী রুগ্‌ণা পত্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হার, দুলগুলো হবে কিন্তু চুড়ি আর বালাগুলো হবে না, তার হাতটাতগুলো যে তোমার থেকে অনেক গোলগাল।'

এখন বক্তৃতা করবেন

না। আমি বক্তৃতা করবো না। বক্তৃতা একেবারেই আসে না। শুধু বক্তৃতা কেন, প্রায় কিছুই আমার আসে না, হয় না। তবু বক্তৃতা করার সময় আমার এই ব্যর্থতা বড় প্রকট হয়ে ওঠে। গলা শুকিয়ে যায়, জিব জড়িয়ে যায়, হাত-পা থরথর করে কাঁপতে থাকে, বোদ্ধা শ্রোতারা হো হো করে এবং সুন্দরীরা ঠোঁট টিপে হাসতে থাকেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়, পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ।

যদি বাধ্য হয়ে কখনো কোথাও বলতেই হয়, আজকাল চেয়ার টেনে বসি মাইকের সামনে, আমার কম্বুকণ্ঠ মাইকে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাকেই চমকে দেয়, অবশেষে চেয়ার সুদ্ধ থরথর করে কাঁপতে থাকি।

অনন্ত কাল আগে, সেই যখন চল্লিশে এসে পৌঁছালো বয়েস, ভেবেছিলাম আর তো কিছু হলো না, হবে না। এই সব লেখা-লেখা খেলা কিংবা আর কোনো সুন্দর খেলা আমার দ্বারা জমবে না, ভেবেছিলাম, একটা বাঁকা রাস্তায় গিয়ে নাম করি। রাস্তাটা বাঁকা বটে, কিন্তু খুব নতুন নয়। আসলে ঠিক করেছিলাম, নিজেকে গালাগাল করে, আত্ম অপমানের এবং অযোগ্যতার ভুরি ভুরি নিদর্শন দিয়ে চপল কথামালা সাজিয়ে বিখ্যাত হাস্যাস্পদ ব্যক্তি হিসেবে সাফল্য অর্জন করবো।

হা ভগবান ! আমার সে গুড়েও বালি, আমার সে ভাতেও ছাই । নিজের সম্পর্কে খারাপ খারাপ কথা লিখতে গিয়ে দেখি এ বিষয়ে আমার বন্ধুরা আগেই সব লিখে দিয়েছেন, আমার আর নিজেকে নতুন বা আলাদা করে হেনস্থা করার কোনো সুযোগ নেই । আমার মঞ্চে উঠে মাইকের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা কবিতা পাঠ কিংবা বক্তৃতা করার জন্যে, সেই ব্যাপারটাই ধরা যাক । আমার প্রাণের বন্ধু নবনীতা শ্রীমতী নবনীতা দেব সেন, এ বিষয়ে সেই কবে লিখেছেন 'তারাপদ দাঁড়িয়ে কবিতা পড়ে না, ওর হাঁটুতে হাঁটুতে ঠুকে যায় । মাইকে মনে হয় ড্রাম বাজছে ।' (দ্রষ্টব্য প্রথম প্রত্যয়, নটি নবনীতা ।)

নিজেদের কথা আপাতত থাক, অনর্থক আত্মপ্রচার করা ভালো নয় । তার চেয়ে মহাজ্ঞানী মহাজনদের প্রসঙ্গে আসি । হায়দ্রাবাদে সদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্ব হাস্যরস সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গ্যাডগিল প্রবীণ নেতা নাম্বুদ্রিপাদ সম্পর্কে একটি মজার গল্প বললেন । কমরেড নাম্বুদ্রিপাদকে একদা এক প্রগল্‌ভ সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, 'স্যার, আপনি কি কখনো কখনো তোতলান ?' সুরসিক নাম্বুদ্রিপাদ মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'সব সময়ে নয়, শুধু এই যখন কথা বলি তখন' ।

নাম্বুদ্রিপাদ কথাটা মজা করে বলেছিলেন, তবে কথা বলার সময় না হলেও বক্তৃতা করার সময়ে তোতলা হয়ে যান এমন লোকের সংখ্যা অনেক । এই ধরনের লোকদের স্যার উইনস্টন চার্চিল নামক ইংল্যাণ্ড দেশীয় বিখ্যাত নেতা ও বাগ্মী একটি সুপরামর্শ দিয়েছিলেন ।

চার্চিল বলেছিলেন, কোথাও বক্তৃতা করতে গিয়ে লোক দেখে ঘাবড়িয়ে বা ভড়কে যাবেন না । সমস্ত শ্রোতাকে একসঙ্গে একটা জনতা হিসাবে গণ্য করলে, মঞ্চে বক্তৃতা করতে উঠে দাঁড়িয়ে সামনে ফিটফাট সারিসারি রমণী বসে আছেন আপনারই কথা শোনার জন্যে,একথাভাবলে হৃদয় এবং সেই সঙ্গে চরণদ্বয় একটু কাঁপবেই । কিন্তু শ্রোতাদের একত্রে না দেখে তাঁদের আলাদা আলাদা করে দেখুন ।

ঐ তো ঐ সবচেয়ে সামনের সারিতে চোখে পুরু কাচের চশমা, সাদা-পাকা চুল ভারিক্কি পণ্ডিত গোছের ভদ্রলোক বসে রয়েছেন । একবার ভালো করে লক্ষ করুন, ভদ্রলোক একটা এক নম্বরের বুদ্ধু । সারা জীবন দেশ পত্রিকার বিদ্যাবুদ্ধি কিংবা কাণ্ডজ্ঞানের মত কাঁচা লেখায় মজা পেয়েছে । ওঁকে কেন তোয়াক্কা করবেন ?

আর ঐ যে মাঝের সারিরএকেবারে ডাইনে বসেরয়েছে ছিপছিপে লম্বা,ফর্সা ধারালো ছুরির মত বুদ্ধিমতী যুবতী, ওকে দেখে ভয় পাবেন না । ও আপনার বক্তৃতা শুনতে মোটেই আসেনি, ও এসেছে ওর জামাইবাবুর বক্তৃতা শুনতে । আপনার পরেই ওর জামাইবাবুর বক্তৃতা,সেটা শুনে জামাইবাবুর সঙ্গে ফিরে যাবে । এখন দেখছেন না, বিরক্ত হয়ে বসে বসে হাই তুলছে ।

এবার শেষের দিকে তাকান একবার । ঐ যারা ক্যাটকল করে, বক্তৃতা থামানোর জন্যে, বক্তাকে বিব্রত করার জন্যে এবং নিজেদের মজার জন্যে বেজায়গায় হাততালি দেয়, হুয়া হুয়া করে ডাকে,সব মূর্খ । সব কজন স্কুলফাইন্যালে ইংরেজিতে আর বাংলায় ব্যাক পেয়েছিলো । যতই কোট-প্যান্ট বা ধুতি পাঞ্জাবি পরে আসুক, সব কটা বি-এ ফেল ।

ব্যাস । হয়ে গেলো । এবার সেই মূর্খের সমাজে, হংসমধ্যে বক যথা, আপনার প্রাণে যা চায় বলে যান । এরপরে যেখানে সুযোগ পাবেন সেখানেই অনুরূপভাবে দর্শকবিন্যাস করে তোড়ের মাথায় যা ইচ্ছে বলে যান । নব নব বক্তৃতার উজ্জ্বল দিগন্ত আপনার সামনে

প্রকাশিত হতে থাকবে।

তবে সাবধান করে দিচ্ছি, খুব লম্বা বক্তৃতা মোটেই ভালো নয়। এ সম্পর্কে তিনটি ক্ষুদ্র কল্পকাহিনী আমি উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমটি সকলের জানা। বক্তা বক্তৃতা করতে করতে শুধু কথার খেই নয়, সময়ের খেইও হারিয়ে ফেলেছেন। মধ্য সন্ধ্যায় বলা শুরু করে বক্তৃতা যখন শেষ করলেন রাত বারোটা বেজে গেছে। শেষে লজ্জিতভাবে বললেন, 'আমার হাতে ঘড়ি নেই,একটু বেশি সময় নিয়ে ফেললাম নাকি ?' শেষ শ্রোতাদের মধ্যে এক নিদ্রাতুর ভদ্রলোক বিশাল একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হাতে ঘড়ি না থাক, দেয়ালে তো ক্যালেণ্ডার ছিলো মশায়।'

দ্বিতীয়টি নিশ্চয় কেউ জানেন না। কারণ এই মাত্র আমি জানালাম। এক ভদ্রলোক এক ম্যারাথন বক্তৃতার অন্তে দেখলেন হলে একজন লোকও নেই,শুধু একজন গোঁফওয়ালা ব্যক্তি তাঁর ঠিক সামনে বসে গম্ভীর মুখে তাঁর কথা শুনছে। বক্তা ঐ শেষতম শ্রোতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার লেকচার আপনার কেমন লাগলো ?' লোকটা গোঁফ নাচিয়ে বললো, 'লেকচার কোন্ শালা শুনছে ? আমি শালা নাইট গার্ড আছি। শালা হলে শালা তালা লাগাতে পারছি না। শালা আপনার শালা লেকচার হলো !'

এই গল্পের মর‍্যাল হলো দুটো, দীর্ঘ বক্তৃতা বিপজ্জনক এবং বক্তৃতা শুনে কারো কোন লাভ হয় না। বক্তৃতা-হলের যে নাইটগার্ড তার চেয়ে বেশি বক্তৃতা আর কে শুনেছে জীবনে, কিন্তু তার মুখের কি ভাষা, এতো বক্তৃতা দিনের পর দিন শুনে তার কি উন্নতি হয়েছে !

তৃতীয় গল্পটি আমাকে এক খ্যাতনামা অধ্যাপক বলেছিলেন। তিনি কিছুদিন আগে আমাকে আক্ষেপ করে বললেন, 'দ্যাখো কি লজ্জার কথা। সেদিন বক্তৃতার মধ্যখানে ঘুমিয়ে পড়লাম। সবাই হো হো করে হাসতে লাগলো।' আমি রাধা দিয়ে বললাম, 'এর মধ্যে আপনার লজ্জারই বা কি আছে ? আর অন্যদের হাসবারই বা কি আছে ? বক্তৃতা শুনতে শুনতে অনেকেই ঘুমায়, আমি নিজে তো হামেশাই ঘুমোই।' ভদ্রলোক করুণভাবে হেসে বললেন, 'আরে বক্তৃতা শুনতে শুনতে নয়। আমি বক্তৃতা করতে করতে নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

অন্য এক বক্তার প্রসঙ্গে যাই। তিনি যে-কোনো বিষয়ে বক্তৃতা করতে পারতেন। ইংরেজিতে একটা পুরনো কথা আছে, 'Silence is golden', সেই হীরন্ময় নীরবতা সম্পর্কে একদা তাঁকে পরখ করার জন্যে বক্তৃতা দিতে ডাকা হয়। তিনি সর্বসাকুল্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নীরবতার বিষয়ে পৌনে চার ঘণ্টা বলেছিলেন।

তবে ভদ্রলোকের রসবোধ ছিলো। বক্তৃতার অন্তে শ্রোতারা তাঁকে এতক্ষণ নীরবতা ভঙ্গ করার জন্যে অভিনন্দন জানালো এবং বললো এ বিষয়ে তিনি সম্ভবত সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তারপর তাঁর কাছে শ্রোতারা জানতে চান তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা করার যোগ্যতা তিনি কিভাবে অর্জন করেছেন।

বক্তা ভদ্রলোক বললেন, 'ঐ যে রেকর্ডের কথা বললেন, আমার হয়েছিলো কি, ছোটবেলায় গ্রামোফোনের রেকর্ডের একটা পিন বদলাতে গিয়ে আমার হাতে ফুটে যায়। সে রেকর্ডটা ছিলো আবার ঘষা রেকর্ড। আ সেটাই সংক্রমিত হয়ে সারা জীবন রয়ে গেলো আমার। সেই ঘষা রেকর্ডের মতো বেজে চলেছি, চলেইছি। আর তাছাড়া আমার গুরুদেব বলেছিলেন, বক্তৃতার সময়ে গভীরতার অভাব প্রস্থ দিয়ে পুষিয়ে নিতে। আমি তাই করি। যত বাজে কথা বলি, তত বেশি কথা বলে পুষিয়ে নিতে হয়।'

পুনশ্চ : সম্প্রতি আমরা এক মফঃস্বল শহরে সাহিত্যসভায় গিয়েছিলাম। সেখানে সভাপতি মহোদয় সভার শেষের বক্তৃতায় আমাদের আগমনে কৃতজ্ঞ চিত্তে বললেন, 'এই সব মহান ব্যক্তি এঁদের আমি ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। আমি এই শহরবাসীর পক্ষ থেকে, আমার পক্ষ থেকে, এই জেলার সাহিত্য পাঠকদের পক্ষ থেকে এঁদের শত শত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।'

এরপর বক্তৃতা করবেন

গল্পটি আমি যাঁর কাছে শুনেছিলাম, তিনি কিছু কাল আগে পরলোকগমন করেছেন। নতুন করে এ গল্পটা যাচাই করার আমার কোনো উপায় নেই।

তবে এই গল্পে দুটি ঐতিহাসিক চরিত্র রয়েছে। একজন পরম শ্রদ্ধেয় এবং প্রাতঃস্মরণীয়, দ্বিতীয় জনও খ্যাতনামা কর্মবীর। এই দুজন হলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং স্যার গুরুসদয় দত্ত। দু'জনেই বহুকাল বিগত হয়েছেন। এই লঘু কাহিনীতে তাঁদের নাম ব্যবহার করার জন্য তাঁদের পরলোকগত আত্মার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ব্রতচারী নাচের মহিমা ব্যাখ্যায় এবং তার দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনায় গুরুসদয় তখন ক্লান্তিহীন। একদিন সকালবেলা কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একটি সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতি, গুরুসদয় বক্তাদের একজন।

সভার উদ্দেশ্য বা বিষয় যাই হোক, গুরুসদয় মঞ্চে উঠে বক্তৃতা আরম্ভ করে কোনোরকম ভণিতার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি ব্রতচারী বিষয়ে চলে গেলেন। ব্রতচারী যে কোনো নতুন, ভুঁইফোঁড় বা খেলো ব্যাপার নয় এই তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়।

গুরুসদয়ের বক্তৃতার দুটি অংশ। একটি অংশ ভৌগোলিক এবং দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক। ভৌগোলিক অংশের বিষয়বস্তু হলো পৃথিবীর দেশে দেশে ব্রতচারী। পৃথিবীর সমস্ত দেশে নানারকম নামে ব্রতচারী নাচ রয়েছে। রেডইণ্ডিয়ানদের বাঁশনৃত্য, জুলুদের নরমুণ্ড নৃত্য,

আমাদের রাইবেঁশে নাচ, এমনকি সাহেব-মেমদের বলড্যান্স পর্যন্ত আসলে ব্রতচারী নাচ, গুরুসদয় দীর্ঘ ব্যাখ্যা করে প্রাঞ্জলভাবে শ্রোতাদের বোঝালেন।

অতঃপর ঐতিহাসিক অংশ। সাড়ে ন'টায় গুরুসদয় মঞ্চে উঠেছিলেন, ঐতিহাসিক অংশে প্রবেশ করলেন সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তখন হল প্রায় খালি। সুখের বিষয় পৃথিবীর ইতিহাসে না গিয়ে ভারতীয় ইতিহাসেই তিনি রইলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ব্রতচারী নাচ, মহেঞ্জোদারো-হরাপ্পার পুতুলে ব্রতচারী, সিন্ধুসভ্যতায় ব্রতচারীর অবদান, তারপর বেদের যুগ, উপনিষদ। রামায়ণে রামচন্দ্রাদি এবং মহাভারতের যুধিষ্ঠিরাদির ব্রতচারী শিক্ষা। সম্রাট অশোকের শিলালিপিতে ব্রতচারীর মাহাত্ম্য, গুপ্তযুগ, পাঠান-মোগল অবশেষে ইংরেজ রাজত্বে এসে প্রায় আড়াই ঘণ্টার ধাক্কা।

গুরুসদয় দত্ত যখন বক্তৃতা শেষ করলেন ঘড়ির কাঁটা প্রায় দুটোর ঘরে। সভাপতির আসনে ক্লান্ত, অবসন্ন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় কয়েকজন উদ্যোক্তা এবং শ্রোতাহীন শূন্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের বিশাল হল তখন থমথম করছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাড়ি চলে গেলেন। তাঁর স্নানাহারের সময়ের আজ ব্যতিক্রম হয়েছে। এদিকে বিকেলে পাঁচটার সময় অ্যালবার্ট হলে তাঁর আরেকটা সভায় সভাপতিত্ব করার কথা। প্রফুল্লচন্দ্র আলস্যবিমুখ। সময়নিষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু তিনি সেদিন অবেলায় মধ্যাহ্ন ভোজন করে জীবনে প্রথমবার দিবানিদ্রায় মগ্ন হলেন। প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ ধড়ফড় করে জেগে উঠে দেখেন অ্যালবার্ট হলের সভার উদ্যোক্তারা তাঁর বাড়িতে বসে অপেক্ষা করছেন, প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। উদ্যোক্তারা বললেন যে তাঁরা বহুক্ষণ এসেছেন তবে আচার্যের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে তাঁরা চাননি। একটু দেরি হয়ে গেছে কিন্তু সে জন্যে কোনো অসুবিধে নেই, সভার কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আচার্যের তাড়াতাড়ি করার দরকার নেই, ধীরে-সুস্থে গেলেই হবে।

আচার্য অবশ্য ধীরে-সুস্থে গেলেন না, তিনি বেশ লজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। খুব দ্রুত জামাকাপড় পালটিয়ে নিয়ে যখন উদ্যোক্তাদের সঙ্গে অ্যালবার্ট হলে ঢুকছেন, মঞ্চে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ব্রতচারী আন্দোলনের ভৌগোলিক অংশ শেষ করে সবে ঐতিহাসিক অংশে এসে পৌঁছেছেন।

অ্যালবার্ট হলের দরজায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একেবারে যাকে বলে থ মেরে গেলেন, সকালের এবং দুপুরের অভিজ্ঞতা ঐ মেধাবী পুরুষ এখনো বিস্মৃত হননি। অন্যদিকে গুরুসদয় দত্ত আচার্যকে দেখে আরো উত্তেজিত হয়ে গেছেন, একই দিনে দু'বার প্রফুল্লচন্দ্রকে ব্রতচারী কথা শোনানোর আনন্দে তিনি এখন উৎফুল্ল।

কিন্তু আচার্য কোনো সামান্য ব্যক্তি নন, তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি এবং স্পষ্টবাদিতা সর্বজনবিদিত, তিনি অ্যালবার্ট হলের সভাপতির আসনের দিকে এগোতে এগোতে শুনলেন, গুরুসদয় দত্ত সকালের মতই ব্রতচারী কথা সবিস্তারে বলছেন। প্রফুল্লচন্দ্র যখন দেখলেন যে গুরুসদয় দত্ত ঐতিহাসিক ভাগ সবে শুরু করেছেন তিনি গুরুসদয়বাবুর পাশে গিয়ে প্রায় সকলকে শুনিয়ে অনুরোধ করলেন, 'গুরুসদয়বাবু সবটা দরকার নেই, সভার আরো কাজ আছে, আপনি বরং মোগলযুগ থেকে শুরু করুন।'

মাও সে তুং, (একালের তাঁর নামের বানানের যে নতুন বিন্যাস হয়েছে তা আমার মনে থাকে না) তাঁর বহুপঠিত বহু আলোচিত লোহিত গ্রন্থে লিখেছিলেন, 'বক্তৃতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। সভাও খুব দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়'।

মহান নেতার এই নির্দেশ বহু বক্তাই মান্য করেন না কিংবা মনে মনে মান্য করলেও মঞ্চে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হন। কলকাতার একটা খবরের কাগজের অফিসে রিভলভিং ডোর আছে, সেই সদা ঘূর্ণমান দরজা ঘুরছে তো ঘুরছেই,তার আর থামা নেই। বহু বক্তার বক্তৃতা শুনেই আমার ঐ অনন্ত ঘুরন্ত দরজার কথা মনে পড়ে।

অনেকদিন আগে এক বক্তৃতা সভায় জনৈক শ্রোতার মন্তব্যও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। জাতিপুঞ্জে কৃষ্ণমেনন বা পরবর্তীকালে জুলফিকার আলি ভুট্টোর মত রেকর্ড দৈর্ঘের বক্তৃতা না হলেও এক ভদ্রলোক একটি অতিদীর্ঘ এবং একঘেয়ে বক্তৃতা করছিলেন, আর মাঝে মধ্যে সামনের টেবিলের উপরে রাখা একটা কাচের গেলাস থেকে অল্প অল্প জল চুমুক দিয়ে খাচ্ছিলেন। দৃশ্যটি দেখে উক্ত শ্রোতা মহোদয় মন্তব্য করেছিলেন, 'বাবা, এত বড় একটা কারখানা ঘন্টার পর ঘন্টা শুধু জলে চলছে। বাবা, ভাবাই যায় না'।

বক্তৃতা করা সম্পর্কে খুব দুঃখের গল্প আছে স্টিফেন লীককের। লীকক সাহেব শুধু সুরসিক লেখক নন, তিনি একজন খ্যাতনামা অর্থনীতির অধ্যাপকও ছিলেন, খুব সম্ভব ক্যানাডায় ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন সময় নানা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করতে যেতেন। খুবই সরস এবং সুচিন্তিত তাঁর বক্তৃতার চাহিদা কিছু কম ছিলো না।

একবার লীকক গিয়েছিলেন মার্কিন দেশের একটি ছোট শহরের এক সামান্য প্রতিষ্ঠানে। সেখানে বক্তৃতা করার পর সভার উদ্যোক্তারা লীকক সাহেবের হাতে আড়াইশো ডলারের একটা চেক তুলে দিলো। প্রতিষ্ঠানটির চেহারা দেখে লীকক বুঝতে পেরেছিলেন যে এদের অবস্থা যথেষ্ট সচ্ছল নয়। তিনি ভদ্রতা করে চেকটা ফেরত দিয়ে দিলেন, বললেন, 'আ-'কে টাকা দিতে হবে না। বরং এ টাকাটা আপনারা আপনাদের প্রতিষ্ঠানের কোনো ভালো কাজে ব্যয় করবেন'। উদ্যোক্তারা বিনা বাক্যব্যয়ে চেকটি গ্রহণ করলো। বিদায় নিতে নিতে লীকক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা আপনারা এ টাকাটা কীভাবে ব্যবহার করবেন?' কোনোরকম চিন্তাভাবনা না করে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান কর্মকর্তা বললেন, 'সামনের বছরের অনুষ্ঠানে একজন ভালো বক্তা আনার জন্যে আমরা এ টাকাটা তুলে রাখছি'।

বলা বাহুল্য স্টিফেন লীকক নিজেই নিজের সম্পর্কে এই গল্পটি বলেছিলেন এবং সে জন্যেই গল্পটি চমৎকার।

বক্তৃতা সংক্রান্ত শেষ গল্পে আমরা আবার ইতিহাসে ফিরে যাবো। তার আগে একটা ব্যাপার একটু বলে নিই। সাহেবদের দেশে ভোজ-বক্তৃতা বা আফটার ডিনার স্পীচ বলে একটা রীতি আছে। নৈশ্যভোজের শেষে ভোজসভার বিশেষ অতিথি বা অন্য কাউকে বক্তৃতা দিতে হয়। যাঁরা বক্তৃতা করতে পারেন না বা চান না এবং যাঁরা বক্তৃতা শুনতে চান না তাঁরা অনেকেই ঐ বক্তৃতার ভয়ে অনেক সময় ভোজসভা এড়িয়ে চলেন।

এই ভোজ-বক্তৃতা সম্পর্কেই এই ঐতিহাসিক গল্পটি। প্রাচীন রোম রাজত্বের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি। খ্রীস্টানদের চারদিক থেকে খুঁজে খুঁজে ধরে এনে জীবন্ত অবস্থায় সিংহ দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। স্বয়ং রোমান সম্রাট স্বচক্ষে এই নৃশংস নিধনকাণ্ড দেখে পৈশাচিক আনন্দ পাচ্ছেন।

বধ্যভূমিতে একজন খ্রীস্টানকে ঠেলে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। তারপর খাঁচা থেকে সিংহ ছেড়ে দেওয়া হলো, সিংহ ছুটে এসে লোকটিকে ছিন্নভিন্ন করে খেয়ে

ফেললো। এইরকম চলছে দিনের পর দিন। কিন্তু সেদিন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। সেদিন যাকে বধ্যভূমিতে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো সে কিন্তু সিংহকে দেখে ভয় পেলো না। বরং সরাসরি সিংহের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার কানের কাছে কি যেন ফিসফিস করে বললো এবং সঙ্গে সঙ্গে দুর্দান্ত সিংহ লেজ গুটিয়ে ছুটে খাঁচার মধ্যে পালিয়ে গেলো তার শিকারকে স্পর্শ না করে।

অন্য সিংহ আনা হলো। তারপরে আরো আরো ক্ষুধার্ত হিংস্র সিংহ। কিন্তু যেই তারা বধ্যভূমিতে ঢোকে, লোকটি কি যে তাদের কানে কানে বলে, সিংহ লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়।

শেষে ক্লান্ত হয়ে সম্রাট বধ্যভূমি থেকে ঐ খ্রীস্টোপাসকটিকে ডেকে পাঠালেন, জানতে চাইলেন, 'তুমি কি বলছো যাতে সিংহরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে!' সেই ব্যক্তি বললো, 'সম্রাট, যে সিংহই আমাকে খেতে আসছে আমি তার কানে কানে বলছি, 'আমাকে খেতে চাও খাও। কিন্তু সাবধান, মনে রেখো, আমাকে খাওয়ার পরে তোমাকে কিন্তু বক্তৃতা দিতে হবে'। সঙ্গে সঙ্গে সিংহ বেচারা ভয়ে লুকিয়ে পড়ছে'।

তালা

সেই যে টর্চলাইটের গল্পে আমাদের পুরনো কালীঘাট বাড়িতে চোরের কথা লিখেছিলাম, সেই চোর সে-রাতে টর্চলাইট ফেলে পালিয়ে ছিলো। তারপর কিন্তু সে দু'এক সপ্তাহের মধ্যে ঐ ফেলে যাওয়া টর্চলাইটের শোকেই হোক বা অন্য কারণেই হোক আমাদের বাড়িতে আবার ফিরে আসে।

অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে সেই একই চোর আসেনি পরের রাতে, অন্য কোনো নতুন চোর এসেছিলো। তবে সাধারণত এরকম হয় না, এক চোর যে বাড়িতে বা যে এলাকায় চুরি করে অন্য চোর সেখানে যায় না। তবু আমাদের বাড়ির ঢিলেঢালা ভাব অন্য কোনো নতুন চোরকেও প্রলুব্ধ করেছিলো এমন হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

সে যা-হোক আমাদের এ দফার প্রসঙ্গ চোর বা টর্চলাইট নয়, এবারের প্রসঙ্গ তালা।

অনেকে হয়তো আমাকে দুঃসাহসী ভাবছেন, কারণ অল্প কিছুদিন আগেই শ্রীযুক্ত সুভো ঠাকুর অতিশয় রোমাঞ্চকর একটি নিবন্ধ লিখেছেন, বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩১১, 'তালার তল্লাশে'। সেখানে সুভো ঠাকুর ব্যাঘ্রোপম, নর্তকীসদৃশ এমনকি সঙ্গীতপরায়ণ বিচিত্র সব তালার কথা বলেছেন।

আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে এ সবের মধ্যে যাবো না। আমরা শুধু আমাদের নিজেদের তালার কথা বলবো।

তখন কালীঘাটের ভগ্নগৃহে শুধু আমি আর আমার দাদা থাকি। দুবেলা হোটেলে খাই, সকালে একটি কাজের মেয়ে এসে ঘর ঝেড়ে, জল তুলে দিয়ে যায়। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতি সঙ্গীন ; জিনিসপত্র, দ্রব্যসামগ্রী বলতে প্রায় কিছুই নেই। তালার দরকার খুব

ছিলো না কিন্তু আমাদের তালাটি আমরা দু ভাই পেয়েছিলাম উত্তরাধিকারসূত্রে। দেশবিভাগের আগে পূর্ববঙ্গে আমার মাতামহের পাটের ব্যবসা ছিলো। সেই পাটের গুদামের তালা। অতিকায় আকার এবং ভারি ওজন। তালাটির গায়ে লেখা ছিলো, হবস্ অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, লক অ্যাণ্ড কি ম্যানুফাকচারার্স্. লণ্ডন ১৮৭২। নিচের দিকে লেখা সেভেন লিভারস এবং পিছনে একটি নম্বর XY218 (এক্সওয়াই ২১৮)।

আমার স্বর্গত মাতামহ দেশবিভাগের পর প্রায় কিছুই আনতে পারেননি গ্রাম থেকে, শুধু এক বাক্স তালা এনেছিলেন। ঐ রকম ভারি ভারি তালা প্রায় তিরিশ-চল্লিশটি। তিনি যে বাক্সে ঐ তালাগুলি (সঙ্গে আর অল্প কিছু জিনিস) এনেছিলেন সেই বাক্সটি স্টিমারঘাটে বা রেলস্টেশনে কোনো একজন কুলির পক্ষে উত্তোলন করা সম্ভব হয়নি।

মাতামহ কলকাতা আসার পর আত্মীয়-পরিচিতদের মধ্যে তালাগুলি বিলিয়ে দেন। ভাগে আমি আর দাদাও একটি তালা পাই। এই মহামূল্যবান তালাটি লাভ করে অগ্রজ মহোদয় আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাড়ি ফিরে এলো। কিন্তু কিছু পরে খেয়াল হলো, তালা আনা হয়েছে কিন্তু চাবি কই!

সেই দিন ততক্ষণাৎ দাদা আবার ছুটে গেলো মাতামহের কাছে চাবি আনতে। মাতামহ খুব ধমকে দিলেন, 'তোমাদের লোভ বড় বেশি। আমরা অল্প বয়সে এমন ছিলাম না। তালা পেয়েছো তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। আবার চাবি চাইছো?'

দাদা বললো, 'চাবি ছাড়া তালা দিয়ে কি হবে' মাতামহ এ কথায় খুবই বিস্মিত হলেন, 'তোমরা কি তালাটা ব্যবহার করবে ভেবেছো নাকি?' দাদা গুম মেরে গিয়ে বললো, 'তবে?' 'তোমাদের পূর্ববঙ্গের মাতুলালয়ের পবিত্র স্মৃতি। সারাজীবন ঐ তালাকে ভক্তি

শ্রদ্ধা করবে, পুজো করবে।'

বিহ্বল দাদা ফিরে এলো। পরের দিন চতুরতর আমি গেলাম। আমাকেও পূজনীয় মাতামহ প্রায় একই রকম কথা বললেন। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা গোলমেলে। মাতামহ তড়িঘড়িতে বাড়ি ছেড়ে আসতে গিয়ে তালাগুলো নিয়ে এসেছেন কিন্তু চাবিগুলো, কোথায় আলাদা করে রাখা ছিলো, সেগুলো ফেলে এসেছেন। যদি তিনি আবার গ্রামে ফিরে যেতে পারেন এবং চাবিগুলো পান, তাহলে তালাগুলো ব্যবহারযোগ্য হবে, না হলে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেই ব্যবহৃত হবে।

আমরা বুঝে ফেলেছিলাম মাতামহের আর দেশে ফেরা হবে না, সুতরাং দাদা সিদ্ধান্ত নিলো এ তালা রেখে কোনো লাভ নেই,তার চেয়ে আদিগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসা ভালো।

সেই সময় আমাদের মহিম হালদার স্ট্রিটের পাড়ার শেষপ্রান্তে একজন বিলেত ফেরত পাগল থাকতেন, তিনি কোনো কোনো ঠাণ্ডার রাত্রিতে বাড়ির সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে উদাত্ত গলায় গাইতেন,

লণ্ডন টণ্ডন গ্ল্যাসগো,
গো ওয়েস্ট গন গো।'

দাদা যখন গঙ্গায় তালা ফেলতে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে দেখা, কিঞ্চিৎ শুনে তিনি বললেন, 'হবস্ কোম্পানিব তালা গঙ্গায় ফেলতে যাচ্ছো ! এ তো টেমসে ফেলতে হবে। না হলে মহাপাপ হবে।'

আমার দাদা, চিরকাল খুব সাহেব ভক্তি ছিলো তার, দাদা তালা নিয়ে ফিরে এলো। হবস্ কোম্পানির বিলিতি তালা গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া মহাপাপ না হোক,অন্যায় হবে সেটা দাদা বুঝতে পেরেছিলো।

শেষে আমরা দুভাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম এত বড় তালা ফেলে রেখে লাভ নেই। আর এই ভাঙা বাড়ির সদর দরজায় যদি তালাটা ঝোলানো যায় তাহলে বাড়ির চেহারা খুব খোলতাই হবে। আমাদের একটা মরচে ধরা বারো আনা দামের টিনের তালা ছিলো। আমরা ঠিক করলাম পাটগুদামের তালাটায় চাবি বানিয়ে নিয়ে অই পুরনো তালাটাকে ফেলে দেবো।

এত বড় তালার চাবি সাধারণ তালা মেরামতওলারা কেউ বানাতে চাইলো না। সেই বিলেত ফেরত পাগল বললেন, যদি তালাটা রেজিস্ট্রি পার্সেল করে লণ্ডনে হবস্ কোম্পানির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহলে তারা বছর দুয়েকের মধ্যে চাবি সুদ্ধ পাঠিয়ে দেবে।

ডাকঘরে, জিপিওতে, কাস্টমস অফিসে অনেক ঘুরলাম বিলেতে তালা পাঠানোর কি নিয়ম, চাবিসুদ্ধ তালা ফেরত আসারই বা কি নিয়ম, কত শুল্ক, কত মাশুল, কত টিকিট—কেউ কিছু বলতে পারলো না।

তখন আমরা একটা বুদ্ধি বার করলাম। আমরা মানে দাদারই বুদ্ধি, আমি শুধু সায় দিলাম। বাইরের দরজায় টিনের তালাটার নিচে একটা পেরেক লাগিয়ে এই বড় তালাটাও ঝুলিয়ে দেবো। বাইরে থেকে মনে হবে দুটো তালা লাগানো রয়েছে।

অবশ্য আমাদের এই চাতুর্য খুব কাজে লাগেনি। দরজায় ডবল তালা দিয়ে দু'চারদিন পরে একদিন রাতে আমি আর দাদা চেতলাহাটে রামযাত্রা শুনতে গেছি। ফিরে এসে দেখি বাড়িতে আবার চোর এসেছিলো। সমস্ত উলোট-পালোট, তবে কিছুই পায়নি, নিতে পারেনি। শুধু যাওয়ার সময় সদরের হবসের অচল তালাটা নিয়ে গেছে, টিনের ঠুনকো

তালাটি ফেলে গেছে ফুটপাতে।

দাদা খুব দুঃখিত হলো। এত বড় পারিবারিক মর্যাদার জিনিস চোর নিয়ে গেলো—যেন কোহিনুর বা ময়ূর সিংহাসন হাতছাড়া হয়েছে। কিন্তু দাদাই আবার তালাটা উদ্ধার করলো। সতর্ক দৃষ্টি ছিলো দাদার, একদিন কালীঘাট বাজারে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর চোখে পড়লো এক বন্ধ মুদির দোকানের দরজায় সেই তালাটি লাগানো। সেই হবস্ অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, লণ্ডন ১৮৭২ থেকে দুশো আঠারো নম্বর পর্যন্ত দাদা তালা উলটিয়ে মিলিয়ে দেখলো। তারপর পাশের দোকান থেকে খোঁজ নিয়ে একেবারে মুদিওলার বাড়িতে। মুদির ছেলের বিয়ে তাই দু'দিন দোকান বন্ধ রেখেছে।

দাদা যখন বিয়ে বাড়িতে পৌঁছালো তখন সদ্য বধূবরণ হচ্ছে। মুদিপুত্র বাসি বিয়ে সাঙ্গ করে নববধূ নিয়ে বাড়িতে এসে পৌঁছেছে। দাদা এরই মধ্যে একটু আড়ালে মুদি ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে সরাসরি বললো, 'আমাদের হবসের তালাটা আপনার দোকানে কেন লাগানো রয়েছে!' কথাটা শুনে দোকানদারের মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো, তারপর স্বগতোক্তি করলেন, 'তখন রামুকে মানা করেছিলাম', বলে তিনি, 'রামু রামু' বলে চেঁচাতে লাগলেন।

বামুই বর, সে এই মাত্র বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে। সে উঠোনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আড়চোখে নববধূর সৌন্দর্যসুধা পান করছিলো। তার কপালে এখনো চন্দনের ফোটা জ্বলজ্বল করছে, একটু আগে শ্বশুরবাড়ি থেকে সাজিয়ে দিয়েছে। তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার আংটি, বরের সাজসজ্জা ছাড়ার এখনো সে ফুরসত পায়নি।

পিতৃদেবের কর্কশ আহ্বান শুনে রামু এগিয়ে এলো। বাবার সামনে দাঁড়াতেই নববিবাহিত পুত্রকে বাবা তেড়ে এলেন, 'যাও এবার জেল খাটো। এক শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে, আরেক শ্বশুরবাড়িতে যাও।' রামু কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো। তখন দাদা বললো, 'আমাদের তালাটা।' তালার কথা বলতেই রামুর মুখও ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। রামুর বাবা এবার কোমর থেকে দুটো চাবি বার করে রামুকে দিয়ে বললেন, 'শোবার ঘরের তালাটা নিয়ে দোকানে লাগিয়ে দাও। আর এই ভদ্রলোকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তালাটা ফেরত দিয়ে দাও। পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।'

সদ্যবিবাহিত রামুকে দাদা পায়ে ধরার অমর্যাদা থেকে রেহাই দিলো। রামুর বাবা দাদাকে দই-মিষ্টি খাওয়ালেন, ইত্যবসরে রামু দোকান থেকে তালাটা নিয়ে এসেছে।

শুধু তালা নয়, সঙ্গে একটা চাবি। দোকানদারই বোধহয় কোনোভাবে বানিয়ে নিয়েছিলো।

দাদা বলেছিলো, 'যতদিন রামুর স্বভাবচরিত্র না পালটায় এ তালা ব্যবহার করবি না। ওর কাছে আরেকটা চাবি থাকতে পারে। রামুর স্বভাবচরিত্র পালটানোর আগেই আমরা পাড়া পালটেছি। দাদাও বহুদিন নেই। কিন্তু হবসের তালাচাবি আছে, এখনো আমরা নিরাপদে ব্যবহার করি।

তালালীলা

আমাদের কিশোর বয়েস যে সুদূর মফস্বল শহরে কেটেছে সেখানে আরো অনেক অদ্ভুত এবং বিচিত্র জিনিসের সঙ্গে একটা ব্যাপার ছিলো, 'মার কৈলাস, ভাঙ্ তালা, দে চাবি।' আমি জানি না আর কোথাও এই বাক্যবন্ধ প্রচলিত ছিলো কিনা।

তিন চার জন বন্ধু এক সঙ্গে হাঁটছে বা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে, হঠাৎ তাদের মধ্যে একজন বললো, 'মার কৈলাস', সঙ্গে সঙ্গে অন্য কাউকে বলতে হবে 'ভাঙ্ তালা', এবং শেষের জন বলবে,'দে চাবি'। তারপর আবার যে কে সেই, তারা যেমন চলছিলো বা কথাবার্তা বলছিলো আবার তাই চললো।

এর মানে কি ? এ কি কোনো নিষিদ্ধ মন্ত্র, নাকি কোনো গুপ্ত সংগঠনের সঙ্কেত ধ্বনি ? শুনলে মনে হয় যেন বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। কতবার গম্ভীর আলোচনাসভায়, স্বভাব-ভীরু শিক্ষকমহাশয়ের ক্লাসে হঠাৎ শুনেছি পরপর চিৎকার, 'মার কৈলাস, ভাঙ তালা, দে চাবি।' তারপর সব চুপচাপ। এমনকি কারা এই ইয়ার্কিটা করলো এবং কেন করলো, সেটা অনেক সময়েই ধরা সম্ভব ছিলো না।

আজ পর্যন্ত এই রহস্যের কোনো সমাধান আমি করতে পারিনি। আমি জানতে পারিনি কি কাহিনী বা কি কাণ্ড লুকিয়ে আছে এই কথা কয়টির পশ্চাতে। কি সেই নৈমিত্তিক বা সাময়িক কারণ যার জন্যে লোকেরা হঠাৎ এরকম করতো সে আমার আজও বোধগম্য হয়নি।

তা ছাড়া সেই কিশোর বয়েস থেকেই এই বাক্যমালা নিয়ে আমার আরো একটা সমস্যা আছে সেটাও আজ পর্যন্ত সমাধান করে উঠতে পারিনি। ব্যাপারটা ঠিক সমস্যা বলা উচিত হবে না ; বরং একটা খটকা, যদি তালাই ভাঙা হয় তবে আর চাবির দরকার কি। অথবা এমন হতে পারে চেষ্টা করেও তালা ভাঙা যায়নি তাই চাবি চাওয়া হচ্ছে!

তালা খুব গোলমেলে ব্যাপার। শ্যালক থেকে যেমন শালা, তালক থেকে তেমনই তালা। তালক শব্দটি সংস্কৃত, বেশ পুরনো শব্দ।

তালাচাবি আজ-কাল-পরশুর ব্যাপার নয়। যেদিন থেকে মানুষের সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছে, সেই আদি যুগ থেকে তালা-চাবি, খিল-দরজা-কুলুপ চালু হয়েছে। সবাই চেয়েছে নিজের সীমানা, নিজের সম্পত্তি রক্ষা করতে।

তালাচাবির ইতিহাস লেখার জায়গা এটা নয়। আর তাছাড়া এ বিষয়ে ইংরেজিতে একটা চমৎকার সচিত্র গ্রন্থ আছে। তালাচাবি সূত্রে এবার আমাদের নিজেদের হবস্ তালাটির কথাই আবার বলবো।

আমাদের এই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচীন তালাটি এখনো আমরা ব্যবহার করে যাচ্ছি কিন্তু অন্য কেউ হলে করতো কিনা বলা কঠিন।

তালাটি খুবই রাসভারি দেখতে। নিচের অংশ একদম চৌকো আকারের, প্রস্থে দৈর্ঘ্যে দশ সেন্টিমিটার করে আয়তন একেক পিঠে একশো স্কোয়ার সেন্টিমিটার। তারপর বহুদিনের ব্যবহারে এর গায়ের পুরনো পিতল সোনার মত ঝকঝক করছে। স্বভাবতই এই তালাটি লোকের মনে সম্ভ্রম জাগায়, আমরাও এই তালার সুবাদে পারিবারিক গৌরবে কিছুটা মহিমান্বিত হয়ে উঠি।

দুঃখের বিষয়, তালাটির এই মহান চেহারা একদিকে যেমন আমাদের পক্ষে গৌরবজনক

অপরদিকে অত্যন্ত বিপজ্জনকও বটে। তালাটি অতি সহজেই তস্করের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা পেশাগত কৌতূহলবশত, সুযোগ পেলেই তালাটি ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে।

তালাটিকে দেখলেই বোঝা যাবে এর উপরে বহুবার বহুরকম ঝড় বয়ে গেছে, এর শরীরের নানা অংশে কাটাকুটি টানাপোড়েনের দাগ।

এইখানে কৃতজ্ঞচিত্তে অবশ্যই প্রথমে স্বীকার করে নেওয়া উচিত হবে যে আজ পর্যন্ত কিন্তু শতচেষ্টা সত্ত্বেও কোনো চোর এই তালা খুলতে বা ভাঙতে পারেনি।

তবে চোরেদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, চাবি দিয়েও এ তালা খোলা সোজা নয়। এই তালা খোলার বাধাগুলো অনেক। তার মধ্যে দু-একটির বর্ণনা করছি।

যে কোনো বড় তালার মতই এই তালাটির চাবি ঘোরানোর জায়গার উপরে একটি ঢাকনা আছে, যেটাকে দিয়ে চাবি দেওয়ার জায়গাটা ঢেকে রাখা হয় এবং প্রয়োজনের সময় যেটাকে উপরে তুলে তালার মধ্যে চাবি ঢোকাতে হয়।

এইখানেই প্রথম বাধা। আমাদের তালা খোলার চেয়ে তালার উপরের ঐ ঢাকনা খোলা অনেক বেশি কঠিন এবং কখনো কখনো প্রায় অসম্ভব।

তালা খোলার চাবি রয়েছে কিন্তু তালার ঢাকনা খোলাব জন্যে তো কোনো চাবি থাকে না। সুতরাং পুরোটা ভাগ্যের উপর ভরসা ; খেয়াল-খুশি মতো এই ঢাকনাটি খোলে। একেক সময় হাজার চেষ্টা করলেও ঢাকনাটি খোলা যায় না, মনে হয় যেন কোনো কেমিক্যাল আঠা দিয়ে কেউ পাকাপাকিভাবে আটকিয়ে দিয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত কখনোই ঐ হবসের ঢাকনাটি পুবোপুরি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। যখন আমরা গৃহপ্রবেশের সব আশা জলাঞ্জলি দিয়ে, মধ্যরাতে নাইট-শো সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরে আধঘণ্টা নিজের দরজার

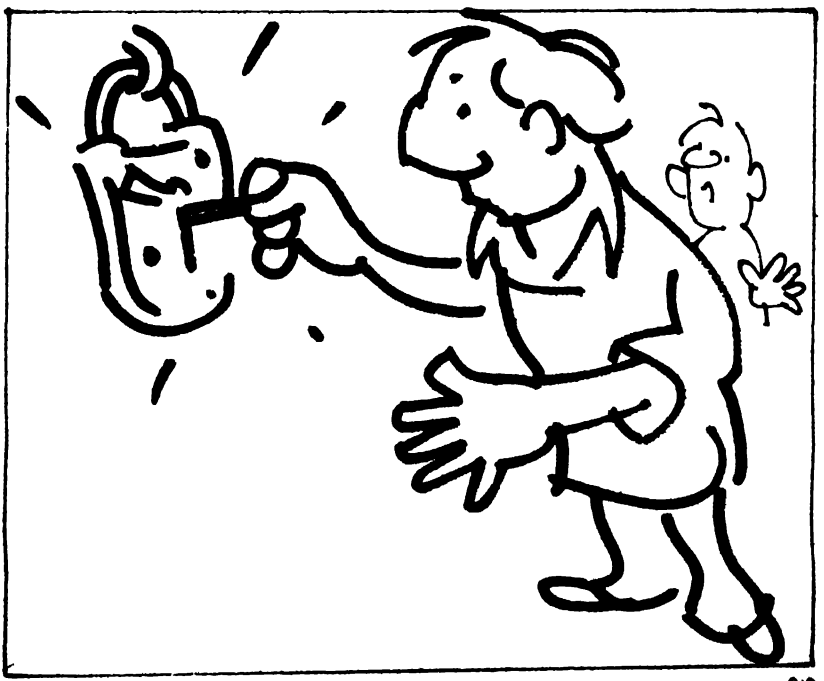

সামনে পা ধরিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, তালা ধরে অক্লান্ত টানা-হেঁচড়া করে ঢাকনাটিকে এক চুলও নড়াতে না পেরে রাত কোথায় কাটাবো ভাবছি, ঠিক সেই সময় যেন কিছুই কিছু নয় জলের মত ঢাকনাটি খুলে যায়।

আমরা জানি ঢাকনা খুলবেই। কিন্তু ঠিক কতক্ষণে খুলবে তা জানি না। এরপর তালার ঢাকনা খোলার প্রথম পর্ব শেষ হলে আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হয়।

পরবর্তী কার্যক্রম মানে মূল তালাটি। প্রথমেই বলে রাখা ভালো কোনো এক অজ্ঞাতকারণে কোনো স্বাভাবিক চেহারার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা বমণীর পক্ষে সরাসরি এ তালা খোলা সম্ভব নয়।

রহস্যটি আমরা বহ্‌কাল আগে আবিষ্কার করেছিলাম, যখন আমাদের ছেলের বয়েস আট-নয়, যখন তার উচ্চতা সাড়ে তিন ফুট। একদিন যথারীতি বাড়ি ফিরে এসে হাজার চেষ্টা করেও তালা খুলতে পারলাম না। যখন ভাবছি প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে হাতুড়ি নিয়ে এসে তালাটা ভেঙে ফেলা যায় কিনা, যদিও মনে মনে জানি সেটা অসম্ভব, হাতুড়ি ভাঙবে, দরজা ভেঙে যাবে। (দুটোই আগে হয়েছে) তবু তালা ভাঙবে না, ঠিক সেই মোক্ষম মুহূর্তে নাবালক ছেলে একবার মাত্র চাবি ঘুরিয়ে তালাটি খুলে ফেললো।

এখানে একটু বুঝিয়ে বলার দরকার। চাবি ঢোকানোর পরে এই তালাটি দু'ভাবে নিজের উন্মোচনে বাদ সাধে। এক হলো, চাবি তালার মধ্যে জলের মত ঘুরে যায়, বারবার যতবার ইচ্ছা ঘোরাও, বাঁয়ে-ডাইনে, ক্লকওয়াইজ, অ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ, খোলার কায়দায়, বন্ধ করার কায়দায় যেদিকে যতবার ইচ্ছে ঘোরাও, চাবি ঘুরছে কিন্তু তালা খুলছে না।

সে এক আশ্চর্য, আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই খুললো, এই বুঝি খুললো, কিন্তু তালা আর খোলে না। স্বামীস্ত্রীর উভয়ের হাতের কব্জিতে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে, তর্জনীতে ব্যথা হয়ে গেলো, মুঠোর কাছটা ফুলে উঠলো, কপালে দরদর ঘাম এবং মনের মধ্যে ধৈর্যহীনতা দেখা দিলো, তবু চিচিং ফাঁক হলো না।

এর চেয়ে ভালো অবশ্য চাবি আটকিয়ে যাওয়া। চাবি ঢোকানোর পর একদম ঘুরলোই না, একেবারে ছেলেদের মার্বেল খেলায় যাকে বলে নট-নড়ন-চড়ন নট-ফট। এক্ষেত্রে চেষ্টার ও পরিশ্রমের অবকাশ কম।

তবে এ দুইয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা আছে, সে অতি বিচ্ছিরি। চাবিটা কিছুটা ঘুরলো তারপর পুরো ঘোরার আগেই আটকে গেলো। সে বড় দুঃখময় অবস্থা। তালার গর্ভে চাবিসুদ্ধ পুরো রিং আটকে গেছে ; তাতে আরো অনেক চাবি। শুধু বন্দী চাবিটিকে রেখে বাকি রিংটুকু মুক্ত করে আনা সেও এক অসম্ভব কসরতের কাজ।

এ সব যা হোক, যেদিন আমরা শিশুপুত্রের মাধ্যমে তালা খোলার সহজ উপায়টি আবিষ্কার করি, সেই কথায় আসছি। আমরা দেখলাম শিশু কৃত্তিবাস রায় কেমন সহজে তালাটি খুলে ফেললো যা আমরা হাজার চেষ্টা করেও পারছি না। বারবার পরীক্ষা করে দেখলাম, কৃত্তিবাস অতি সহজে চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে ফেলেছে, আর আমাদের হাতে চাবি ঘুরছেই না।

ব্যাপারটা বোঝার জন্যে আমি নিচু হয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলাম নিচু হয়ে তালাটার সামনে সাড়ে তিন ফুট উচ্চতায় নেমে আমিও তালাটা সহজে খুলতে পারছি।

এরপর থেকে ছেলে সঙ্গে থাকলে, যতদিন পর্যন্ত তার সাড়ে তিন ফুটের এলাকার

উচ্চতা ছিলো, তাকে দিয়ে তালা খোলাতাম। এখন ব্যাপারটা সহজ করে ফেলেছি, যে-কেউ হামাগুড়ি দিয়ে বা নিল-ডাউন হয়ে তালাটির সমতায় নেমে আসি, প্রাচীন হবস্ তালাটি বিনা বাক্যব্যয়ে সহযোগিতা করে।

তবু রঙ্গে ভরা

এক অভিনেতাকে একবার আদালতে একটি মামালায় সাক্ষী হতে হয়েছিলো। সেখানে শপথ নেবার পরে বিপক্ষের উকিল তাঁকে তাঁর নাম-ধাম, কি করা হয়, ইত্যাদি মামুলি প্রশ্ন করেন। বলাবাহুল্য আর দশজনের মতো বিপক্ষের উকিলেরও ঐ অভিনেতাকে না চেনার কোনো কারণ নেই, বিশেষ করে ইনি যে আজ সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবেন এ খবর রটে যাওয়ায় আদালতে বেশ ভিড় হয়েছে।

তবু মামুলি আদালতি কায়দায় উকিলসাহেব যখন অভিনেতার কাছে জানতে চাইলেন, 'আপনি কি করেন ?' অভিনেতা নির্বিকারভাবে বললেন, 'আমি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।' বিচারক শুনে একটু বিরক্ত হয়ে অভিনেতাকে বললেন, 'আপনি আরেকটু বিনয়ী হতে পারেন না ?' অভিনেতা বিনীতভাবে হেসে বললেন, 'হুজুর, ক্ষমা করবেন। আদালতে শপথ নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারবো না। যা সত্যি তাই বলেছি।'

বিদ্যাবুদ্ধির গোড়ার দিকে 'অভিনয় নয়' লিখেছিলাম। ইতিমধ্যে আমার হাতে একটি প্রাচীন ও অসামান্য গ্রন্থ এসেছে। উত্তর কলকাতার একটি পুরনো গ্রন্থাগার থেকে শ্রীকমলকুমার দত্ত বইটি আমাকে কয়েকদিনের জন্য এনে দিয়েছিলেন। শ্রীদত্ত নিজেও এ সব বিষয়ে চমৎকার লেখেন, তবু এই বইটির গল্পগুলি তিনি নির্বিচারে আমাকে ব্যবহারের অধিকার দিয়েছেন।

ইন্দ্রমিত্রের সেই বিখ্যাত বই 'সাজঘর', পুরনো বাংলা থিয়েটারের অন্দরমহলের বিচিত্র বর্ণনা, সেই বইতে অনেকদিন আগে এ সব গল্প যেন কিছু কিছু পড়েছিলাম। কিন্তু 'সাজঘর' বইটি কবে যেন কাকে দিয়েছিলাম, এখন আর খুঁজে পাচ্ছি না।

সে যা হোক, এবারের প্রথম গল্পটি কিন্তু অন্য সূত্রে পেয়েছি, দ্বিতীয় গল্পটিও তাই। এটা শেষ করে পুরনো বাংলা নাটকের হলে ঢুকবো।

দ্বিতীয় গল্পটি হাসির নয়, দুঃখের। নাটকের উদ্বোধন রজনীতে অভিনয়ের শেষে নায়িকা ফিরে গেছেন তাঁর প্রসাধন কক্ষে। একটু পরেই আর্ত চিৎকার। সবাই ছুটে গেলেন অভিনেত্রীর ঘরে। দেখা গেলো তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন আর বলছেন, 'আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েছে।' পরিচালক দেখলেন নায়িকা-পদপ্রান্তে পাঁচটি অভিনন্দন বার্তা লেখা ফুলের তোড়া পড়ে রয়েছে। নায়িকা সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আমি ছ'টা তোড়ার দাম দিয়েছি।'

এ গল্প অবশ্যই তত পুরনো নয়। আমরা এবার সরাসরি প্রবেশ করছি পুরনো দিনের মিনার্ভা থিয়েটারে। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে জলধরের ভূমিকায় নেমেছেন অর্ধেন্দু মুস্তফী এবং তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন সেকালের বিখ্যাত অভিনেত্রী গুলফন হরি। দুজনেই অত্যন্ত বাক্‌পটু, সুরসিক ; যাকে রাজযোটক বলে একেবারে তাই।

সেদিন নাটক দেখতে এসেছেন সলোমান নামে এক নাটক পাগল ইহুদি সাহেব। মঞ্চের সামনের সবচেয়ে প্রথম সারিতে সলোমান বসে রয়েছেন, তাঁর হাতে একগুচ্ছ ফুলের তোড়া, ফুলের মালা। গুলফন হরি স্বামীর চরিত্রে সন্দিগ্ধা রমণীর ভূমিকায় মুড়োঝাঁটা হাতে মঞ্চের এক প্রান্তে বসে আছেন আজ স্বামীকে হাতেনাতে ধরবেন বলে, এমন সময় সলোমান সাহেব একটা ফুলের মালা গুলফনের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

সেকালের যা রীতি, অভিনেত্রী সসম্মানে মালাটি গ্রহণ করলেন এবং গলায় ধারণ করে ঘোমটা দিয়ে বসে স্বামীকে ধরার জন্যে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ; স্বামীরূপী অর্ধেন্দুবাবু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে দুর্দান্তা স্ত্রীর কাছে যৎপরোনাস্তি নাজেহাল হলেন। তবে আজ মুস্তফী সাহেবের একটা সুবিধে হলো যে গুলফনের গলায় মালা দেখে তাঁকে অভিযুক্ত করলেন, 'আমায় তো কথায় কথায় সন্দেহ করো। বলি এই যে গলায় বাহারের মালা দুলছে, মালাটি দোলালে কে ? বল দিলে কে ?'

সুচতুরা, সুরসিকা গুলফন হরি তখনই অভিনয়ের ছলে সামনে দর্শকের আসনে উপবিষ্ট সলোমান সাহেবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'এই, আমার নন্দাই।'

ঐ মিনার্ভা থিয়েটারেই অন্য একদিন 'আবুহোসেন' মঞ্চস্থ হচ্ছে। সেদিন দর্শকদের মধ্যে

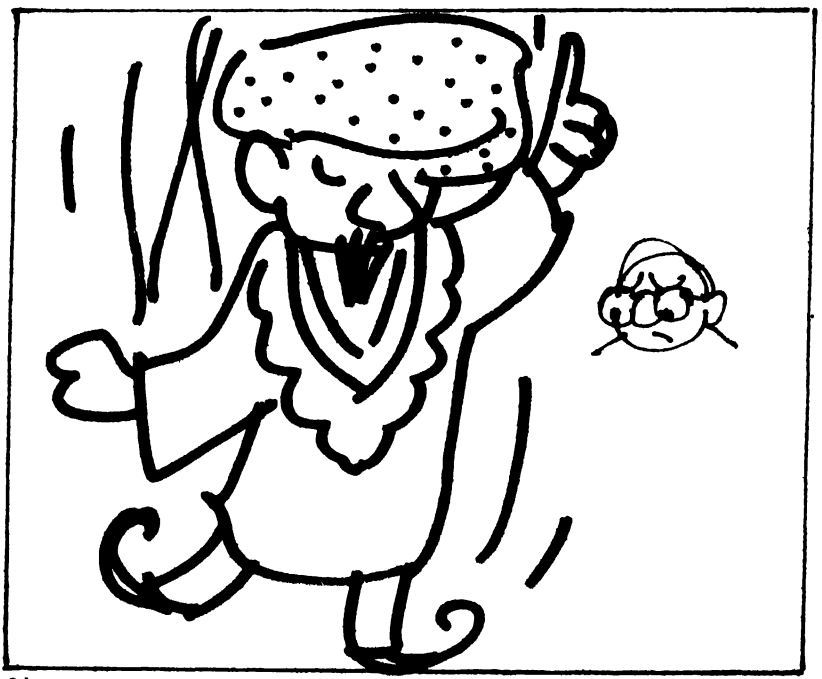

রয়েছেন পুলিস কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট আমীর হোসেন সাহেব। সেকালে নাট্যশালায় রাজপুরুষেরা কেউ এলে তাঁকে যথেষ্ট সমাদর ও সম্মান প্রদর্শন করা হতো।

অর্ধেন্দুশেখর অভিনব উপায়ে রাজপুরুষকে সংবর্ধিত করলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের তৎকালীন পরচুলা সরবরাহকারীর নাম ছিল বাবু হোসেন। আবু হোসেনবেশী অর্ধেন্দুবাবু মঞ্চেপ্রবেশ করে দর্শকদের উদ্দেশে প্রশ্ন করলেন, 'আজ অভিনয় কি হবে ?' তারপর নিজেই উত্তর দিলেন, 'আবু হোসেন।' নিজের মাথার পরচুলায় হাত দিয়ে বললেন, 'এই চুল কে দিয়েছেন ?' তারপর জবাব দিলেন, 'বাবু হোসেন।' এবারে তৃতীয় ও সর্বশেষ প্রশ্ন, 'আর আজ দেখতে এসেছেন কে ?' নিজেই উত্তর দিলেন, 'আমীর হোসেন।' তারপর দর্শকদের মধ্যে রয়াল বক্সে আসীন আমীর হোসেনের দিকে তাকিয়ে একটি রস-মধুর অভিবাদন জানালেন।

রসরাজ অমৃতলাল বসুর দু-একটা গল্পও এই সূত্রে স্মরণ করা যায়। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্রের কাছে রমানাথ নামে এক যুবক জানালেন তিনি একটা অপেরা লিখেছেন, ছাপা হচ্ছে। গিরিশচন্দ্র বললেন, 'নাচ-গান না হলে তো অপেরা হবে না।' কিন্তু রমানাথের কথায় জানা গেল নাটকে নাচ-গান কিছু বিশেষ নেই। এই সময়ে অমৃতলাল বললেন, 'গিরিশবাবু, রমানাথ নাচের ব্যবস্থা করেছে।' গিরিশবাবু হেসে বললেন, 'কি রূপ ?' অমৃতবাবু বললেন, 'যখন রমানাথ বই ছাপতে দিয়েছে, তখন অবশ্যই টাকা আদায়ের জন্য ছাপাখানার বিল রমানাথের বাড়িতে আসবে। সেই বিল দেখলেই রমানাথের বাবা নাচতে আরম্ভ করবে।'

আরেকবার স্টার থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা' ভীষণ জনপ্রিয় হয়েছে। সারা দেশে একটা হইচই পড়ে গেছে। থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ একদিন বোষ্টমদের বিনামূল্যে 'চৈতন্যলীলা' দেখানোর কথা ঠিক করেন। কিন্তু একজন প্রশ্ন তুললো, 'যদি কেউ বোষ্টম সেজে নকল টিকি লাগিয়ে ফাঁকি দিয়ে নাটক দেখে যায় তবে সেটা ঠেকানো যাবে কি করে ?' সেকালের প্রসিদ্ধ অভিনেতা প্রবোধচন্দ্র ঘোষ বাতলে ছিলেন, 'ভাবনা কি। আমরা আগে টিকি টেনে দেখবো, তারপর ঢুকতে দেব।'

অন্য একটি গল্প মতিলাল সুর নামে সেকালের এক সরল প্রকৃতির অভিনেতাকে নিয়ে। মতিলালবাবু সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। সকলেই, বিশেষ করে রসরাজ অমৃতলাল, তাঁর পিছনে সুযোগ পেলেই লাগতেন।

একবার মফস্বলে থিয়েটার করতে গেছেন সবাই। মতিলালবাবু অবস্থাপন্ন লোক, সঙ্গে চাকর নিয়ে গেছেন, চাকরের নাম একলু। কিন্তু রসরাজ কয়েকজনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চাকরটিকে বখশিশ দিয়ে হাত করলেন, তারপর তাকে বললেন, 'তোমার একলু নামটা ভালো নয়। আজ থেকে তোমাকে চামচিকে বলে ডাকবো।' বোকা চাকর এতেই রাজি হলো, সবাই তাকে চামচিকে বলে ডাকে, সে তাদের তামাকটামাক সেজে দেয়। মতিলালবাবু প্রথমে কিছু বুঝতে পারেননি কিন্তু একদিন তিনি ব্যাপারটার রহস্য ধরতে পারলেন। তিনি ভেবে দেখলেন, চাকরের নাম হলো চামচিকে, এদিকে একটা কথা আছে ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মানে আমি হলাম ছুঁচো। ব্যাপারটা অনুধাবন করতেই মতিলালবাবু বন্ধুদের তাড়া করে গেলেন এবং হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিলেন।

দানীবাবু আর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের একটা গল্পও তুলে দিচ্ছি। চাঁদবিবি নাটকে

দানীবাবুকে বিজাপুরের সুলতান আদিলশার একটা ছোট পার্ট দেওয়া হয়েছে। দানীবাবু সমস্ত পার্ট বিতরিত হবার পরে এসেছেন বলে এ অবস্থা। তবে তাঁর মর্যাদার যোগ্য জমকালো পোশাক তৈরি করতে দেয়া হলো। দানীবাবু জানালেন, 'আদিলশার ভূমিকায় পোশাকের আড়ম্বর দরকার নেই। যা হয় একটা করবেন।' বিদ্যাবিনোদ বুঝলেন ছোট পার্ট পেয়ে দানীবাবুর অভিমান হয়েছে। তিনি দানীবাবুকে প্রবোধ দিলেন, 'আদিলশা দাক্ষিণাত্যের একটা বড় বংশের মস্ত ঘরের ছেলে। সে কি দিনরাত বড় বড় করে বকবে ? জোর একটা হুঁ করলে কি একটা হাঁ করলে।'

শেষ করার আগে অর্ধেন্দু মুস্তফীর অন্তত আরেকটা গল্প বলে নিই।

একদিন মুস্তফী সাহেব একটি নাটকে অভিনয়কালীন 'হরে' ভৃত্যকে ডাকছেন। ভৃত্যের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর স্টেজে আসতে দেরি হচ্ছে, এ জন্যে অর্ধেন্দুবাবু রাগের ভান করে 'হরে, হরে' বলে নেপথ্যাভিমুখে চিৎকার করছেন। এমন সময় দর্শকের আসন থেকে একজন রঙ্গ করে বললো, 'আজ্ঞে যাই।' সঙ্গে সঙ্গে মুস্তফী সাহেব লোকটির দিকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, 'ও ব্যাটা তুমি ওখানে বসে আছো ?'

পুনশ্চ : এতো সব অবিস্মরণীয় পুরাকাহিনীর অন্তে একটি চটুল হলিউডি ঘটনা বলি। গল্প নয় নিতান্তই ঘটনা। হলিউডের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজকর্ম ভালো নয়, কেমন যেন ঢিলেঢালা। কয়েকদিন আগে কাগজপত্র ঘেঁটে ধরা পড়েছে নায়িকা মহোদয়া এখন পর্যন্ত যতগুলি বিয়ে করেছেন হিসেবের ভুলে তার থেকে দুটো ডাইভোর্স বেশি করেছেন।

এখন কি হবে ?

কুকুর কাহিনী

এই বিশ্বসংসারে যাঁরা আমাকে অল্পবিস্তর জানেন, তাঁদের কারো কাছেই আমার কুকুর-বিড়াল প্রীতির কথা অবিদিত নয়। এমন কি, আমার দু-চার লাইন হিজিবিজি গদ্যপদ্য যাঁরা দয়া করে পাঠ করেছেন তাঁরাও অবহিত আছেন আমার পশুভক্তির কথা। এক মাননীয়া পাঠিকা এই কিছুদিন আগেই আমাকে বলেছেন, 'কুকুরের বিড়ালের অত্যাচারে যেমন তোমার বাড়িতে যাওয়া যায় না, তেমনই তাদের অত্যাচারে তোমার লেখাও পড়া যায় না। সুন্দরী যুবতী, শ্যামলা প্রকৃতি, প্রেম-ভালোবাসা, বিরহ-মিলন কিছু নেই তোমার লেখায় ; কেবলই কুকুর আর বিড়াল, বিড়াল আর কুকুর। আর বাজে তামাশা।'

আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আমার সপক্ষে মহামতি মার্ক টোয়েনের একটা উক্তি দিয়ে কুকুর কাহিনী শুরু করছি। টোয়েন সাহেব বলেছিলেন, 'যদি আপনি একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে নিয়ে খাবার দেন, ভালো করে তোলেন সে আপনাকে কামড়াবে না। এবং সেটাই হলো একটা কুকুরের সঙ্গে মানুষের প্রধান পার্থক্য।' মানুষ যে কুকুরের মত নয়, সে যে নিমকহারাম হতে পারে, কুকুর যা হবে না, সেটাই টোয়েন সাহেব ঘুরিয়ে বলেছেন।

সে যা হোক মানুষের সঙ্গে কুকুরের তুলনা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে এই মুহূর্তে আমার একটি অত্যন্ত দুঃখের গল্প মনে পড়ছে। অবশ্য যে সব কৃতবিদ্য পুরুষদের সন্তানেরা তাঁদের ড্যাডি (Daddy) বলে ডাকে, এ গল্প শুধু তাঁদেরই জন্যে।

একটা বাচ্চা ছেলের একটা কুকুরছানা ছিল। তার নাম ছিল ক্যাডি। ক্যাডিকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে ছেলেটি। যতক্ষণ সম্ভব তার সঙ্গে খেলাধূলা, ওঠাবসা। দুঃখের বিষয়, একদিন ছেলেটি ইস্কুলে গেছে, এমন সময় বাড়ির লোকের অসতর্কতায় বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ওই কুকুরছানাটি রাস্তায় গিয়ে নেমেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি দ্রুত ধাবমান ট্যাক্সির চাকার নিচে চাপা পড়ে ক্যাডির প্রাণনাশ হয়েছে।

ছেলেটির মা অনেক ভেবেচিন্তে স্থির করলেন যে, শোক সংবাদ চেপে না রাখাই ভালো ; কারণ, তা বেশিক্ষণ গোপন করা যাবে না। সুতরাং, ক্যাডি-অন্ত-প্রাণ বালকটি ইস্কুল থেকে ফিরে জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তেই তার মা তাকে বললেন, 'বাপি, তুমি কিন্তু কাঁদাকাটি করো না। আজ তুমি ইস্কুলে যাওয়ার পরেই ক্যাডি রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সির তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে।' মা যা ভয় করেছিলেন ছেলে ডুকরে কেঁদে উঠবে, মেঝেতে কাঁদতে কাঁদতে গড়াগড়ি যাবে, আশ্চর্যের কথা, ছেলেটি কিন্তু তার কিছুই করলো না। সে নিতান্ত নির্বিকারভাবে এই শোক সংবাদটি গ্রহণ করলো এবং তারপর যথারীতি স্নান করে খেতে বসলো। অন্যান্য দিন খাওয়ার সময় ক্যাডি এসে পায়ের কাছে বসে। খেতে বসে এবারে বাপির মনে পড়লো ক্যাডির কথা, মাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'মা ক্যাডি কোথায় ?' মা অবাক হলেন, 'সে কি, আমি যে তোমাকে ইস্কুল থেকে আসতেই বললাম, যে রাস্তায় গাড়িচাপা পড়ে ক্যাডি মারা গেছে।' বাপি সঙ্গে সঙ্গে খাওয়ার প্লেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে

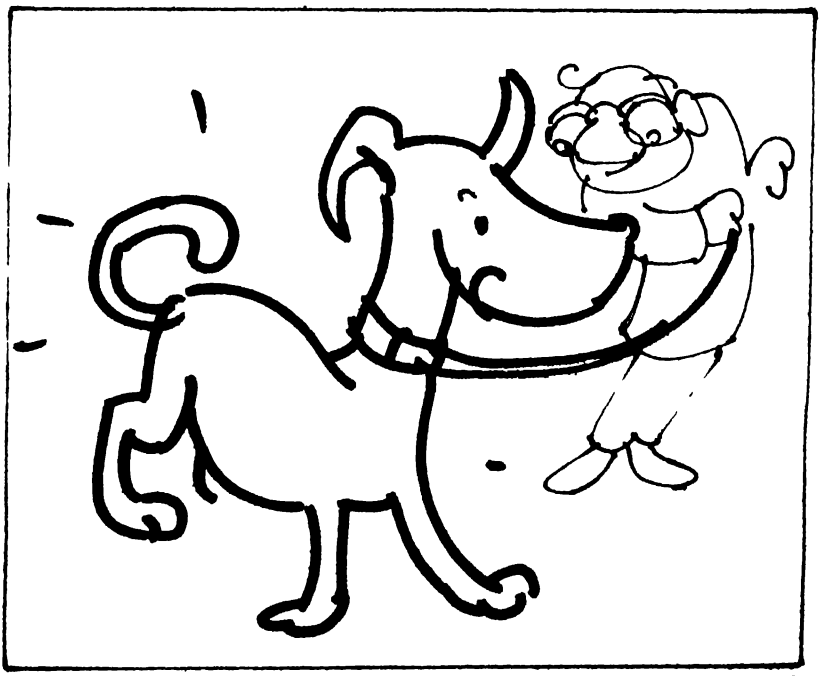

ডুকরে কেঁদে উঠলো। কান্না আর থামে না, কিন্তু মা অবাক হলেন, ইস্কুল থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাপিকে দুঃসংবাদটি দিয়েছিলেন তখন তো সে উচ্চবাচ্য কিছু করেনি, হঠাৎ তার এই ভাবান্তর, কেন !

সুতরাং, মাতৃদেবী ছেলেকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাকে ইস্কুল থেকে ফিরতে ক্যাডি মারা গেছে বললাম, তখন তো কিছু বললে না, কাঁদাকাটিও করলে না।' চোখের জল দুহাতে মুছতে মুছতে বাপি বলল, 'আমি শুনেছিলাম ড্যাডি গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে, ক্যাডি মারা গেছে তা তো শুনিনি।'

ক্যাডি-ড্যাডির কথা হলো, কোনো ড্যাডি যদি এই ক্ষুদ্র রসিকতা পাঠ করে সামান্যও দুঃখিত হয়ে থাকেন সেজন্যে তাঁর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করে আমাদের একান্ত আপন নিজস্ব কুকুরটির কথায় যাই।

আমাদের বাড়িতে বলতে গেলে সবচেয়ে বেশি অধিকার এই কুকুরটিব, সে এই বাড়িতেই জন্মগ্রহণ করেছে, যে সৌভাগ্য আমাদের কারো হয়নি। এক দুর্গা ষষ্ঠীর সকালে যখন পাড়ার মণ্ডপে বোধনের বাজনা বাজছে, লোকেরা নতুন জামাকাপড় পরে রাস্তায় বেরোচ্ছে সেই সময় আমাদের পুরনো বাড়ির উঠোনের এক পাশে পরিত্যক্ত রান্নাঘরে দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে, চারটি চমৎকার সন্তানের জন্ম দিয়েছিল এর মা। বলা বাহুল্য, ষষ্ঠীর সকালে জন্মানো দুই ছেলে, দুই মেয়ের অনিবার্য নামকরণ হয়েছিল, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী। বাকিরা অন্য বাড়িতে গেল, গণেশ রয়ে গেল আমাদের বাড়িতে। আমরা তার পোশাকি নাম দিলাম গজানন, আহ্লাদী নাম গজু। গজাননের উপাখ্যান একদা বিস্তারিতভাবে আনন্দমেলায় লিখেছিলাম কিন্তু দু-একটি মজার ঘটনা বাদ রয়ে গেছে, তার কিছু তার পরে ঘটেছে। তার দু-একটি লিখছি।

প্রথম ঘটনাটি অল্প কিছুদিন আগের। আমাদের এক গ্রাম সম্পর্কের বৃদ্ধ আত্মীয় আমাদের বাড়িতে এসেছেন, তিনি বদ্ধ কালা। তাতে গজাননের আপত্তি নেই ; কিন্তু তাঁর গায়ে বিচিত্র গন্ধ। কোনো এক অজ্ঞাত কারণে ভদ্রলোক আজীবন মাথায় উন্মাদরোগহর মধ্যম নারায়ণ তেল মেখে আসছেন, সেই সঙ্গে সম্প্রতি যোগ হয়েছে হাতে-পায়ে বাতের ব্যথার মলম। তাঁর এই গন্ধময় আবির্ভাবে তার থেকে কয়েক হাত দূরে বসে আমাদের গজানন ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করে যেতে লাগল। সুখের কথা, ভদ্রলোক কানে একটুও শুনতে পান না। অনেকক্ষণ কুকুরটার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার কুকুরটা বোধ হয় কাল রাতে একদম ঘুমোয়নি, তখন থেকে আমার সামনে বসে কেবলই হাই তুলছে।' বলা বাহুল্য, আমি আর কষ্ট করে বধির ভদ্রলোককে বোঝাতে গেলাম না যে ও হাই তুলছে না, ঘেউ ঘেউ করছে ; আপনি শব্দ শুনতে পাচ্ছেন না।

আমাদের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে, একটু বেশিই ঘেউ ঘেউ করে কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন একটা ব্যাপার ঘটেছে। একদিন রাত তিনটের সময় ঘুম ভাঙলো টেলিফোনের কর্কশ আওয়াজে, আমার এক প্রতিবেশী আমাকে ফোন করেছেন। তিনি আমাকে কঠোর কণ্ঠে বললেন, 'আপনার কুকুর বড় ঘেউ ঘেউ করছে। আমাদের ঘুমের অসুবিধে হচ্ছে।'

কি আর করবো, আমি চুপ করে গেলাম। কিন্তু ঘটনাটা ঠিক নয় ; কারণ, দুদিন আগে আমার ছেলের সঙ্গে গজানন আমাদের আগের বাড়িতে গেছে। আমি পরের দিন রাত তিনটের সময় ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলাম। অ্যালার্ম বাজতে যেই ঘুম ভাঙলো

প্রতিবেশী মহোদয়কে ফোন করলাম। ভদ্রলোক ফোন ধরার পর বললাম, 'কাল রাতে কুকুর ঘেউ ঘেউ করার কথা বলছিলেন। তা বলছিলাম কি, আপনি ভুল করেছেন। আমাদের কুকুর তো আজ কয়েক দিন হল এ বাসায় নেই, সে অন্য জায়গায় আছে। ওটা অন্য কারো কুকুর হবে।'

আরেকটি কুকুরের গল্প বলি, সে অবশ্য আমাদের কুকুর নয়। সে অন্য বাড়ির গল্প। সে বাড়িতে একজন অতিথি এসেছেন। তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে। তাঁর পায়ের কাছে অদূরে বসে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। ভদ্রলোক ভাবলেন, কুকুরটা খেতে চাইছে। তিনি বিস্কুটের একটা টুকরো ভেঙে কুকুরটাকে দিলেন। কিন্তু কুকুরটা বিস্কুটের টুকরো স্পর্শও করল না। তখন ভদ্রলোক ভাবলেন, বোধ হয় বিস্কুট খাবে না,ভালো কিছু চাইছে। একটু সন্দেশ থেকে ভেঙে দিলেন, কিন্তু কুকুর সেটাও ছুঁলো না। ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন। বাড়ির একটি ছোট ছেলে একটু দূরে বসে খেলছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খোকা, কুকুরটাকে যাই দিচ্ছি কিছু খাচ্ছে না। কিন্তু আমাকে দেখে এত ঘেউ ঘেউ করছে কেন ?' বাড়ির ছেলেটি খেলতে খেলতে নির্বিকারভাবে জবাব দিল, 'আপনি যে ওর প্লেটে খাচ্ছেন। সেই জন্যে ও রাগারাগি করছে। ওর প্লেটে অন্য কারোকে খেতে দেখলে ও ভীষণ রেগে যায়।'

এটুকু পড়ে কেউ যদি ভাবেন এ নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ির, আমাদের গজাননেরই গল্প, কায়দা করে ঘুরিয়ে বললাম ; তাহলে তিনি মহা অন্যায় করবেন।

আমাদের বাড়িতে যিনি ইলেকট্রিকের মিটার দেখতে আসেন, গজানন তাঁকে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ঠিক দেড় হাত দূরে দাঁড়িয়ে। একদিন হঠাৎ ভদ্রলোকের মিটার খাতায় চোখ পড়তে দেখি আমাদের ঠিকানা আর মিটার নম্বরের পাশে লেখা আছে, 'পাজি কুকুর আছে।' বুঝতে পারলাম নেহাৎই প্রাণরক্ষার তাগিদে এ সব তথ্য তিনি লিখে রাখেন। তবু ভদ্রলোককে অভয় দেওয়ার জন্যে বললাম, 'কুকুরের ঘেউ ঘেউ শুনে ভয় পাবেন না। জানেন তো যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কামড়ায় না।' ভদ্রলোক তিক্ত হেসে বললেন, 'সে তো আমি জানি। আপনিও জানেন। কিন্তু আপনার কুকুরটা জানে কি ?'

কুকুর-কুকুর

কুকুর হইতে সাবধান (Beware of dogs)। অনেক বাড়ির দরজায় শুধু এটুকু নোটিস লাগিয়ে গৃহকর্তার মনে শান্তি হয় না, তাঁরা বিজ্ঞপ্তির পাশে একটি হিংস্র সারমেয়ের দাঁত ও জিব বের করা ছবিও এঁকে রাখেন। অনেক সময়েই দেখা যায়, ছবির হিংস্র কুকুরটির সঙ্গে গৃহস্থ কুকুরটির কোনো মিলই নেই, সে নিতান্ত ভীতু, নিবীহ এবং সর্বোপরি নেড়ি। সে যাহোক, কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁরা যে কোনো বকম কুকুর দেখলেই ভয়ে হিম হয়ে যান আবার অনেকে কোনো কুকুরকেই তেমন পরোয়া করেন না।

তবে ঐ 'কুকুর হইতে সাবধান' কথাটায় আমার কিঞ্চিৎ আপত্তি আছে। কথাটা কেমন যেন খটমটে এবং অবাংলা। বরং 'কুকুর আছে, সাবধান' কিংবা 'সাবধান, কুকুর আছে!' কিছুটা ভালো।

এবার কুকুরের গল্পে আসি। যাঁরা কুকুর নিয়ে রঙ্গরসিকতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বা বিরক্ত বোধ করছেন কিংবা সেইসব কুকুর-অন্ত প্রাণ সারমেয় প্রেমিকেরা যাঁরা কুকুর নিয়ে ঠাট্টা করায় আহত হয়েছেন, তাঁদেব জন্যে এবার প্রথমেই দুটি দুরকম উপহার আছে।

প্রথম কাহিনীটি রীতিমত রহস্যময় এবং দ্বিতীয়টি রাজনৈতিক।

রহস্যময় কাহিনীটি আমি অন্যের কাছে শুনেছি। কিন্তু বক্তব্যের সুবিধার জন্যে নিজের জবানিতে লিখছি।

কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন সকালে শহরতলীতে আমার এক বৃদ্ধ আত্মীয়ের বাড়িতে

গেছি। ভদ্রলোক একটু বিচিত্র চরিত্রের লোক, বহুরকম অভিজ্ঞতা তাঁর। তাঁর সঙ্গে নানারকম বিষয়ে কথা হচ্ছে। এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে একটি সাধারণ দিশি কুকুর আমরা যে বসার ঘরে বসে আছি সেখানে এসে ঢুকলো এবং আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে পরিষ্কার মানুষেব গলায় বললো, 'আজ সকালের আনন্দবাজারটা কোথায় গেলো।' পাশেই টেবিলের উপবে খবরের কাগজটা ছিলো, ভদ্রলোক এগিয়ে দিতেই কুকুরটা সেটা নিয়ে আবাব পাশের ঘরে চলে গেলো।

আমাব তো ভিরমি খাওয়ার অবস্থা, কুকুর কথা বলছে, কাগজ পড়ছে ; জীবনে কোনোদিন কল্পনা করতে পারিনি। কিছুক্ষণ পরে ধাতস্থ হয়ে ভদ্রলোককে বললাম, 'আপনার কুকুর খবরের কাগজ পড়তে নিয়ে গেলো ?' বৃদ্ধ ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'তোমাব ধারণা হয়েছে ও ঐ কাগজটা পড়বে ?' আমি তখনো হতভম্ব হয়ে আছি, বললাম, 'তবে ?' ভদ্রলোক বললেন, 'খবরের কাগজ পড়ার বিদ্যাবুদ্ধি ওর নেই। শুধু প্রত্যেকদিন সকালে অনেকক্ষণ ধরে ঐ অরণ্যদেব আর গোয়েন্দা রিপটা মন দিয়ে দেখে।'

এ গল্পটি অবশ্যই অবিশ্বাস্য। তবে এর পরের রাজনৈতিক কাহিনীটি হয়তো ততো অবিশ্বাস্য নাও হতে পারে।

ঘটনাটি ঘটেছিলো পাকিস্তান সীমান্তবর্তী এক ভারতীয় গ্রামে। পাকিস্তান অঞ্চল থেকে একটা কুকুব একদিন সেই গ্রামে প্রবেশ করেছে। কুকুরটি রীতিমত গায়ে-গতরে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। দেখলেই বোঝা যায় আরাম এবং সাচ্ছল্যের মধ্যে সে বড় হয়েছে।

এদিকে ভারতীয় গ্রামেব কুকুবগুলিব অস্থিচর্মসার, মড়াখেকো চেহারা। তারা কোনোদিন ভালো করে পেট পুরে খেতে পায় না। তারা এই কুকুরটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো, তার সঙ্গে গল্প গুজব কবতে গেলো। কথায় কথায় যখন জানলো যে ঐ পাকিস্তানী কুকুরটি প্রতিদিন সকালে দু লিটাব দুধ খায়, দুপুরে রাতে এক কেজি করে সুস্বাদু মাংস খায় ; ভারতীয় কুকুরেরা অবাক হয়ে গেলো, তাদের সকলের তখন একটাই জিজ্ঞাসা, তা হলে তুমি অত আরাম, বিলাসবৈভব ছেড়ে আমাদের এ কষ্টের এলাকায় এলে কেন ? এখানে তো কিছুই খেতে-টেতে পাবে না।' পাকিস্তানী কুকুরটি বিরসবদনে বললো, 'আমি কি আর সাধে এসেছি, ওরা যে ওপারে একদম ভৌ ভৌ করতে দেয় না। আমি যে আবার একটু ভৌ ভৌ না করে থাকতে পারি না।'

দেশে-দেশে, কালে-কালে কুকুর নিয়ে সহস্র গল্প। সেই কবে বেদব্যাস মহাপ্রস্থানের পথে তাকে যুধিষ্ঠিরের শেষ সঙ্গী করেছিলেন, তারো আগে কিংবা পরে সে প্রবেশ করেছিলো পিরামিডের অভ্যন্তরে। হিতোপদেশ আর ঈশপের কথামালার যুগ থেকে, তারো আগে থেকে সে মানুষের চিরসঙ্গী।

কুকুরপ্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন লর্ড বায়রন। তাঁর প্রিয় কুকুরের মৃত্যুতে তার সমাধিফলকের জন্যে রচিত বিখ্যাত কবিতাটি অনেকেই হয়তো পড়েছেন। যেখানে বলা আছে, 'আমি জীবনে আর কোনো বন্ধুকে জানি না, শুধু একজনই ছিলো, সে এখানে শায়িত।' সেই দীর্ঘ কবিতার শেষে আরো একটি এপিটাফ আছে, সেখানে বলা আছে, 'বেটসোয়াইন, একটি কুকুর, মানুষের সব গুণই তার ছিলো, মানুষের কোনো দোষই তার ছিলো না।'।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আজ যদি কেউ বায়রনের সমাধি খুঁজতে যান তাঁকে রীতিমত পরিশ্রম করতে হবে। ইংল্যাণ্ডের হাকনাল গ্রামে লর্ড বায়রনের পারিবারিক কবরখানায়

অনেক প্রস্তরলিপির মধ্যে একটি গৌণ ফলকে তাঁর নাম ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা। অথচ অদূরে নিউস্টেড অ্যাবেতে রয়েছে তাঁর প্রিয় কুকুর বেটসোয়াইনের সুরম্য সমাধিমন্দির, কারো দৃষ্টিই সেটা এড়াবে না।

আমিও একজন কুকুরভক্ত সামান্য লেখক। তবে নিজে লেখার চেয়ে টুকে লেখাতেই আমার বেশি ফূর্তি। এমনকি আমার নিজের কুকুরের ক্ষেত্রেও তাই করেছিলাম, আলেকজাণ্ডার পোপের বিখ্যাত শ্লোক থেকে চুরি করে একদা আমি আমার কুকুরের গলার বকলসে ব্যাজ লাগিয়ে লিখে দিয়েছিলাম,

'আমি হুজুর, পণ্ডিতিয়ার
তারাবাবুর কুকুর।
আপনি হুজুর কোথাকার
কোন বাবুর কুকুর?'

এই ছোটলোকী পদ্য পড়ে কত বড়লোকের যে মাথা হেঁট হয়েছে তার শেষ নেই। আর এছাড়া আমি কিইবা করতে পারি। আমি আজ পর্যন্ত যত কুকুর পুষেছি বায়রন সাহেবের মতো তাদের সমাধিমন্দির করতে গেলে পুরো কলকাতা ময়দান লেগে যেতো।

আধুনিক হাসির রচনার সঙ্গে কুকুর মিলেমিশে রয়েছে প্রথম থেকেই। অদ্যাবধি রচিত শ্রেষ্ঠ হাসির উপন্যাসটির নামই হলো, 'একটি নৌকায় তিনজন মানুষ, কুকুরটির কথা না বলাই ভালো,' উপন্যাসকার জেরোম কে জেরোম। এ বই যিনি পড়েননি, তিনি হাসির রচনার কিছুই পড়েননি।

তবে কুকুর সম্বন্ধে মোক্ষম কথা বলে গেছেন থার্বার। জেমস থার্বার, নিউ ইয়র্কার কাগজের বিখ্যাত সরস লেখক এবং গ্রন্থকার, এই শতকে সবচেয়ে বেশি লিখেছেন কুকুর নিয়ে। কুকুর নিয়ে অসামান্য সব কার্টুনও এঁকেছেন। থার্বার বলেছিলেন, 'কুকুররা মানুষকে নিয়ে যত মজা পায়, মানুষরা কুকুর নিয়ে ঠিক তত মজা পায় না কারণ এই দুরকম জন্তুর মধ্যে মানুষই বেশি হাস্যকর।'

কোটেশন কন্টকিত এই কুকুরকাহিনী শেষ করার আগে দু-একটা সত্যিকারের মজার কথা বলি।

প্রথম গল্পটি অভিনেতা রবি ঘোষ মশায় বোধহয় বলেছিলেন কিংবা স্বর্গীয় ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সে যাঁর গল্পই হোক, তাঁর একটা কুকুর ছিলো। সেই কুকুরের জন্যে বাড়িতে চোর বা কোনো বাইরের লোক এলেই তিনি বুঝতে পারতেন। না, কুকুরটা গর্জন, ঘেউ ঘেউ, তেড়ে যাওয়া, কামড়ে দেওয়া এসব কিছুই করতো না। সে ছিলো একটা অত্যন্ত ভীরু কুকুর। বাড়িতে কোনো অচেনা ব্যক্তির আবির্ভাবের গন্ধ পেলেই সে পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে প্রভুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তো। একবার একটা চোর ঢুকেছে বাড়িতে, গভীর রাত, প্রভু নিদ্রামগ্ন, কুকুরটা মশারি ছিঁড়ে বিছানার মধ্যে ঢুকে প্রভুর কোলে গিয়ে লুকোতে প্রভু টের পেলেন বাসায় চোর এসেছে।

আর একবার হাতিবাগান বাজারের সামনে এক রবিবার সকালে আমার এক বন্ধুর মেয়ের জন্যে একটা কুকুরছানা কিনতে গিয়েছিলাম, একটা বাচ্চা পছন্দ হওয়ার পর কুকুরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা বেশ বিশ্বস্ত, প্রভুভক্ত হবে তো?' গম্ভীর মুখে তিনি বললেন, 'বিশ্বস্ত? জানেন এই কুকুরটা এখন পর্যন্ত চারবার বেচেছি, চারবারই খদ্দেরের বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার কাছে ফিরে এসেছে।'

গোপাল ভাঁড়

'রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় রসরাজও ছিলেন, গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন, কিন্তু ভাঁড়ে থাকিতে থাকিতে খেজুর রস, তালের রসও যেমন তাড়ি হইয়া পড়ে, কথার রসেরও সেই দশা দাঁড়াইল।

এখন কেহ রসিকতা করিলে গম্ভীর লোকে তাহা ছ্যাবলামো বা ভাঁড়ামো বলিয়া নিন্দা করেন।'

আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে অন্য যুগের অন্য এক রসরাজ, নাট্যাচার্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু একথা লিখেছিলেন।

গোপাল ভাঁড়ের রসিকতা শোনেননি, বলেননি বা পড়েননি এমন বঙ্গভাষাভাষীর সংখ্যা বিরল। 'গোপাল ভাঁড়' নামক রসিকতার বই গত এক শতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যের বেস্টসেলার, পঞ্জিকা বা রামায়ণ কিংবা লক্ষ্মীর বা শনির পাঁচালীর প্রতিদ্বন্দ্বী, শংকর বা বুদ্ধদেব গুহের বেস্টসেলার এর পাশে অবচীন।

এখনো রেলের কামরায়, হাট-বাজারে গোপাল ভাঁড়ের সস্তা সংস্করণ নিয়মিত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। নতুন যুগের শিক্ষাব্যবস্থা ধারাপাত, বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষাকে কিছু কোণঠাসা করেছে কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের আজও সমানই রমরমা।

কিছুদিন আগে কাছাড়ে গিয়েছিলাম, সেখানে প্রত্যন্ত শহরের ছোট বইয়ের দোকানে দেখেছি গোপাল ভাঁড় কাচের শোকেসে সাজানো। তারো আগে বাংলাদেশে, ঢাকা,

টাঙ্গাইলের বইয়ের দোকানে গোপাল ভাঁড় পেয়েছি। সব সংস্করণ একরকম নয়, গল্পগুলোও সব মেলে না, কিন্তু বিশাল ভুঁড়ি, টাকমাথা গোপাল ভাঁড়ের ছবি আঁকা প্রচ্ছদ নিয়ে গোপাল ভাঁড় কথামালা চমৎকার চলছে।

সরস গোপাল ভাঁড় নিয়ে নীরস আলোচনা করার আগে গোপাল ভাঁড় এতকাল ধরে কেন এত জনপ্রিয় সেটা বোঝার চেষ্টা করি।

এক ভদ্রলোক তাঁর ছেলেদের নাম রেখেছেন, পটল, আদা, সিম, বেগুন ইত্যাদি। গোপাল ভাঁড শুনে বলছে, 'সবাইকে আলাদা আলাদা করে না ডেকে একবারে এদের সুকতো বা লাবড়া বলে ডাকতে পারেন।' এ নিতান্ত বাঙালির নিজস্ব রসিকতা। কিংবা সেই কাণ্ডজ্ঞানে ঘড়ির উপাখ্যানে গোপাল ভাঁড়ের একটা প্রশ্নোত্তর লিখেছিলাম। গোপাল ভাঁড়ের কাছে একটা ঘড়ি রয়েছে, একজন তার কাছে সময় জানতে চাইছে, 'দাদা, কটা বাজে ?' হাস্যমুখ গোপাল জিজ্ঞাসা করছে, 'দাদা, কটা চাই ?' এই রহস্যময় জবাবি প্রশ্নটির কিন্তু কোনো জবাব নেই।

তবু গোপাল ভাঁড়ের অধিকাংশ রসিকতা বড় মোটা দাগের, স্থূল ও অশ্লীল। মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ, শারীরিক পঙ্গুতা, এমনকি পুত্রবধূ নিয়ে রসিকতা গোপাল ভাঁড়ের পাতায় পাতায়।

তবু গোপাল ভাঁড় এত জনপ্রিয়। বোধহয় স্থূলতা, রুচিহীনতা যা কিছু বৈঠকী বা রকের রসিকতার একটা বড় অঙ্গ সেই সঙ্গে উচিত জবাব এবং অল্পকষায় মন্তব্য গোপাল ভাঁড়কে এতকাল বাঁচিয়ে রেখেছে। গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে একাধিক বাংলা চলচ্চিত্র হয়েছে, যাত্রাও হয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র জড়িত যে কোনো ঐতিহাসিক পালায় গোপাল ভাঁড় জনপ্রিয় চরিত্র। আসলে গোপালের গুণ হলো সে যতই স্থূল হোক, সহজবোধ্য ।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগের একটা বিখ্যাত মঞ্চকাহিনী বলি। মিনার্ভা থিয়েটারে আবু হোসেন অভিনীত হচ্ছে। আবু হোসেনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন স্বয়ং অর্ধেন্দু মুস্তফী।

নাটকের একটি দৃশ্যে আছে, আবু হোসেনকে রক্ষিবৃন্দ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে পাগলাগারদে দেওয়ার জন্যে। আবু হোসেনের মা ডুকরে কাঁদছেন, 'ও বাপরে—আমার কি হলো রে !' ইত্যাদি করুণ উক্তি করে।

সেকালে চপল এবং লঘুমতি নাট্যামোদীর অভাব ছিলো না। তাদের কেউ কেউ আবু হোসেনের ক্রন্দনরতা মায়ের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হলের মধ্যে থেকে কাঁদতে লাগলো। আবু হোসেনবেশী মুস্তফীসাহেব স্টেজ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দর্শকদের এই ক্রন্দনধ্বনি শুনে ফিরে দাঁড়িয়ে মাকে বললেন, 'মা, আর কাঁদিসনে। তোর কান্না শুনে শেয়াল-কুকুরে কাঁদছে।' সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল-কুকুরের দশায় পরিণত হওয়া দর্শকেরা থেমে গিয়েছিলো।

অর্ধেন্দু মুস্তফীর এই শেষের ডায়লগটি মূল নাটকে ছিলো না। থাকার কথাও না। এটা গোপাল ভাঁড়ের একটা পুরনো গল্প, অর্ধেন্দুবাবু সুযোগ পেয়ে এবং বুদ্ধি করে এখানে চালিয়ে দিলেন।

গোপাল সংক্রান্ত এরকম বহু গল্প বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুযোগ ও সুবিধামত সদ্ব্যবহার করতে পারেন।

গোপালের হাতের লেখা ভালো নয়। এক বৃদ্ধা এসেছেন তাকে দিয়ে একটা চিঠি লেখাতে। গোপাল বললো সে চিঠি লিখতে পারবে না, তার পায়ে ব্যথা। বৃদ্ধা অবাক, হাত দিয়ে চিঠি লিখতে পায়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক ? গোপাল ব্যাখ্যা দিলো, 'লিখবো তো হাত

দিয়েই। কিন্তু আমার হাতের লেখা পড়বে কে ? সে তো পড়তে হবে আমাকেই গিয়ে। কিন্তু আমার পায়ে যে ব্যথা, পড়তে যেতে পারবো না।'

অন্য এক কাহিনীতে গোপাল মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে উঠে তার স্ত্রীকে বলছে, 'যাও তো দেখে এসো ভোর হচ্ছে কি না ? পূর্বের আকাশ লাল হয়ে এসেছে কি না ?' বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, বউ ফিরে এসে বললো, 'ভারি আঁধার। কিছু ঠাহর করতে পারছি না।' গোপালের আদেশ হলো, 'এমনিতে দেখতে না পাও, আলো জ্বেলে দেখ সূর্য উঠছে কিনা ?'

আরেকবার এক আলুর গুদামে আগুন লেগেছিলো। গোপাল সেই গুদামের পোড়া আলু নুন মাখিয়ে আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছে, এমন সময়ে গুদামের মালিকের সঙ্গে দেখা। তিনি হাহাকার করে উঠলেন, 'আমার দুটো আলুর গুদামের একটা পুড়ে গেলো। আমার সর্বনাশ হয়ে গেলো।' গোপাল তৃপ্ত মুখে আলুপোড়া খেতে খেতে বললো, 'জানেন, আমার আলুপোড়া খেতে খুব ভালো লাগে। আপনার পরের গুদামটায় যখন আগুন লাগবে, খবর দেবেন।'

গোপাল ভাঁড়কে বলা হয় অষ্টাদশ শতকের লোক। কিন্তু এই আলু কিংবা ঘড়ি ব্যাপারটা ঐ শতকের সঙ্গে মিলছে না। ঘড়ি কিংবা আলু আমাদের সমাজে অনেক পরের ব্যাপার।

কথিত আছে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড় সভাসদ ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় এবং মৃত্যু ঐ শতকের শেষাশেষি। তিনি বাংলার নবাব আলিবর্দি, সিরাজদৌল্লা এঁদের সমসাময়িক ছিলেন। গোপাল তাঁরই বিদূষক : আকবরের যেমন বীরবল, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তেমনি গোপাল ভাঁড়।

গোপাল ভাঁড়ের এই ঐতিহাসিকতা কিন্তু সকলে স্বীকার করেন না। স্বয়ং সুকুমার সেন বলেছেন, কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় ছিলেন না। শঙ্করতরঙ্গ নামে একজন ছিলেন রাজার পার্শ্বচর, দেহরক্ষী ; তিনি বাগ্‌বিদগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন, ভাঁড় ছিলেন না।

গোপাল ভাঁড় কে ছিলেন কে জানে ? রসরহস্যমালার এই প্রাচীন নায়ক, তাকে ঘিরে থাকুক কিছু কিংবদন্তী, কিছু অস্পষ্টতা। বটতলার গ্রন্থমালা তাকে পৌঁছে দিক গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, শতক থেকে শতকান্তরে। তার উপাখ্যানে নতুন যুগের নতুন বিদূষক যোগ করে দিক আর কয়েকটি রসিকতা, খারাপ-ভালো কয়েকটি বহুজনবোধ্য গল্প।

ততক্ষণে আমরা এই কালজয়ী ভাঁড়কে আরো একটু অবলোকন করি। গোপাল ভাঁড়ের যে সব বিখ্যাত গল্প, সেই বিধবা পিসির লাউ ঘন্টে ভাজা চিংড়ি মাছ মিশিয়ে পিসিকে ব্ল্যাকমেল করা কিংবা কবি ভারতচন্দ্রকে গোপালের অনুরোধ, 'আপনার বিদ্যাসুন্দরের পাণ্ডুলিপিটি কাত করবেন না, এ যে রসে টইটম্বুর, রস গড়িয়ে পড়বে,' এ সব প্রায় সকলেরই বহুবার শোনা।

মোটা দাগের এবং বহুশ্রুত গল্পগুলি এড়িয়ে দু-একটি অন্য গল্প বলা যাক। এক মজুর গোপালকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বাবু, গর্ত তো কাটলুম, গর্তের মাটি রাখবো কোথায় ?' গোপাল জবাব দিলো, 'গর্তটা একটু বড় করে খুঁড়লেই তার মধ্যে মাটিটা রাখতে পারবে।' গোপাল কিন্তু মাঝেমধ্যে জব্দও হয়েছে। সে তার স্ত্রীকে বলেছিলো তিলের নাড়ু বানাতে। তার স্ত্রী বানালো তালের বড়া, গোপাল বিস্ময় প্রকাশ করাতে গোপালের স্ত্রী জানালে, তিল থেকেই তো তাল হয় গো।' আরেকবার গোপালের ছেলে হাটের মধ্যে হারিয়ে গিয়ে বাবাকে, 'গোপাল, গোপাল', নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছিলো, গোপাল এতে রাগ করায় ছেলে

বলেছিলো, 'হাটের মধ্যে বাবা-বাবা করলে কে না কে সাড়া দেবে। তার থেকে নাম ধরে ডাকাই নিরাপদ।'

গোপাল ভাঁড়ের শেষ গল্পটি সাদামাটা। মজার কথা এই যে, এ গল্পটি মোল্লা নাসিরুদ্দিনেও আছে। গোপাল নাকি কবে যুদ্ধে গিয়েছিল, সেখানে বিপক্ষের বহু সৈন্যের সে পা কেটে ফেলে। 'মাথা না কেটে পা কাটলে কেন?' এই প্রশ্নে গোপাল জানালো, 'মাথাগুলো যে আগেই কাটা ছিলো।'

চলো যাই

এই নামের একটি অসামান্য বইয়ের কথা মনে পড়ছে? কবি অমিয় চক্রবর্তীর লেখা সেই আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনী। কবিরা চমৎকার ভ্রমণকাহিনী লেখেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই পত্রিকার পাতাতেই নিয়মিত ভ্রমণকাহিনী বেরোচ্ছে; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। আর নবনীতা দেব সেনের ভ্রমণকাহিনী তো রীতিমত রোমাঞ্চকর।

এত সব চমৎকার ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধির পৃষ্ঠায় ভ্রমণকে নিয়ে আসা ভালো হলো কি? দেশবিদেশে আমি নানা জায়গায় বাধ্য হয়ে গিয়েছি বটে কিন্তু কখনো আমার তেমন করে ভ্রমণ করা হয়ে ওঠেনি। দেখে শুনে, ঘুরে ফিরে তারিয়ে তারিয়ে স্বাদ নিয়ে বেড়ানো সে আমার কখনো হয়নি। কত বিখ্যাত শহরের হোটেলের ঘরে বন্দী হয়ে কিংবা নির্জন অচেনা গলিতে পায়চারি করে সময় কাটিয়ে দিয়েছি, আমার ভালো করে কিছু দেখাই হয়নি। আমি বোধহয় ভূভারতে একমাত্র ব্যক্তি যে লন্ডন গেছে হাইড পার্কে যায়নি, নিউ ইয়র্কে গেছে, স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখেনি।

আমি এখন পর্যন্ত নিজে থেকে চেষ্টা করে, উদ্যোগী হয়ে কোথাও গিয়েছি বলে মনে পড়ে না। প্রয়োজনে বা নিমন্ত্রণে, বা বাড়ির লোকের চাপে পড়ে এদিক ওদিক গিয়েছি। কিন্তু একবার পৌঁছে যাবার পর আর ছুটোছুটি করিনি, যেখানে পৌঁছেছি সেখানেই সেমিকোলন, তারপর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে ফুলস্টপ।

আমার নিজের কথা থাক। প্রথমে এক বন্ধুর কথা বলে নিই। তিনি সব সময়েই পরিকল্পনা করেন কোথাও না কোথাও যাবেন। এই সামনের মাসেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠে না।

কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা। এর মধ্যে শুনেছিলাম তিনি কোথায় যেন যাবেন ঠিক করেছেন, এবার নাকি একেবারে পাকাপাকি ঠিক। গরমের দিনে যখন, দার্জিলিং নিশ্চয়; তাই দেখা হতে বললাম, 'কি হলো এবার দার্জিলিং যান নি?'

ভদ্রলোক মলিন হেসে বললেন, 'দার্জিলিং তো নয়। এবার আমরা পুরী যাইনি। এবার তো দার্জিলিং যাওয়ার কথা ছিলো না। ছিলো গত বছর, গত বছরে আমরা দার্জিলিং যাইনি,

এবার যাইনি পুরী।'

ভ্রমণ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা বলেছিলেন মহাজ্ঞানী সক্রেটিস, 'একটা উপকূল, একটা পাহাড়, একটা সমুদ্র আর একটা নদী দ্যাখো, তা হলেই সব দেখা হয়ে যাবে।'

অন্যদিকে থোরো (Henry David Thoreau) নামে এক বনবাসী সাহেব দার্শনিক বলেছিলেন, 'পৃথিবী ঘুরে ভ্রমণ করার কি দাম আছে, কি দাম আছে জাঞ্জিবারে গিয়ে সেখানকার বেড়াল গোনার ?'

জাঞ্জিবারে বেড়াল গুনতে আমরা আপাতত নাই বা গেলাম। বরং পর্যটনের গল্পে ফিরে যাই।

প্রথমে সাইকেল। ভূ-পর্যটক স্বর্গীয় রামনাথ বিশ্বাসের সঙ্গে এক ভদ্রলোকের পার্কে আলাপ হয়। রামনাথ তাঁকে বলেন, একবার বিনা পয়সায় দিল্লি গিয়েছিলেন। সে ভদ্রলোক রামনাথকে চিনতেন না, ভাবলেন রেলে টিকিট না কেটে গিয়েছে। বললেন, 'সেটা কি করে সম্ভব।' রামনাথ বিশ্বাস ব্যাখ্যা করে বললেন, 'সাইকেলে গিয়েছিলাম তো। তাই কোনো টিকিটই লাগেনি।'

সাইকেলের পরে রেলগাড়ি। রেলগাড়ির এ গল্পটা ঠিক ভ্রমণকাহিনীর পর্যায়ে বোধহয় পড়বে না। তবু লিখি।

কয়েক সপ্তাহ আগে কাছাড় গিয়েছিলাম। সেখানে পৃথিবীর মন্থরতম রেলগাড়ি দেখে এলাম। রাতে একটা সভা থেকে গাড়ি করে ফিরতে গিয়ে শিলচর শহরের উপকণ্ঠে লেভেল ক্রসিংয়ে আটকে গেলাম। একটি সাধারণ দৈর্ঘ্যের রেলগাড়ি বহু কষ্টে, বহু কসরতে লেভেল ক্রসিংটি পার হতে পঁচিশ মিনিট সময় নিলো।

শুনলাম, একবার এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করার জন্যে ঐ রেললাইনে মাথা দিয়ে

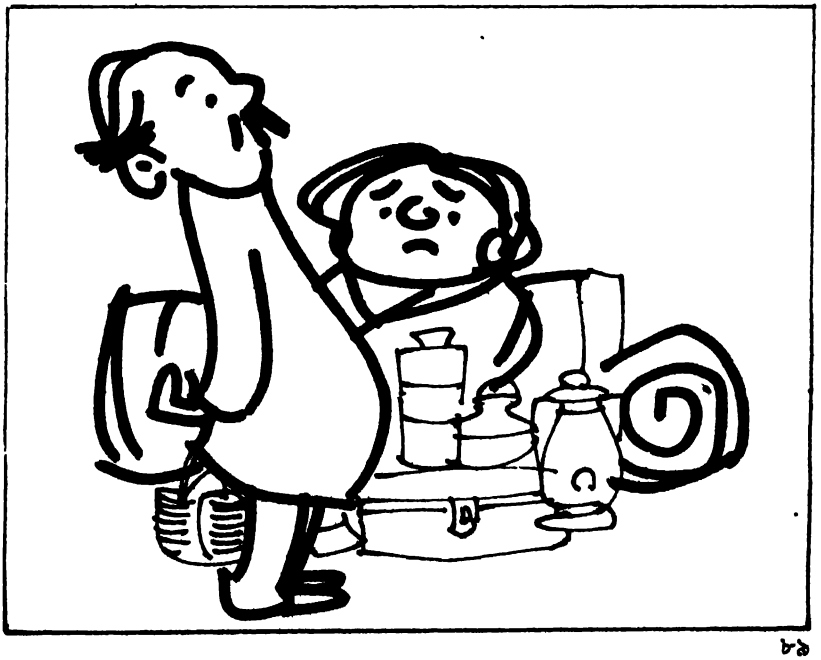

শুয়েছিলো। সে মারা যায় ঠিকই কিন্তু রেলে কাটা পড়ে নয়, অনাহারে। দীর্ঘকাল রেল না আসায় না খেয়ে মারা পড়ে।

আরেকবার কে একজন ঐ গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনি এর চেয়ে তাড়াতাড়ি যেতে পারেন না ?' চালক মহোদয় গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, 'পারি। কিন্তু তা হলে রেলগাড়ি থেকে নেমে হেঁটে যেতে হয়।'

রেলগাড়ি থেকে মোটরগাড়ি। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ধানবাদ থেকে হাজারিবাগের রাস্তার একটা জায়গায় দেখি এক ভদ্রমহিলা গাড়ির টায়ার বদলানোর চেষ্টা করছেন। চারদিকে অরণ্যময় পরিবেশ, অন্ধকার হয়ে আসছে, ছমছমে আবছায়া ভাব। ভদ্রমহিলাকে সাহায্য করার জন্যে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করালাম। তিনি আমাদের দেখে স্বস্তি পেলেন, পঞ্চম টায়ারটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'একটু সাবধানে বদলাবেন, গাড়িটার যেন ঝাঁকি না লাগে।' আমরা অবাক হলাম, এত ঠুনকো গাড়ি নাকি। মহিলাটি আমাদের বিস্মিত ভাব দেখে বললেন, 'পিছনের সিটে আমার স্বামী ঘুমিয়ে আছেন। ওঁর ঘুমের ব্যাঘাত যেন না হয়।'

এবার বিমান। বিমানে আমরা চড়বো না। চড়ার আগের দুটি প্রশ্নোত্তর বলি। এক নবযাত্রী বিমান সেবিকাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আকাশে উড়তে উড়তে যদি তেল হঠাৎ ফুরিয়ে যায় তবে কি হবে ?' বিমান সেবিকা মধুর হেসে তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, 'সে রকম হলে আমরা সবাই বেরিয়ে গিয়ে প্লেনটাকে ঠেলে নিয়ে যাবো।' আরেকজন উদ্বিগ্ন যাত্রী পাইলটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আমি আগে কখনো প্লেনে উঠিনি। আমার খুব ভয় করছে। আমরা ঠিকমতো নামতে পারবো তো ?' এবারেও পাইলট সাহেব আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'কোনো চিন্তা নেই। আজ পর্যন্ত আমি কাউকে আকাশে রেখে আসিনি।'

এবার একটা রেলগাড়ি না চড়ার কাহিনী বলি।

খুব দুঃখের ঘটনা দেখেছিলাম একবার এক রেলস্টেশনে। এক দম্পতি কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন। ভদ্রমহিলা যা কিছু সম্ভব সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন, বাক্স, সুটকেস, হোল্ড-অল, জলের বোতল, ঝুড়ি, ছোট বোঁচকা কয়েকটা, মায় লণ্ঠন পর্যন্ত। ভদ্রলোক ভীষণ গজগজ করছেন, ছি ! ছি ! এতো জিনিসপত্র, বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে বেড়াতে যাওয়া যায়।' ভদ্রমহিলা নির্বিকার এবং গম্ভীর মুখে ট্যাক্সি থেকে মাল মিলিয়ে নেমে চারজন কুলির কাছে দিচ্ছিলেন ট্রেনের কামরায় তুলে দেবার জন্যে।

এই সময় ভদ্রলোক হঠাৎ কি মনে পড়তে খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তারপর খুব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে স্ত্রীকে বললেন, 'এতো জিনিস সঙ্গে নিয়ে এলে, টিভিটা আনতে পারলে না !'

এদিকে স্টেশনে ট্রেন ঢুকে গেছে, হুইশিল দিচ্ছে। স্বামীর এই বক্রোক্তিতে মহিলা খুব চটে গেলেন, 'কী ইয়ার্কি করছো ? যা যা দরকার তাই এনেছি। টিভি আনতে যাবো কেন ?' এ দিকে ট্রেন ছাড়তে যাচ্ছে, 'তাড়াতাড়ি কুলিদের নিয়ে কামরায় ওঠো।'

ভদ্রলোক বললেন, 'টিভিটা না আনায় সেটা সম্ভব হবে না।' ভদ্রমহিলা রীতিমত ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'মানে !' স্বামী বেচারা মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, 'মানে আর কি ? ঐ টিভির উপরে রেলের টিকেট দুটো ফেলে এসেছি।'

গল্প হলো। অবশেষে একটি চৈনিক আপ্তবাক্য দিয়ে পর্যটন কাহিনী শেষ করি। কথাটি চমৎকার : 'সেই হলো ভালো পর্যটনকারী যে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। আর শ্রেষ্ঠ পর্যটনকারী হলো সেই যে জানে না সে কোথা থেকে এসেছে।'

জগৎপারাবারের তীরে

আমাদের সাবেকি কালীঘাট পাড়ার চুলকাটার সেলুনের বাইরের দরজায় লেখা ছিলো,

চুল—১৲ (এক টাকা)

শিশু—৷৷· (আট আনা)

তখন আমাদের বাড়িতে কোনো শিশু ছিলো না। আমার শ্রদ্ধেয় দাদা চুলকাটার দোকানের ঐ বিজ্ঞপ্তি দেখে এবং সস্তায় পাওয়া যাচ্ছে দেখে ঐ সেলুন থেকে একটাকা দিয়ে দুটো শিশু কেনার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখের বিষয় ক্ষৌরকার মহোদয় শিশু সরবরাহ করতে পারেননি, পারার কথাও নয়। কিন্তু তিনি আমার দাদাকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে ঐ শিশু মানে হলো শিশুদের চুলকাটা। ফলে পথে-ঘাটে, সময়-অসময়ে যখনই ঐ সেলুনওলার সঙ্গে দাদার দেখা হতো, দাদা তাঁকে তাগিদ দিতেন, 'ও মশায় শিশু এলো। আমাদের যে দুটো শিশু বড় দরকাব।'

কবি বলেছেন,'জগৎপারাবারের তীরে শিশুরা করে খেলা।' শিশুরা যদি শুধু জগৎপারাবারের তীরেই খেলতো তাহলে হয়তো তেমন আপত্তির কিছু ছিলো না কিন্তু তারা যে কোথায় খেলে আর কোথায় খেলে না, কেউই বলতে পারবে না, তারা নিজেরাও নয়। গাছের ডালে, পুকুরেব জলে, বাবার লেখার টেবিলে, মায়ের রান্নাঘরে, ঠাকুমার পুজোর জায়গায়, ইস্কুলের ক্লাসে, সিঁড়িতে, বারান্দায়, গাড়িতে এবং আরো এক হাজার এক জায়গায় তারা খেলে। খেতে খেতে খেলে, ঘুমোতে ঘুমোতে খেলে. কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে,

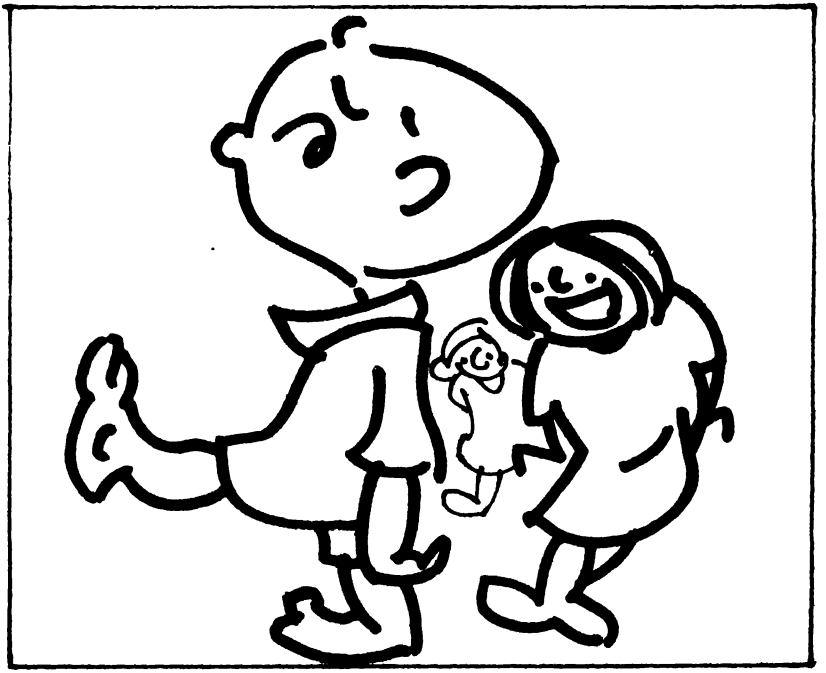

পড়তে পড়তে, লিখতে লিখতে এমন কি খেলতে খেলতে খেলে।

তা খেলুক, যত খুশি খেলুক, সরল শিশুদের সরল খেলাধুলোয় বাদ সেধে লাভ নেই। তা ছাড়া আমরা সবাই তো বিলিতি ছড়ায় সেই সাহেব খোকা জিলের কথা পড়েছি ; খেলা না করে শুধু কাজ করে যার খুব ক্ষতি হয়েছিলো।

জিলের ছড়া যে-দেশের, সে-দেশের উইলিয়াম ওয়র্ডসওয়ার্থ নামক এক প্রবীণ কবির ভালো ভালো উক্তির দিকে খুব ঝোঁক ছিলো, তিনিই বলেছিলেন শিশুরাই হলো মানুষের বাবা। এর চেয়ে সুন্দর হলো একটি ফরাসী প্রবাদ, শিশুরা হলো দেবদূত, তারা যত বড় হতে থাকে তাদের পাখা তত ছোট হতে থাকে।

দেবদূত, কবিতা এবং প্রবাদ-বাক্য থেকে মর্ত্য-পৃথিবীর শিশুদের কাছে ফিরে আসা যাক। এক বড় রেস্তোরাঁয় একদা দেখেছিলাম এক দম্পতি তাঁদের শিশুকন্যাটিকে নিয়ে নৈশাহার করছেন। তাঁরা একটা আস্ত সেদ্ধ মাছ নিয়েছেন যার অর্ধেকও তাঁরা তিনজনে খেয়ে উঠতে পারেন নি। বিল মেটানোর আগে কর্তা বেয়ারাকে বললেন, 'মাছ যেটুকু আছে, একটা প্যাকেট করে দাও তো আমাদের বেড়ালটার জন্যে।' শিশুকন্যাটি সঙ্গে সঙ্গে চোখ বড় বড় করে বলে ফেললো, 'বাবা, তা হলে আমরা আজ থেকে একটা বেড়াল পুষবো। কি ভালো, কি ভালো।' পিতৃদেবের কর্ণমূল আরক্ত করে মেয়েটি হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো।

অন্য একটি বাচ্চা মেয়ের কথা বলি। কয়েকদিন আগে তার একটি ভাই হয়েছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'খুকু, ভাই কেমন হয়েছে ?' সে ঠোঁট উলটিয়ে বলল, 'মন্দ না।' আমি তার মুখভাব দেখে অবাক হলাম, বললাম, 'সেকি, ভাই পেয়ে তুমি খুশি হওনি।' খুকু জানালো, 'ভাই না হয়ে বোন হলে অনেক ভালো হতো। আমি অনেক খুশি হতাম। বড় হলে তার সঙ্গে পুতুল খেলতে পারতাম।' আমি রহস্য করে বললাম, 'যাও না, যে হাসপাতাল থেকে মা ভাইকে নিয়ে এসেছে সেখানে গিয়ে ভাইকে বদলিয়ে মনের মতো একটা বোন নিয়ে এসো।' খুকু বিজ্ঞের মতো গম্ভীর মুখে বললো, 'সে তো প্রথমে হলে হতো। এখন সাত দিন ব্যবহার করা হয়ে গেছে এখন কি আর ফেরত নেবে।'

শিশুনারী বড় পাকা হয়, শিশুনর সে তুলনায় সরল কিন্তু গোয়ার ও ডানপিটে। দু'ভাই মারামারি করছে। মা রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে বড়টিকে নিয়ে পড়লেন, 'তুমি ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করলে ফের, তোমাকে বারণ করিনি ?' বড়ছেলে বললো, 'ভাই আমাকে আগে মেরেছে।' মা সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বললেন, 'তোমাকে বলিনি কখনো ভাইয়ের উপর রাগ হলে এক থেকে পনেরো পর্যন্ত গুনবে। দেখবে গুনতে গুনতে রাগ পড়ে যাবে।' এবার বড়ছেলে উত্তেজিত হয়ে গেলো, সে চেঁচিয়ে বললো, 'তুমি তো আমাকে পনেরো পর্যন্ত গুনতে বলেছো আর ওকে বলেছো রাগ হলে দশ পর্যন্ত গুনতে। আমি যখন এগারো-বারো গুনছি, তখনই তো দশ গোনা শেষ করে ও আমার পেটে ঘুষি মারলো।'

আরেকবার এক দাঁতের ডাক্তারের ওখানে দেখেছিলাম শিশুপুত্র সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ডেন্টিস্টের সঙ্গে বাদানুবাদ করছেন, 'আপনি বলেছিলেন খোকার পোকাখাওয়া দাঁতটা তুলে ফেলতে দশ টাকা নেবেন আর এখন বলছেন চল্লিশ টাকা।' ডেন্টিস্ট বললেন, 'দেখুন দশ টাকাই নিই, সেটাই নেওয়ার কথা। কিন্তু আপনার ছেলে দাঁত তুলতে গিয়ে এমন মারাত্মক চেঁচালো যে আমার বাকি তিনজন রোগী যারা চেম্বারে বসেছিলো ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে

গেছে। সেই জন্যে ঐ তিনজনের ত্রিশ আর আপনার ছেলের দশ, সব মিলিয়ে মোট চল্লিশ চাইছি।'

শুধু দাঁত তোলা নয়, এমন শিশুকে জানি যার চুল কাটাও প্রাণান্তকর ব্যাপার। এক ভদ্রলোককে দেখেছিলাম সেলুনের দরজায় দরজায় ছেলের হাত ধরে ঘুরছেন। সমস্ত ক্ষৌরকার সেই শিশুটিকে চেনেন। তাঁরা তাকে দেখেই আঁতকিয়ে উঠছেন, 'সর্বনাশ! না ওর চুল আমি কাটতে পারবো না, আমাকে মাপ করবেন দাদা।'

শিশুদের নিয়ে আমার সুদূর অতীতের শিক্ষক-জীবনের দু-একটা তুচ্ছ ঘটনা আজও মনে আছে। একটি বাচ্চা ছেলে একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'স্যার, কারোকে কি সে যা করেনি তার জন্যে শাস্তি দেওয়া উচিত!' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই না।' সে এবার খাপ খুললো, 'তা হলে স্যার, অঙ্কের দিদিমণি আমি অঙ্ক করিনি বলে সাজা দিলেন কেন?'

আরেকবার আরেকটি ছাত্রকে বলেছিলাম, 'রেফের নিচে দ্বিত্ব দেয়ার দরকার নেই, পূর্ব বানানে রেফের নিচে একটা ব কেটে দাও।' ছেলেটি অত্যন্ত সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলো, 'স্যার, কোন ব কেটে দেবো? উপরের ব না নিচের ব?'

সবচেয়ে জব্দ হয়েছি এই সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে তার ক্ষুদ্র পৌত্রীটিকে মুখে মুখে যোগ অঙ্ক শেখাতে গিয়ে। আমি তাকে বললাম, 'আমি যদি আজ তোমাকে তিনটে বল দিই, কাল তোমাকে দুটো বল দিই আর পরশুদিন একটা বল দিই তাহলে তোমার সবসুদ্ধ ক'টা বল হবে?'

মেয়েটি একটু মনে মনে চিন্তা করলো, তারপর বললো, 'আটটা।' আমি বললাম, 'সেকি, আটটা কেন?' সে বললো, 'আমি আপনার কাছ থেকে পেলাম তিনদিনে সবসুদ্ধ ছ'টা। আর আমার তো নিজেরও দুটো আছে, তাই আটটা।'

পুনশ্চ : শিশুকাহিনীতে এ গল্পটা না লেখাই ভালো। তাই মূল অংশে গল্পটা এড়িয়ে গেছি। তবু মনে যখন এসেছে, পুনশ্চের পর্দার আড়ালে বলেই ফেলি।

বাড়ির ছোট শিশুটির জন্যে কয়েকদিন হলো একজন নতুন দিদিমণি নিযুক্ত হয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় যখন দিদিমণি পড়িয়ে ফিরছেন শিশুটির মা পড়ার ঘরে এলেন, এসে শিশুটিকে বললেন, 'সানি, দিদিমণি যাওয়ার আগে দিদিমণিকে একটু আদর করে দাও।' সানি নামক শিশুটি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো, 'না, দিদিমণিকে আদর করবো না।' মা বললেন, 'কেন?' 'আদর করলে দিদিমণি আমাকে চড় মারবে।' সরল শিশুটি জানালো। মা অবাক হলেন, 'সে কি, তা কেন?' সানি বললে, 'কাল দিদিমণিকে বাবা আদর করতে গিয়েছিলো, বাবাকে দিদিমণি চড় মেরেছে।'

প্রমাদ তরণী

প্রমোদ তরণীর কথা চিরকাল ধরে শুনে আসছি। পয়সার অভাবে সেই উচ্ছল জাহাজে কোনোদিন চড়া হয়নি। প্রমোদ তরুণীর কথাও শুনেছি, দু-একজন উচ্ছলা প্রমোদ তরুণীকে চোখেও দেখেছি কিন্তু সাহসের অভাব এবং কুসংস্কারবশত এ জীবনে সে নৌকোয় আমার পা দেওয়া হলো না ; প্রমোদ তরণী অথবা প্রমোদ তরুণী কিছুতেই আমার চড়া হলো না। এতদিনে এই যৌবন যায়-যায়-যায়, না এই বয়সে এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই, কোনোদিন দুঃখ ছিলোও না। কিন্তু প্রমোদের বদলে প্রমাদ ; আমার এ কি সর্বনাশ হলো ! বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে ভুল করে ফেললাম ; আশঙ্কা হচ্ছে এই সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির একপৃষ্ঠা অবশেষে প্রমাদ তরণী অথবা ভুলের নৌকো হিসেবে চিহ্নিত না হয়ে যায় !

হাবড়া থেকে শ্রীযুক্ত মিহির মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবুদ্ধির পরকীয়া বৃত্তের যেখানে পঞ্চসতীর কথা লিখেছিলাম পঞ্চকন্যা না লিখে, সেই গাফিলতিটুকু অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। বস্তুত ওখানে আমার বিদ্যাবুদ্ধির দুটি স্খলন হয়েছিলো।

এক,পঞ্চকন্যা লিখতে পঞ্চসতী লিখেছিলাম। যে পঞ্চকন্যাকে স্মরণ করলে মহাপাতক দোষ নাশ হয়, অহল্যা, দ্রৌপদী ইত্যাদি পঞ্চকন্যা আমাকে রক্ষা করেননি। তার কারণ অবশ্য আমার দ্বিতীয় ত্রুটিতে রয়েছে। পঞ্চকন্যার মধ্যে আমি এক সতীকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা এবং মন্দোদরী এই স্মরণীয়া পঞ্চকন্যার মধ্যে

কুন্তীর বদলে আমার ভুলে সীতা প্রবেশ করেন। সীতা পঞ্চকন্যার মধ্যে পড়েন না, তিনি পঞ্চসতীর একজন, তাঁর এই অনুপ্রবেশ অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে। এ আমারই পাপ।

সে যা হোক, এই সূত্রে সর্বপ্রথমে মনে পড়ছে আমাদের নবীন প্রধানমন্ত্রীর একটি চমৎকার রসিকতা। শ্রীযুক্ত রাজীব গান্ধীর রসিকতাগুলি রীতিমত উচ্চমানের। তিনি যদি ঘুণাক্ষরেও বাংলা জানতেন তবে সন্দেহ করতে পারতাম এসব রসিকতা বিদ্যাবুদ্ধি পড়েই তাঁর আয়ত্ত হয়েছে।

গল্পটি প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন রাজ্য-কেন্দ্রের আর্থিক সম্পর্কের সূত্রে। রাজনীতি বা অর্থনীতি থাক, তার চেয়ে মূল গল্পটি বলি। এক হোটেলে এক ভদ্রলোক খেতে গিয়ে মুরগির মাংস অর্ডার দিয়েছেন। বেয়ারা প্লেটে করে যখন খাবার দিলো সে ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর প্লেটের মাংস মোটেই মুরগির নয়, অন্য কিসের মাংস যেন। তিনি বেয়ারাকে ডেকে পাঠালেন।

বেয়ারা আসতে তাকে বললেন, 'আমি তো তোমাকে মুরগির মাংসের অর্ডার দিয়েছিলাম।' বেয়ারা তেল-চুলুদ সিক্ত সাদা কোটের হাতা দিয়ে ঘাড় চুলকিয়ে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলো, 'আজ্ঞে।' ভদ্রলোক বললেন, 'আমার প্লেটে এটা কি মুরগির মাংস ?' 'আজ্ঞে মুরগি একটু কম পড়েছিলো, তাই মুরগির মাংসের সঙ্গে ঘোড়ার মাংস একটু মেশানো হয়েছে।' বেয়ারাটি বিনীতভাবে জানালো। ভদ্রলোক হাতের কাঁটা দিয়ে মাংসটা উল্টেপাল্টে বললেন, 'এর মধ্যে তো মুরগির মাংসের কোনো হদিশ পাচ্ছি না। কতটা মুরগির মাংসের সঙ্গে কতটা ঘোড়ার মাংস মেশানো হয়েছে ?' বেয়ারাটি বললেন, 'আজ্ঞে, একেবারে সমান সমান, ফিফটি-ফিফটি।' ভদ্রলোক অবাক হলেন, 'ফিফটি-ফিফটি, পঞ্চাশ-পঞ্চাশ মানে আধাআধি ? কতটা ঘোড়ার মাংসে কতটা মুরগির মাংস দিয়েছো ?' বেয়ারা জানালো অবিচলভাবে, 'একটা ঘোড়ার মাংসের সঙ্গে একটা মুরগির মাংস মিল দেওয়া হয়েছে।'

গল্পটি পুরনো কিন্তু ভালো। প্রধানমন্ত্রী বলেছেনও রীতিমতো গুছিয়ে, ঠিক জায়গায় প্রকৃত সুরসিকের মতো। তাঁর এ গুণ এর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বহুল প্রচারিত হয়ে তাঁর কয়েকটি কৌতুকী জনপ্রিয় হয়েছে।

সে না হয় হলো। আমি এই গল্পটিতে এলাম, শুধু এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে একটা ঘোড়ার মাংসের সঙ্গে একটা মুরগির মাংস যদি মেশানো যায় এবং তখনো যদি সেটা মুরগির মাংস থাকে তাহলে চারকন্যার মধ্যে এক সতীকে প্রবেশ করালে সেই সমাহারকে পঞ্চসতী বলাও যায়।

না। যায় না। ভুল ভুলই। এই ভুলের জন্যে আমি বিব্রত দুঃখিত লজ্জিত এবং অনুতপ্ত।

আরো একটা ভুল আমি করেছি। কেউ মিলিয়ে দেখেননি। পরকীয়া মালার ঐ দ্বিতীয় নিবন্ধে সেক্সপীয়ারের একটি সনেটের প্রথম দু'লাইনের উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে আমি লিখেছিলাম, আটাশিতম সনেট, আসলে ওটা হবে একশো আটত্রিশতম সনেট। সেক্সপীয়ারের সনেট সঙ্কলনে কবিতাগুলির নম্বর দেওয়া আছে রোমান হরফে। পঞ্চাশ এবং একশোর হরফে গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে নিজের দোষ নিজেই ধরে দিলাম। তবে আপ্ত বাক্য অনুসারে ভুল সংশোধন করা উচিত ভুল করার আগে। আর সব থেকে বড় ভুল

হলো, ভুল থেকে শিক্ষা না পাওয়া।

একজন মনীষী বলেছেন, ভ্রম তিন কারণে হতে পারে। এক, জানি না বলে। দুই, ভাবিনি বলে। তিন, পরোয়া করি না বলে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হলো কেউ যদি ভুল ধরিয়ে না দেয়। তখন যে ভুল করে বসেছে সে আহত হয়, কারণ সে বুঝতে পারে তাকে অন্যেরা গুরুত্বই দিচ্ছে না, তার ভুল নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু কেন ভুল হলো ? এ সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কথিত একটি পুরনো গল্প মনে পড়ছে।

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক শয্যাশায়ী। তিনি চলাফেরা করতে পারেন না। চলাফেরা শুধু নয়, বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারেন না। ফলে বিছানাতেই বেডপ্যান দিয়ে তাঁকে প্রাকৃতিক নৈমিত্তিক কার্যাদি সারতে হয়। শয্যাশায়ী হলে কি হবে, তিনি কিন্তু জ্ঞান হারাননি, তাঁর জ্ঞান রয়েছে রীতিমত টনটনে। বিশেষ অসুবিধা না হলে তিনি নিজেই বিছানায় বেডপ্যানে একা-একাই কারো সাহায্য না নিয়ে মূত্রত্যাগ করেন। পরে অন্য কেউ এসে, সেটা সরিয়ে নিয়ে পরিষ্কার করে আবার রেখে দেয় বিছানায়।

তা একদিন হয়েছে কি, ভদ্রলোক বেডপ্যানে মূত্রত্যাগ করতে গিয়ে বেডপ্যানের বাইরে করে ফেলেছেন, বিছানা-টিছানা সব ভিজে গেছে। পিতামহের এই অপকর্ম দেখে ভদ্রলোকের নাতি এসে বললো, 'ছিঃ ছিঃ ঠাকুর্দা, এটা কি করলে, বিছানাটা ভিজিয়ে ফেললে !' ঠাকুর্দা নিজেও খুব অপদস্থ বোধ করছিলেন এই ঘটনাটায়, তিনি জিব কেটে বললেন, 'হঠাৎ হয়ে গেলো। স্লিপ অফ টঙ্গ (slip of tongue)।'

আমিও যদি ঐ বৃদ্ধের মতো জিব কেটে বলতে পারতাম, 'স্লিপ অফ টঙ্গ', তাহলে কি পার পেয়ে যেতাম ?

এক-আধটা ভুল করে পার পাওয়া যে যায় না তা নয়। যখন ভুলের সংখ্যা বেড়ে যায়, যখন পেনসিলের আগে ইরেজার ফুরিয়ে যায়, তখন তো আর কোনো ব্যাখ্যা থাকে না।

ভুলকে হালকা করে দিয়েছেন ইংরেজ কবি জন ড্রাইডেন। তাঁর 'সমস্ত ভালোবাসার জন্যে'(All for love) কবিতার প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন,

ভুল হলো খড়কুটো,
ভেসে থাকে উপরের জলে,
যদি তুমি রত্ন চাও
ডুব দাও জলের অতলে।

আর ভুল নয়। এবারের এই ভুল বিদ্যাবুদ্ধি একটি করুণ গল্প দিয়ে শেষ করি। গল্পটি ভালো তাই আবারো নিবেদন করছি।

অনেকদিন আগে এক বিদেশী শহরে এই ঘটনাটি ঘটেছিলো। একটা সাবেকি হোটেলে উঠেছিলাম। শীতের সন্ধ্যা। বাইরে হালকা বরফ তুলোর মত উড়ছে। আমি দোকানে না কোথায় গিয়েছিলাম। গায়ের ওভারকোট সামান্য ভিজে গেছে। আমি হোটেলে ঢুকেই সরাসরি নিজের ঘরে গেলাম, ওভারকোটটা প্রায় খুলতে খুলতে।

তাড়াতাড়িতে ভুল হয়ে গেলো। আমার খুব দোষও নেই। এই সব হোটেলের ঘরগুলো প্রায় সবই একরকম দেখতে। নম্বর মিলিয়ে না ঢুকলে নিজের ঘর চেনা কঠিন। আমি

নিজের ঘর ভেবে যে ঘরে ঢুকলাম, সে ঘরে এক বুড়ি মেম তখন ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছেন। আমি ঘরে ঢুকে তাঁকে দেখেই পিছিয়ে এলাম, বললাম, 'দুঃখিত, ভুল হয়ে গেছে।' বৃদ্ধা আমার দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে বললেন, 'বাছা তোমার কিছু ভুল হয়নি। শুধু পঞ্চাশ বছর দেরি হয়ে গেছে।'

অসুখবিসুখ

অসুখবিসুখ থেকে যত দূরে সরে থাকার চেষ্টা করি ততই আমার দুষ্টবুদ্ধি আমাকে জোর করে অসুখবিসুখের কাছে নিয়ে যায়।

সেই কাণ্ডজ্ঞানে কবে শুরু হয়েছিল বিদ্যাবুদ্ধির পরিধি প্রায় অর্ধেক অতিক্রম করে এলাম, তবু অসুখবিসুখ, ডাক্তার-বৈদ্য আমার সঙ্গ ছাড়ল না।

আকস্মিকভাবে একেকটা এমন ঘটনার সম্মুখীন হই যে, সেটা চটপট লিখে না রাখলে মন থেকে হারিয়ে যাবে। কিন্তু তুচ্ছ একটা-আধটা গল্পে তো আর বিদ্যাবুদ্ধির পৃষ্ঠা কিংবা রসিক পাঠিকার মন ভরে না, তাই এদিক-ওদিক থেকে কিছুটা উঞ্ছবৃত্তি, কিছুটা জোচ্চুরি করে অর্ঘ্য সাজাতে হয়।

এবার প্রথমে একটা চোরাই গল্প দিয়েই আরম্ভ করি। এক বৃদ্ধ ভদ্রমহিলা নানা ধরনের উপসর্গে ভুগছিলেন। ডাক্তার দেখেছেন, কিছু কিছু উপশমও হয়েছে। সেদিন ডাক্তার বাড়িতে দেখতে এসেছেন, রোগিণী কাতরভাবে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, অন্য সব কষ্ট তো অল্পবিস্তর দূর হয়েছে। কাশিটা কম। মাথাভার আব তেমন নেই। বুকের মধ্যেও আর ততটা ঘড়ঘড় করে না। কিন্তু হাঁপের কষ্টটা, নিঃশ্বাসের টানটা কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না।' ডাক্তারবাবু খুবই মনোযোগ দিয়ে রোগিণীর অভিযোগ শুনলেন। তারপর প্রেসকৃপশন লিখতে লিখতে বললেন, 'কিছু ভাববেন না। ওই নিঃশ্বাসের ব্যাপারটা শিগগির বন্ধ করে দেব।'

নিঃশ্বাসের ব্যাপারটা বন্ধ করে দেওয়া ডাক্তারবাবুর পক্ষে কতটা উচিত হবে জানি না। কিন্তু ডাক্তারবাবুরই বা দোষ কি ? আমার কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ওই ডাক্তারবাবুদের দিকেই, তার একটা কারণ বোধহয় কয়েকজন ভালো ডাক্তার আমার বিশেষ ব্যক্তিগত বন্ধু, আমার প্রতিবেশীও এই শহরের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক। তবে আত্মীয়ের মধ্যে মাতৃকুলে, পিতৃকুলে, শ্বশুরকুলে বিশেষ নিকট কেউ, আমাদের পরিবারের অন্তর্গত কেউ ডাক্তার নয়।

আর তা ছাড়া, শুধু ডাক্তার কেন, কোনো সমাজসেবা বা পরোপকারমূলক কোনো বৃত্তির সঙ্গে আমাদের চৌদ্দপুরুষে কেউ কোনো দিন জড়িত ছিল না। আমরা চিরকাল যা করেছি সব নিজেদের জন্যে। অর্থ উপার্জনের লোভে আমরা কত কি যে করতে পারি এই বিদ্যাবুদ্ধি রচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ডাক্তারবাবুদের নিয়ে দু-একটা নিন্দামূলক গল্পে যাব, তাই তার আগে আত্মনিন্দা এবং বংশনিন্দা করে নিলাম।

এর পরের গল্পটি কেউ কেউ আগেই হয়ত শুনেছেন। এ গল্পটি এক বিখ্যাত সার্জনকে নিয়ে। তিনি একজন ধনবতী মহিলার মূল্যবান অপারেশন সেরে বাড়ি ফিরে এসে স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'ওগো, শুনছো। আজকের অপারেশনের এই পাঁচ হাজার টাকাটা রাখ। আরেকটু হলে টাকাটা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল প্রায়। সতীসাধ্বী স্ত্রী পঞ্চাশটা একশো টাকার নোট কপালে ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর পাকা চোখে ধরা পড়েছে স্বামীর আরো কিছু বলার আছে। সত্যিই তাই, সার্জনসাহেব বললেন, 'আজকে একেবারে লাস্ট মোমেন্টে অপারেশনটা করলাম। আরেকটু দেরি হলে আর অপারেশন করতে হত না। সর্বনাশ হয়ে যেত।' বেচারী সরলা গৃহিণী বললেন, 'ও মা, বউটা মরে যেত!' সার্জন ম্লান হেসে, গলা নিচু করে বউকে বললেন, 'না হে গিন্নি তা নয়। অপারেশন ছাড়াই ভালো হয়ে যেত। এই টাকাটা হাতছাড়া হত।'

এর পরের কথিকাটি নাট্যকারে পরিবেশন করছি। স্থান, একটি হাসপাতালের সার্জিক্যাল ওয়ার্ড। কয়েকটি বেডে বিভিন্ন ধরনের রোগী শায়িত। একটি বেডে এক ভদ্রলোকের দুটি পা টানা দিয়ে উপরের দিকে বাঁধা। তাঁর বেডের পাশে ডাক্তারসাহেব দাঁড়িয়ে, খুব গম্ভীর মুখ। রোগীর মুখমণ্ডল উদ্বেগপূর্ণ।

ডাক্তারসাহেব : বুঝলেন মিস্টার চক্রবর্তী, আমি খুবই দুঃখিত। আপনার জন্যে বড় খারাপ খবর নিয়ে এসেছি। তবে একটা সুখের কথা সেই সঙ্গে একটা ভালো খবরও আছে।

মিস্টার চক্রবর্তী : (বিহ্বলভাবে) খারাপ খবর? ভালো খবর?

ডাক্তার সাহেব : হ্যাঁ। দু' রকম খবরই আছে। কোনটা আগে দেবো, খারাপটা না ভালোটা?

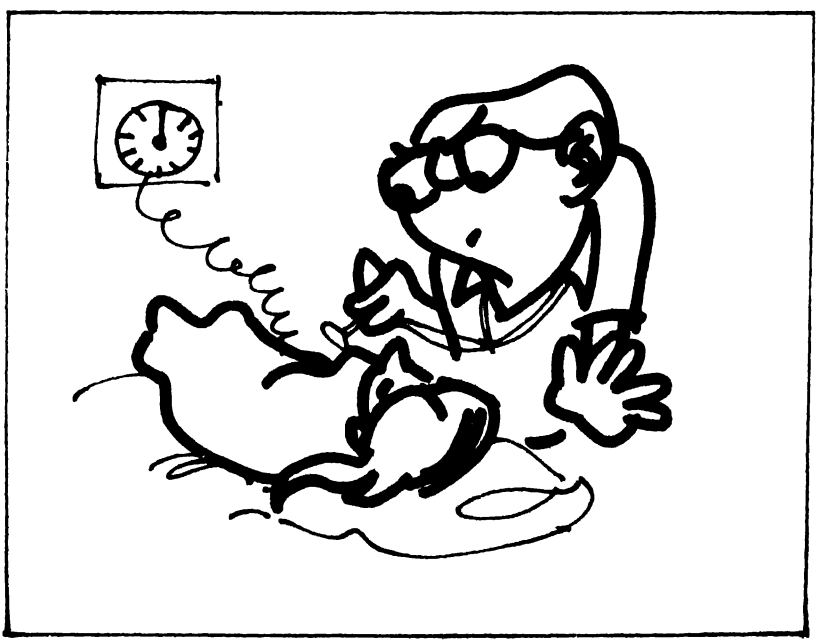

মিস্টার চক্রবর্তী : ডাক্তারবাবু, আমাকে খারাপ খবরই আগে বলুন।

ডাক্তার সাহেব : খারাপ খবরটা হল আপনার দুটো পা-ই কেটে ফেলতে হবে হাঁটু পর্যন্ত।

মিস্টার চক্রবর্তী : (অত্যন্ত হতাশভাবে) দুটো পা কাটতে হবে। এর পরে আপনার ভালো খবর কি থাকতে পারে ?

ডাক্তার সাহেব : পাশের বেডে যিনি আছেন ওই যে হাতভাঙা রায়চৌধুরী মশায়,তিনি আপনার চপ্পল জোড়া কিনতে চেয়েছেন।

এই হাস্যকর নাটকটি বড়ই বেদনাবহ এবং কিঞ্চিৎ জটিল। বরং দু-একটি সরল গল্প বলি।

প্রথমটি আমার স্বচক্ষে দেখা এবং স্বকর্ণে শোনা। ডাক্তারখানায় বসে আমাদের পারিবারিক ডাক্তারবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম, তিনি গল্প করার ফাঁকে ফাঁকে রোগী দেখছিলেন। গলায় কাশি হয়েছে একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে ওষুধ নিতে এসেছে। ডাক্তারবাবু তাকে একটা কাশির সিরাপ দিয়ে বললেন, চার চামচ করে খেতে। ছেলেটি ওষুধটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে হঠাৎ ফিরে এল, এসে প্রশ্ন, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি আমাকে চার চামচ করে খেতে বললেন ?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, চার চামচ।' ছেলেটি বললো, 'কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমাদের বাড়িতে যে মাত্র তিনটে চামচ আছে।'

আরেকবার অন্য এক রোগীকে বলতে শুনেছিলাম, 'ডাক্তারবাবু,আপনি যে আমাকে এই হলদে আর এই লাল ট্যাবলেট এই দুটো সকালে খালি পেটে খেতে বলেছেন, যেটাই আগে খাই তখন তো আর পেট খালি থাকবে না, দ্বিতীয়টা তাহলে কি করে খালি পেটে খাব !'

এর চেয়ে মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী ছিলাম অন্য একটা ডাক্তারের ঘরে। বসে আছি ডাক্তারবাবুকে দেখাবো বলে, সর্দিজ্বর না কি হয়েছিল যেন। আরও দু-চারজন অপেক্ষা করছেন। এমন সময় রোগভারাক্রান্ত এক অসুখী এলেন, তাঁর আর তর সইছে না। সকলকে ডিঙিয়ে তিনি সরাসরি ডাক্তারবাবুর কাছে চলে গেলেন, গিয়ে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আমার খুব খারাপ অবস্থা। আমি আর এক মিনিটও বাঁচব না।' ডাক্তারবাবু অন্য এক রোগীর প্রসারিত জিভের দিকে দৃষ্টি দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে নির্বিকারভাবে এক-মিনিট-বাঁচব-না রোগীকে বললেন, 'ঠিক আছে, দু মিনিট বসুন, দেখছি।'

আরেকটি নাটকীয় কাহিনী উল্লেখযোগ্য। গল্পটি অবশ্য আমার দেখা নয়, শোনা। পরেশবাবু ডাক্তার দেখাতে গিয়েছেন। ডাক্তারবাবু খুব যত্ন নিয়ে দেখছেন, পরেশবাবুর সম্ভবত ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। বুকে স্টেথিসকোপ নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তারবাবু পরেশবাবুকে বললেন, 'আপনাকে দেখতে দেখতে আমার বারবার সুরেশবাবুর কথা মনে পড়ছে।'

সুরেশবাবু এই পাড়ারই লোক ছিলেন, এই ডাক্তারবাবুরই রোগী। সুরেশবাবুর কয়েকদিন আগে জনডিস রোগে মৃত্যু হয়েছে। সুরেশবাবুর নাম শুনে পরেশবাবু চমকে উঠলেন, 'সেকি ডাক্তারবাবু, আমারও জনডিস হয়েছে নাকি ? মারা যাব নাকি ?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার তো ফ্লু হয়েছে মনে হচ্ছে। লিভারটিভার তো ভাল, জনডিস নয়।' 'তা হলে আমাকে দেখতে দেখতে সুরেশবাবুর কথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ?' করুণ জিজ্ঞাসা পরেশবাবুর।

হাতের মণিবন্ধে নাড়ি ধরে ব্লাডপ্রেসার দেখতে দেখতে ডাক্তারবাবু বললেন, 'না, না, অসুখের ব্যাপার নয়। তবে ওই সুরেশবাবুও আপনার মতই আমাকে কোনো দিন ভিজিট দিতেন না তো, তাই আপনাকে দেখতে দেখতে সুরেশবাবুর কথা মনে পড়ছে।'

অসুখ-বিসুখের শেষ গল্পটি মর্মান্তিক রকম সত্যি। এক বেদনাতুরা রোগিণীকে ডাক্তারবাবু দেখছেন, রোগিণী মধ্যে-মধ্যেই ককিয়ে ককিয়ে উঠছে। প্রায় শেষ অবস্থা মনে হচ্ছে। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা করবীদেবী, এই যন্ত্রণাটা আপনার কতক্ষণ পর পর হয়!' করবীদেবী গোঙাতে গোঙাতে বললেন, 'প্রত্যেক পাঁচ মিনিট অন্তর যন্ত্রণাটা ফিরে আসে। ওঃ ডাক্তারবাবু!' ডাক্তারবাবু এবার প্রশ্ন করলেন, 'তারপর ব্যথাটা কতক্ষণ থাকে?' রোগিণী এবারে বললেন, 'তা অন্তত এক ঘণ্টার আগে ব্যথাটা কমে না, কি যে কষ্ট ডাক্তারবাবু।'

হিন্দি

সেই কবে কিশোর বয়েসে লিখেছিলাম যে দশরথের চার ছেলের হিন্দি অনুবাদ হলো দশরথকা চৌবাচ্চা, এরপর আর বিশেষ ভালো করে হিন্দি শেখা হয়নি।

আজ কিছুকাল হলো আবার নতুন করে হিন্দি শেখা আরম্ভ করেছি। দূরদর্শনের পর্দায় সপ্তাহান্তিক হিন্দি সিনেমার প্রতি আমার একটা আসক্তি জন্মেছে। প্রথম দিকে খুব ভালো বুঝতে পারতাম না কিন্তু ভাব-ভাষা ঠিক বুঝি-না-বুঝি আসল ব্যাপারটা এখন বেশ ধরতে পারছি। আমি এখন বুঝে গেছি শেষ দৃশ্য জীবনপণ লড়াইয়ের পরে যে জীবিত থাকে সেই হলো কাহিনীর নায়ক, আর শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে যে মারা পড়ে সে হলো খলনায়ক।

এ সব বোঝা ছাড়াও হিন্দি সিনেমা দেখে ক্রমশ আমার শব্দের স্টক বাড়ছে। এখন পর্যন্ত যে কয়টি নতুন শব্দ আমি আয়ত্ত করেছি তার মধ্যে সব চেয়ে ভালো হলো, খামোশ।

খামোশ শব্দটির শেষ অংশটি 'শ' না 'স' নাকি 'ষ', সেটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শব্দটির মানেটাও যে ভালো বুঝতে পেরেছি তা নয়। কিন্তু 'খামোশ' একটি চমৎকার ধমক, বাংলাতেও এর ব্যবহারে চমৎকার কাজ হয়।

ময়দানে আমার কুকুর নিয়ে বেড়াতে গিয়ে স্বভাব-বদমাইশ কুকুরটি সামান্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করলেই আমি তাকে ধমক দিই, 'খামোশ', সে সঙ্গে সঙ্গে লেজ গুটিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

আজকাল রাস্তায় ট্যাক্সি ধরতে হলে আর কাতর স্বরে 'ট্যাক্সি,ট্যাক্সি' করে মরীচিকার পিছনে ছুটে ক্লান্ত হই না। আমার কম্বু-বিনিন্দিত কণ্ঠে একবার জোর খাঁকারি দিয়ে ট্যাক্সিওয়ালার চোখের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠি, 'খামোশ', ট্যাক্সিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়, 'স্যার' বলে পিছনের সিট খুলে যত্নে তুলে নেয়।

'খামোশ' কিংবা অন্য যে কোনো শব্দের মানে না জেনে এই লাভজনক ব্যবহার, এটা যে কখনো যথেষ্ট পরিমাণ বিপজ্জনক হতে পারে, সে বিষয়ে আমি সচেতন।

শিবরাম চক্রবর্তীর অসামান্য একটি গল্পে শব্দের ভুল ব্যবহারের পরিণতি দেখানো আছে। গভীর রাতে শিশু কাঁদছে, শিশুকে ঘুম পাড়াতে হবে। নব নিযুক্তা হিন্দুস্থানী আয়াকে নির্দেশ দেওয়া হলো, 'যাও, ইসকো ঘুমাকে লে আও।' নির্দেশক বলতে চাচ্ছেন যে শিশুটিকে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে এসো। কিন্তু হিন্দিতে ঘুমাকে মানে ঘুরিয়ে বা বেড়িয়ে নিয়ে এসো। ফলে নির্দেশ পাওয়া মাত্র আয়াটি বাচ্চাটিকে নিয়ে গভীর রাতের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো।

অবশ্য স্বর্গীয় শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে কাজের লোকের ভুল বোঝা এই প্রথম বা নতুন নয়। ঘটনাটি হিন্দি-জড়িত নয় কিন্তু স্মরণীয়। কাজের লোককে বলা হয়েছে দরজা ভেজাতে অর্থাৎ দরজাটা কুলুপ না দিয়ে টেনে দিতে কিন্তু সে ধরতে পারেনি। এক বালতি জল তুলে এনে দরজা জল দিয়ে ভেজাতে লেগে গেলো কাজের লোকটি।

কাজের লোক নিয়ে অন্য একটা বিদ্যাবুদ্ধি হয়ে যাবে। আপাতত শিবরাম চক্রবর্তীর হিন্দি ব্যাপারটুকু সেরে নিয়ে আমার নিজের হিন্দিপ্রমাদে প্রবেশ করবো।

শিবরামের সেই গল্পটা বোধ হয় নকুড় কাকাকে নিয়ে। সেই নকুড়কাকা যার সম্পর্কে শিবরাম চক্রবর্তীর অহঙ্কার ছিল। একশো একার জমি আমার নকুড়কাকার একার। নকুড়কাকা যেমন বড়লোক, তেমনি কৃপণ ; যাকে বলে কৃপণ-কুলচূড়ামণি। সেই নকুড়কাকা পোস্টাফিসে টাকা জমান হিন্দিতে সই করে। কারণ খুব স্পষ্ট। একে পোস্টাফিসে কখনোই সই মেলে না এবং সেই জন্যে টাকা তোলা যায় না, তার উপরে অধিকতর নিরাপত্তার জন্যে নকুড়কাকা হিন্দিতে নাম সই করেন। এমনিতেই সই মেলে না, তার উপরে হিন্দি সই, ফলে ইচ্ছে বা প্রয়োজন থাকলেও কখনোই নকুড়কাকার পক্ষে

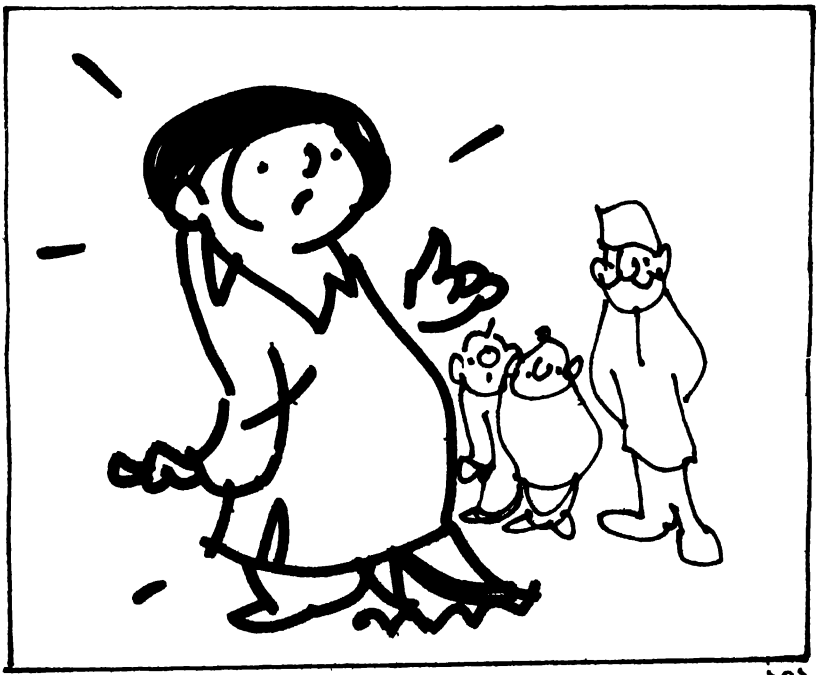

পোস্টাফিসে একবার রাখা টাকা আর তোলা সম্ভব হয় না। সুতরাং জমা টাকা আর খরচ হয় না। একেবারে অকাট্য যুক্তি। পোস্টাফিসে নকুড়কাকার টাকা জমার উপরে জমা পড়তে থাকে, কখনোই সেটা তোলা যায় না।

শিবরাম চক্রবর্তীর ঠিক পরেই আমার নিজের কথায় চলে আসা খুবই গর্হিত আচরণ হবে, একটু ঔদ্ধত্যও হয়তো হবে তাই আমি সরাসরি না এসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মারফত আসছি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার নামে এই গল্পটা লিখেছিলেন তাঁর 'মায়াকাননের ফুল' নামক স্মৃতিময় উপন্যাসে। সেটা হয়তো সবাই পড়েছেন। আমি সেই জন্যে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ও আলাদা করে নিবেদন করছি।

কাল্পনিক ঘটনাটি ঘটেছিলো হাজারিবাগের একটা গ্রামে। তখন তাতাইয়ের বয়স পাঁচ-ছয়ের বেশি হবে না। আমরা সেবার পুজোর ছুটিতে হাজারিবাগের ঐ গ্রামে মাসখানেক ছিলাম। এরই মধ্যে একদিন তাতাইকে একটা বোলতা কামড়ায়। কপালের পাশে কামড়েছিলো, কিছুক্ষণ পরে চোখমুখ ফুলে উঠলো। মিনতি প্রচণ্ড চেঁচামেচি শুরু করে দিলো, আমি যত বলি, 'আমাকে ছেলেবেলায় বহুবার বোলতা কামড়িয়েছে, হঠাৎ একটা বোলতার কামড়ে কিছু হয় না। আধখানা অ্যাসপিরিন দিয়ে দাও ; মিনতি তত উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তার সঙ্গে তাতাইয়ের আকুল ক্রন্দন।

রাস্তার মোড়েই বসেন এক দেহাতি ডাক্তার। দুঃখের বিষয়, ভদ্রলোক ভালো বাংলা বোঝেন না। তাঁর কাছে তাতাইকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী গেলাম বটে কিন্তু আমার সামান্য হিন্দিজ্ঞানে তাঁকে বোঝাতে পারলাম না কি হয়েছে। বোলতার হিন্দি কি ভাবতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে গেলাম। মধুমক্ষি, মৌমচ্ছি, মৌমক্ষি কত কি বললাম কিন্তু ডাক্তারবাবু আর বোঝেন না।

পাশেই এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক বসেছিলেন। দুদিন আগে রাস্তায় পরিচয়, হাজারিবাগ সদর শহরে এই ভদ্রলোক এক সময় কিছুদিন ছিলেন, কিছুটা বাংলা জ্ঞান আছে। অগত্যা তাঁকে প্রশ্ন করলাম, 'ভাইয়া, হামলোক তো বোলতাকে বোলতা বোল্‌তা হ্যায়, আপ লোক বোলতাকো ক্যায়া বোলতা হ্যায় ?'

অনুগ্রহ করে কোনো পাঠক-পাঠিকা আমার এ প্রশ্নের কী উত্তর পেয়েছিলাম এবং অতঃপর কি হয়েছিলো অনুমান করে নেবেন। ততক্ষণে আমি আমার এক সরকারি বন্ধুর হিন্দি সঙ্কটের কথা বলি।

বন্ধুটিকে চাকরি পাকা হওয়ার আগে যথারীতি কয়েকটি বিভাগীয় পরীক্ষা পাস করতে হয়েছিলো, তার মধ্যে একটি হলো হিন্দি। লিখিত এবং মৌখিক দুরকম পরীক্ষাই পাস করতে হবে।

লিখিত পরীক্ষা বন্ধুবর কোনোভাবে পাস হলেন। এবার মৌখিক পরীক্ষা। খুব সোজা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন হিন্দির পরীক্ষক, 'কলকাতার বাইরে থেকে একজন বেড়াতে এসেছেন, তাঁকে আপনি কোথায় কোথায় নিয়ে যাবেন, কি কি দেখাবেন হিন্দিতে বলুন।'

সোজা প্রশ্ন পেয়ে বন্ধুটি গড়গড় করে বলে চললেন, রাজভবনমে লে যায়গা, চৌরঙ্গীমে লে যায়গা, জাদুঘরমে লে যায়গা, চিড়িয়াখানামে লে যায়গা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালমে লে যায়গা...'। হিন্দি পরীক্ষক তাঁকে নিরস্ত করে বললেন, 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ইংরেজি হয়ে গেলো, ওটা হিন্দি করে বলুন।'

বন্ধুবর অনেক ভাবলেন, কিন্তু কিছুতেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হিন্দি প্রতিশব্দ মনে এলো না। তখন দুবার ঘাড় চুলকে বললেন, 'হাম উসকো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালমে নেহি লে যায়গা, উসকো পরেশনাথকা মন্দিরমে লে যায়গা।'

বন্ধুর আর সেবার পাস হওয়া হলো না। ছয় মাস পরে আবার বিভাগীয় পরীক্ষা। সেই একই পরীক্ষক, একই ছাত্র। এবার প্রশ্ন আরো সোজা,'ষাট থেকে সত্তর পর্যন্ত হিন্দিতে বলুন।' বন্ধুটি কিঞ্চিৎ চিন্তা করে নিয়ে, সংখ্যাগুলিকে হিন্দিত্ব দেওয়ার জন্যে 'ষ' এবং 'স' এই দুটি বর্ণকে 'ছ' করে অর্থাৎ ষাট, একষট্টি, বাষট্টির জায়গায় ছাট, একছট্টি, বাছট্টি করে বলে গেলেন।

নিরুত্তাপ পরীক্ষক ছত্তুর পৌঁছানোর পরে থামালেন, তারপর বললেন, 'এবার বাংলায় বলুন।' 'ষ' বা 'স' বদল করে দিলে বাংলায় যে ব্যাপারটা একই এবং সেটা হিন্দি নয় সেটা বুঝতে বন্ধুবরের এক সেকেণ্ড লাগলো। তিনি 'বহুৎ শুককরিয়া' বলে বিদায় নিলেন।

অনর্থ

অর্থই অনর্থ, প্রাজ্ঞব্যক্তিরা একথা বার বার বলে গেছেন। প্রথমে বেশি টাকা পয়সার ব্যাপারে যাচ্ছি না, সিকি দিয়ে আরম্ভ করি।

সিকির গল্পটা দু' রকম।

একটা বাচ্চা পয়সা নিয়ে খেলতে খেলতে একটা সিকি গিলে ফেলেছে। সময় সকাল সাড়ে দশটা। পাড়ার ডাক্তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে রোগীদের বাড়ি ভিজিট করতে গেছেন। বাসায় পুরুষমানুষ কেউ নেই, সবাই অফিসে, ছেলেটির মা পর্যন্ত অফিসে কাজ করেন,তিনিও একটু আগে বেরিয়েছেন। এমন সময়ে এই দুর্দৈব। শিশুটির বৃদ্ধা ঠাকুমাই নাতির দেখাশোনা করেন। নাতিটির সিকি গিলে ফেলা দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে প্রচণ্ড চেঁচামেচি, কান্নাকাটি জুড়ে দিলেন। 'ওরে আমার কি সর্বনাশ হলো রে,' বলে কপাল চাপড়াতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আশেপাশের বাড়ি এবং রাস্তা থেকে বেশ কিছু লোক এই ক্রন্দনে আকৃষ্ট হয়ে এ বাড়িতে এসে ভিড় জমালো। বৃদ্ধার আকুল ক্রন্দনের মধ্য থেকে তারা যখন শিশুটির সিকি গেলার তথ্যটি আহরণ করতে সক্ষম হলো তখন একেকজন একেকরকম পরামর্শ দিতে লাগলো।

কেউ বললো, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পেট অপারেশন করে সিকিটা বার করতে হবে, না হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নির্ঘাত মৃত্যু। অন্য একজন বললো, একরকম হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আছে যা এক ফোঁটা খেলেই পেটের মধ্যে সিকিটা সঙ্গে সঙ্গে গলে যাবে।

এই রকম বাদ-বিসম্বাদের মধ্যে এক কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক, রাস্তা থেকে চেঁচামেচি শুনে তিনিও এসেছেন, তিনি শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে তার মাথাটা একটু নিচের দিকে ঝুলিয়ে গলার মধ্যে একটা আঙুল দিলেন, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সিকিটা শিশুটির গলা

থেকে ঝনাৎ করে সশব্দে মেজের উপরে পড়লো।

সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। শিশুটির ঠাকুমার কান্না থামলো। সকলেই ধরে নিয়েছে ইনি একজন বড় ডাক্তার। ঠাকুমা ভিতরের ঘরে গিয়ে দেরাজ খুলে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়ে এলেন ডাক্তারবাবুর ভিজিট বাবদ।

কিন্তু ভদ্রলোককে 'ডাক্তারবাবু' সম্বোধন করে ভিজিট দিতেই তিনি আপত্তি করলেন, বললেন,'আমি ভিজিট নেবো কি করে, আমি তো আর ডাক্তার নই'; সবাই অবাক হয়ে গেলো, 'সে কি আপনি ডাক্তার নন!'ভদ্রলোক স্মিত হাস্যে জবাব দিলেন, 'না, আমি কস্মিনকালেও ডাক্তার নই। আমি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের লোক। গলা থেকে পয়সা বার করা তো আমার কাজ।'

সিকি গেলা সংক্রান্ত দ্বিতীয় গল্পটি ছোট এবং অন্যরকম আর ঘটনাকাল রাত্রিবেলা, রাত্রি সাড়ে বারোটা। ঘটনাবলী অবশ্য একই রকম, একটি অনিদ্রাবিলাসী শিশু খাটে বসে খেলতে খেলতে ঘুমন্ত মায়ের আঁচলের গিঁট খুলে একটা সিকি বার করে গিলে ফেলেছে।

সঙ্গে সঙ্গে যা করা উচিত, রাত্রির ঘুমটুকু আপাতত শিকেয় তুলে ছেলেকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রী একটা ট্যাক্সি ডেকে হাসপাতালে গেলেন।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ডে টেবিলের উপরে পা তুলে চেয়ারে কাত হয়ে ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছিলেন, তাঁকে ঘুম থেকে তুলে ঘটনার বিবরণ দিতেই তিনি মারমুখি হয়ে উঠলেন, 'আপনারা তো ভয়ঙ্কর ছিঁচকে মশায়, সামান্য একটা সিকি, পঁচিশটা পয়সার জন্যে, এই মাঝরাত্তিরে একটা দুধের শিশুর পেট কেটে পয়সাটা বার করবেন বলে শিশুটাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। ছিঃ ছিঃ, ছিঃ !'

টাকা পয়সার ব্যাপারটা অতিশয় গোলমেলে। দু-একটা আপ্তবাক্য উদ্ধার করি। সুরসিকা চঞ্চলা পাঠিকামহোদয়া, হাই তুলবেন না, পাতা উলটিয়ে চলে যাবেন না—কিছু পরেই আপনার জন্যে মজার গল্প আছে।

সেই কবে মহামতি ভলটেয়ার বলেছিলেন, টাকা পয়সার প্রশ্ন যখন আসে তখন সব মানুষেরই একই ধর্ম। অন্য এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি একটি চমকপ্রদ উক্তি করেছিলেন, ভগবান টাকা সম্বন্ধে কি ভাবেন তা যদি জানতে চাও তাহলে যাদের তিনি টাকা দিয়েছেন তাদের একবার দেখলেই ধরতে পারবে। এই সূত্রে এক ইংরেজ প্রবন্ধকারের উক্তিটিও সমানভাবেই স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন, যে ব্যক্তি মনে করে টাকা দিয়ে সব কিছু পাওয়া যায় সেই ব্যক্তি টাকার জন্যে সব কিছু করতেও পারে।

অর্থ বিষয়ে আরো দু-একটা স্মরণীয় কথা বলি। কবে কোথায় এগুলো পড়েছি অথবা শুনেছি দয়া করে কেউ সে বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করবেন না।

প্রথম কথা হলো, টাকার চেয়ে আরো অনেক দামি জিনিস এই পৃথিবীতে আছে। কিন্তু দুঃখের কথা সেগুলো সংগ্রহ করতে গেলে, সেগুলো পেতে গেলে টাকা লাগে।

টাকার মহিমাবিষয়ক দ্বিতীয় যে কথাটি মনে পড়ছে সেটি যথেষ্ট পরিমাণে খাঁটি। কথাটা হলো, অর্থের প্রাচুর্য হলো জগতের অর্ধেক পাপের জন্য দায়ী আর অর্থের অভাব হলো জগতের বাকি অর্ধেক পাপের জন্মদাতা।

এতই যদি গুরুগম্ভীর কথা বললাম বিদ্যাবুদ্ধির এই তরল নিবেদনে, তা হলে অর্থের সূত্রে কিঞ্চিৎ ধর্মাচরণও করে ফেলি। ব্রাহ্মণ-সন্তান, দিন যাচ্ছে শস্তা ইয়ার্কি দিয়ে, বহুদিন কোনো ধর্মকথা বলিনি, আজ একটু ধর্মকথায় যাই।

টাকাই যে সমস্ত নষ্টের গোড়া, Root of all evil, এ কথা নিউ টেস্টামেন্ট থেকে সরাসরি এসেছে। পবিত্র কোরান বলেছেন, যারা সোনা-রুপো (অর্থাৎ অর্থ বা সম্পদ) জমিয়ে রাখবে, ঈশ্বরের পথে ব্যয় করবে না, তাদের ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আর ঘরের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কামিনীকাঞ্চনের নামে রীতিমত ক্ষিপ্ত হয়ে যেতেন, বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অথবা সরাসরি বলেছেন, কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি থাকলে কিচ্ছু হবে না। কামিনীকাঞ্চন জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়। কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকার। তার জন্যে পরের দাসত্ব।

কিঞ্চিৎ ধর্মকথার পরে রসিকতায় ফিরছি।

মজার গল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এবার সেটা রক্ষা করছি। অতি বড় শত্রুও বলতে পারবে না, এ গল্প আমি টুকে লিখেছি, এ আমার স্বচক্ষে দেখা।

এটাও কিন্তু পয়সা গেলার গল্প।

এই কলকাতা শহরের এক ফৌজদারি আদালতের সিঁড়িতে ঘটনাটার জন্ম। কি একটা কাজে আমি দোতলায় উঠছিলাম আদ্যিকালের কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, উপর থেকে নেমে আসছিলেন ময়লা জামাকাপড় পরা হতভাগ্য, ভগ্নস্বাস্থ্য এক ভদ্রলোক, দেখেই বোঝা যায় যে জীবনের সব আদালতে তিনি পরাজিত।

ভদ্রলোক ছিলেন আমার চারধাপ সামনে, তিনি পকেট থেকে শতচ্ছিন্ন রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছতে গিয়ে তাঁর পকেট থেকে একটা সিকি না আধুলি পড়ে গেলো। পয়সাটা গড়িয়ে গিয়ে পড়লো সিঁড়ির ফাঁকে।

ভদ্রলোক সিঁড়ির উপর থেকে একটা পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে উবু হয়ে

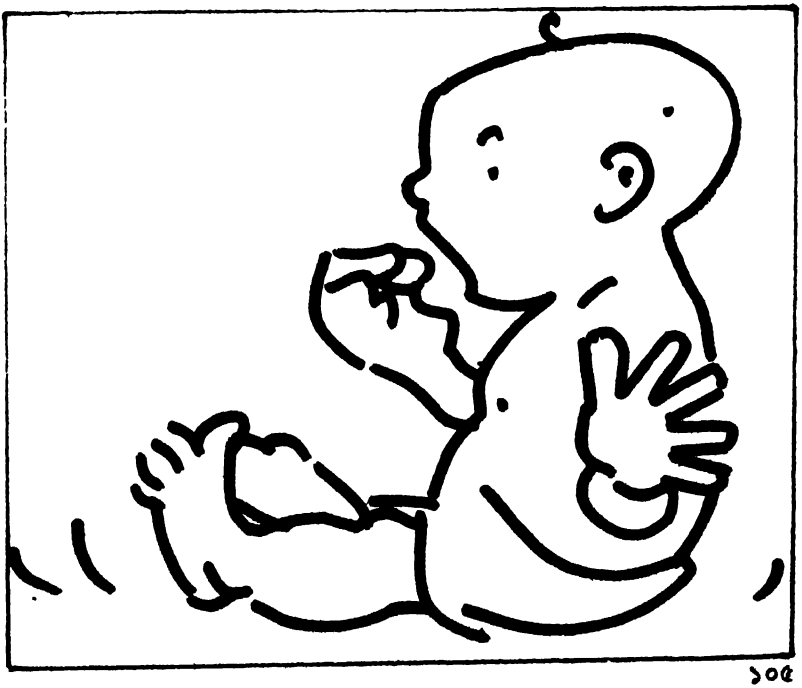

বসে পয়সাটা উদ্ধার করার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে আমিও সিঁড়ি ডিঙিয়ে চাতালে উঠে লক্ষ করতে লাগলাম, ভদ্রলোক পয়সাটা ফেরত পান কি না।

অত্যন্ত দুঃখের কথা তিনি যত পয়সাটা খুঁচিয়ে বার করতে গেলেন ততই সেটা তলিয়ে যেতে লাগলো। প্রায় পনেরো মিনিট ব্যর্থ পরিশ্রম করার পর ঘর্মাক্ত, ক্লান্ত দেহে তিনি উদ্যোগ পরিত্যাগ করলেন, করুণ মুখে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমাকে দেখে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কাতরোক্তি করলেন, 'দাদা, এই শালা কাঠের সিঁড়ি পর্যন্ত পয়সা খায়; মানুষকে, পেসকার-পেয়াদাকে আর কি দোষ দেবো!'

অবশেষে নিজের একটা আর্থিক ব্যাপার বলি। চৌরঙ্গীতে ফুটপাথের উপরে হাঁটছিলাম, পাশের একটা দোকানে চমৎকার সমস্ত চামড়ার বেল্ট ঝোলানো রয়েছে। আমার নিজের কোমরে এখন যে বেল্টটা রয়েছে সেটা অনন্তকাল আগে কেনা, রীতিমত জরাজীর্ণ অবস্থা সেটার। ভাবলাম কত আর দাম হবে একটা বেল্ট কিনে ফেলি।

এদিকে আমার একটা মুদ্রাদোষ আছে, কোনো অভাবিত অবস্থার সম্মুখীন হলে মুখ ফসকে 'সর্বনাশ' বলে ফেলি। আজও তাই হলো, সুন্দর একটা মকর-মুখ বেল্টের দাম জানতে চাওয়ায় যখন দোকানী বললো, 'পঞ্চাশ টাকা', আমি বললাম, 'সর্বনাশ'।

তাড়াতাড়ি অন্য একটা বেল্ট, কুকুরের বকলসের মত গিঁট-গিঁট করা, ভাবলাম ওটার দাম নিশ্চয় কম, বললাম, 'তাহলে এটা কত?' দোকানদার আমার দিকে তাকিয়ে কঠোরভাবে বললো, 'এটা ডবল সর্বনাশ।'

রেফ্রিজারেটর

আগে গালভরা পোশাকি নাম ছিলো রেফ্রিজারেটর। অনেকদিন হলো বস্তুটি আটপৌরে হয়ে গেছে, শহরে নগরে প্রায় ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, এখন তাকে ছোট করে ফ্রিজ বলা হয়। যেমন কিছুদিন হলো টেলিভিশন হয়েছে টি ভি।

টেলিভিসন নিয়ে এ যাত্রা কিছু লিখতে চাই না। বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে সে বড় গুরুপাক হবে। সে বিষয়ে যথা সময় যথাস্থানে লেখা যাবে।

ফ্রিজের কথার আরম্ভে একটা পুরনো প্রচলিত গল্পের উল্লেখ করে নিচ্ছি। সেই যে কোন বাড়ির বাচ্চা কাজের ছেলেটি বা মেয়েটি গরমের দিনে ঠাণ্ডার লোভে একটা ফ্রিজের মধ্যে ঢুকে শুতে যায় এবং তারপরে তার মধ্যে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ে, সে গল্পটার কিন্তু কোনো ভিত্তি নেই। যতদূর জানা গেছে এ রকম গল্প সম্পূর্ণ মনগড়া। তাছাড়া একটি আটদশ বছরের শিশু দরজা খুলে শুতে পারে ফ্রিজের মধ্যে এমন জায়গাই বা কোথায়? আসলে রেফ্রিজারেটর যুগ শুরু হওয়ার মুখে এই নতুন যন্ত্রটি সম্পর্কে অনীহা, উদ্বেগ ও কৌতূহল, সেই সঙ্গে গৃহস্থের নাগালের বাইরে এর উচ্চমূল্য সব মিলিয়ে এই ভয়াবহ গল্পটির জন্ম দিয়েছিলো।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, অনেকসময় অনেক কড়া ডিসিপ্লিনের ইস্কুল সম্পর্কেও গুজব

রটে। অমুক স্কুলে একজন ছেলে বা মেয়েকে স্কুল ছুটির আগের দিন ঘরে আটকিয়ে শাস্তি দেওয়া হয়। তারপর দিদিমণি বা মাস্টারমশায় ব্যাপারটা স্রেফ ভুলে গিয়ে বাড়ি চলে যান। পরে কয়েকদিন বাদে স্কুল খুললে দেখা যায় সেই ছাত্র বা ছাত্রীটি ক্লাসঘরে মরে পড়ে আছে।

এরকম গল্প বহু ক্ষেত্রেই গুজব মাত্র। ভালো করে খোঁজ নিলে শোনা যায়, এ ইস্কুল নয় সে ইস্কুল, বড়দিনের ছুটির আগে নয়, পুজোর ছুটির আগের ঘটনা।

ফ্রিজের গল্প বহুদিন বন্ধ হয়েছে কিন্তু স্কুলের গল্প আজো মাঝেমধ্যে শোনা যায়।

সে যা হোক আমরা ফ্রিজের আদি যুগের আসল ব্যাপারে যাচ্ছি।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যখন আমি বঙ্গপ্রদেশের বৃহত্তম জেলার একটি মফস্বলী স্কুলের নিচু ক্লাসের ছাত্র সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি জীবনে প্রথম ফ্রিজ দেখতে পাই। আমাদের সেই আটকোটি লোকের বিশাল জেলায় তখন সব সুদ্ধ পাঁচ-দশটি ফ্রিজ ছিলো কিনা সন্দেহ এবং তার অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলে, রাজা-জমিদারের বাড়িতে। গ্রামে এমনকি শহরেও বিদ্যুৎ সহজলভ্য ছিলো না। এগুলো ছিলো কেরোসিনের ফ্রিজ।

আমি প্রথম ফ্রিজ দেখি টাঙ্গাইল শহরের উপান্তে এক জমিদারের কাছারি বাড়িতে। আজ যখন দেখি একটি সামান্য শিশু পর্যন্ত এক মুহূর্তের মধ্যে সুইচ অন করে একটা রেফ্রিজারেটর চালিয়ে দিচ্ছে তখন আমার মনে পড়ে শান্তিকুঞ্জের সেই অতিকায় ফ্রিজটির কথা। সেই ফ্রিজটি কেরোসিনে চলতো। তখনকার মফস্বলে তরিতরকারি মাছ মাংস ফ্রিজে রাখার কোনো প্রশ্ন ছিলো না, টাটকা এবং প্রচুর পাওয়া যেতো এসব জিনিস, অবশ্য টাকা থাকলে।

ঐ ফ্রিজটি ব্যবহার করা হতো কালেভদ্রে। গ্রীষ্মকালে কোনো কোনো দিন কোনো

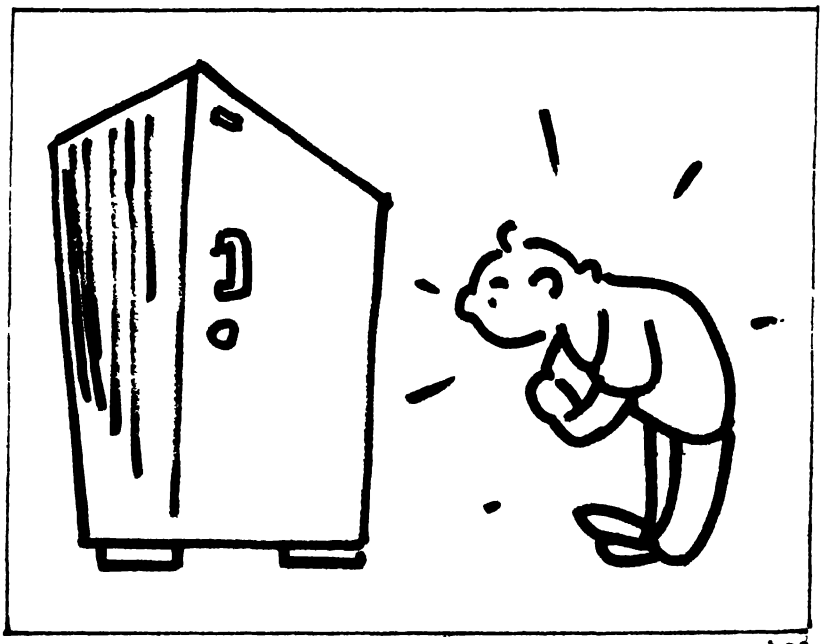

নিমন্ত্রণ বা অভ্যর্থনা বা পার্টি থাকলে বরফ এবং ঠাণ্ডা জলের জন্যে এবং ঠাণ্ডা দই, পুডিং বা কোনো শীতল পানীয়ের জন্যে ফ্রিজটি চালু করা হতো ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতে।

ফ্রিজটি আয়তনে ছিলো বিশাল। প্রায় ছোটোখাটো একটা সিঁড়িকোঠা ঘরের মত। বিরাট দরজা, খুলে নিয়ে যে কোনো বাড়ির গেটে লাগিয়ে দেওয়া যায়, সিংহদরোজা বানানোর মত দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ।

সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার ছিলো ফ্রিজটা চালু করা। অনেক কাল আগের কথা স্পষ্ট মনে নেই তবে এখনো আবছা আবছা ভাবে আমি স্মরণ করতে পারি যন্ত্রটিকে কার্যকরী করার একটা দৃশ্য। আমার আট-দশ বছর বয়েস হবে, টাঙ্গাইলের সেই জমিদার বাড়ির একটা দেয়াল ঘেঁষা বড় বকুল গাছ থেকে প্রায় শিউলি ফুলের মত বড় বড় বকুল ঝরে পড়তো বাইরের রাস্তায়; গ্রীষ্মের কোনো কোনো ঘুমভাঙা ভোরবেলায় সেই ফুল কুড়োতে যেতাম।

একদিন সেই প্রায়ান্ধকার প্রভাতে দেখি জমিদার বাড়ির মধ্যে ভীষণ হাঁকডাক হইচই চলছে। কৌতূহলবশত পাঁচিলের উপর উঠে বসে দেখলাম সামনের একটা বড় ঘরে বিশাল কালো একটা দৈত্যের সিন্দুকের মত জিনিসের সামনে জটলা। দুটি কেরোসিনের টিন হাতে নিয়ে চারজন লোক এসে একটা বড় পাইপের মধ্যে চোঙা দিয়ে সেই তেল ঢালছে, আর সমবেত নির্দেশ আসছে, 'আরো আরো, আর না, আর না, আরেকটু, আরেকটু।' কিছুক্ষণ পরে তৈলবাহী পাইপ উপচিয়ে তেল পড়ে ঘর ভেসে গেলো।

বাড়ির মধ্য থেকে ডেকে আনা হলো জনা কয়েক দাসীকে। তারা বড় বড় ন্যাতা দিয়ে মুছতে লাগলো পাথরের মেজে থেকে সেই উপচে পড়া কেরোসিন তেল।

সেদিন সন্ধ্যাতেই কিসের যেন ভোজ। এই পরিচারিকারা বাড়ির মধ্যে মাছ, তরকারি কুটছিলো। তারা খুব গজগজ করতে লাগলো তাদের স্বাভাবিক কাজেবাধা পড়ায় এবং পুরুষদের অকর্মণ্যতায়। জনৈকার কথাবার্তার মধ্যে বিষাক্তভাব সম্ভবত বেশি ছিলো, হঠাৎ দেখলাম যে দুজন কেরোসিন ঢেলেছিলো তাদের একজন শূন্য কেরোসিনের টিন তুলে সেই প্রগল্‌ভা পরিচারিকাকে মারতে উঠলো। হয়তো ভয় দেখাতে চেয়েছিলো।

কিন্তু এর পরেই ঘটলো অঘটন। পিচ্ছিল কেরোসিনসিক্ত পাথরের মেজেতে দাঁড়িয়ে অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি করতে গিয়ে ক্রুদ্ধ ভৃত্যটি তার ভারস'ম্য রক্ষা করতে পারলো না। সে সহসা পা পিছলে চিত হয়ে পড়ে গেলো অন্য এক পরিচারিকার ঘাড়ে এবং সেই সঙ্গে তার হাত থেকে কেরোসিনের ফাঁকা টিনটা ছিটকে গেলো। একটু দূরে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রেফ্রিজারেটার চালানোর নির্দেশ দিচ্ছিলেন প্রৌঢ় ম্যানেজার মহোদয়। তিনি উড়ন্ত কেরোসিনের টিনের আঘাতে ধরাশায়ী হলেন। বোধহয় টিনের কাটা অংশ তাঁর কপালে লেগে গিয়েছিলো, সেখানে কেটে গিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো।

সে এক প্রমাণ সাইজের লঙ্কাকাণ্ড। হইচই হুলস্থুল, তারপরে রাগারাগি কাঁদাকাটি—বাড়ির মধ্য থেকে বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী দৌড়ে ছুটে এলেন, প্রথমে তিনি কিছুতেই কি হয়েছে বুঝতে পারেন না। অবশেষে কিছুটা বুঝে, কিছুটা অনুমান করে তিনি সবাইকে থামালেন, মুখে বলতে লাগলেন, 'ছিঃ ছিঃ, তোমরা কেউ কোনো কর্মের নও। ভোজের বাড়ি, আজ সন্ধ্যাবেলা দুশো-আড়াইশো গণ্যমান্য লোক খাবে। এখনো পর্যন্ত মেশিনটা চালাতে পারলে না। তার উপরে দেখছি নিজেদের মধ্যে গোলমাল বাধিয়েছো।'

কথা বলতে বলতে তিনি ফ্রিজের ঘরের দরজার কাছে এগোতেই একজন পরিচারিকা, যে

পড়ে যায়নি, সে তাঁকে দেখে খুব তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে সরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই গড়িয়ে পড়লো মেজেতে।

অবস্থার গতিক দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দূরে সরে গেলেন। একটু পরে ঘরটর মোছা শেষ হলো। এবার কাজের লোকেরা বড় বড় দইয়ের হাঁড়ি,আরো নানা রকম পাত্র নিয়ে এলো। তার মধ্যে কয়েকটা চীনে মাটির বয়াম, কাচের কুঁজো এমনকি পিতলের কলসি পর্যন্ত ছিলো। সম্ভবত এগুলোর মধ্যে জল ভরা ছিল, বোতলে জলভরার কোনো ব্যাপারই নেই। সমস্তই এলাহি ব্যাপার।

এরপর এলো আসল মুহূর্ত। মেশিনটি চালু করার পালা। এ কাজ ম্যানেজার বা কর্মচারীদের দিয়ে হবে না, ডাক পড়লো বিলেত ফেরত ছোট সাহেবের। তিনিই পরবর্তী জমিদার। তিনি এসে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে লাগলেন, 'দরজা আরেকটু চেপে বন্ধ করো, একটুও যেন ফাঁক না থাকে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ফেটে যাবে, সব মারা পড়বে।' ফাটা এবং মারা পড়ার ভয়ে সবাই যতদূর সম্ভব পিছিয়ে গেলো, কেউ আর যন্ত্রের সুইচ চালু করতে সাহস পায় না।

শেষে ছোট সাহেব স্বয়ং দূর থেকে একটা কাঠের লাঠি দিয়ে সুইচটা নামিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘর ফাঁকা, যে যার মত প্রাণভয়ে দৌড় দিলো।

আমিও পাঁচিলের উপর থেকে এক লাফে নেমে বাড়ির দিকে ছুটলাম। নামার মুহূর্তে দেখতে পেয়েছিলাম ফ্রিজের ঘর থেকে ঘন ধোঁয়া বেরুচ্ছে এবং একটা গরুর হাম্বা হাম্বা ডাকেব মত শব্দ বেরোচ্ছে ফ্রিজের থেকে।

ঐদিন সন্ধ্যায় আমার বাবারও নিমন্ত্রণ ছিল, ঐ ভোজসভায়। 'কিছু খাওয়া গেলো না। জল, সরবত, দই, এমনকি মাছ, তরকারির মধ্যে পর্যন্ত কেরোসিনের গন্ধ।' চারটি মুড়ি দাও চিবিয়ে জল খেয়ে শুয়ে পড়ি', বাবা শুকনো মুখে অনেক রাতে ফিরে এসে মাকে বললেন।

ভবসিন্ধু

এবারে আর কোনো প্রাগৈতিহাসিক রেফ্রিজারেটরের লোমহর্ষক এবং অবিশ্বাস্য কাহিনী লিখে সরলমতি পাঠকপাঠিকাদের বিচলিত করবো না। এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় আমাদের বাড়ির অত্যাশ্চর্য এবং অব্যবহৃত একটি ফ্রিজ।

মহামতি সুকুমার রায়ের অনুসরণে আমাদের বাড়িতে কোনো কোনো প্রধান জিনিসের নামকরণ করা আছে। বেশি উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই ; আমাদের দেওয়াল ঘড়িটিকে আমরা বলি চলন্তিকা, টেলিফোনকে হিংটিং এবং এবারের আলোচ্য ফ্রিজটিকে ভবসিন্ধু নাম দেওয়া আছে।

ফ্রিজটির যখন একটা নাম আছে এবং তার যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে তাই আমরা তাকে বারবার ফ্রিজ না বলে ঐ ভবসিন্ধু নামেই অভিহিত করবো।

ভবসিন্ধুকে আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড সংগ্রহ করি সত্তর দশকের গোড়ার দিকে। কলকাতার একটি বিদেশী দূতাবাসের এক মৃত কর্মচারীর পুরনো জিনিসপত্র নিলামে বিক্রি করা হচ্ছিলো, এই বিজ্ঞাপন খবরের কাগজে দেখে আমরা ফ্রিজটা কিনতে যাই। খুব বেশি দাম দিতে হয়নি, মোটামুটি শোভন দেখতে, নগদ টাকা দিয়ে তখনই ওটা আমরা একটা টেম্পোতে তুলে বাড়ি নিয়ে আসি।

অবশ্য এর মধ্যে একটা ব্যাপার আমরা জানতাম না এবং আগে জানলে আমরা হয়তো ঐ নিলামে যেতামই না। ব্যাপারটা এই যে, আমরা যে বিদেশী ভদ্রলোকের জিনিসটি কিনেছিলাম, সেই ভদ্রলোকের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি, বছর খানেক আগে তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন।

সেই সময়ে এ ব্যাপারটা নিয়ে কাগজপত্রে অনেক হইচই চেঁচামেচি হয়েছিলো। ভদ্রলোক জাপানীদের মতো নিজেকে ছোরা মেরে বন্ধ ঘরে আত্মহত্যা করেছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে এটা খুনের ব্যাপার বলে পুলিস মনে করে।

আমরা ভবসিন্ধুকে কেনবার পরে কে যেন প্রথম আমাদের খেয়াল করিয়ে দেয় এই যন্ত্রটির মালিক ঐ আত্মহত্যাকারী দূতাবাস কর্মচারী। কেনবার পর থেকে আমাদের মনে একটা সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছিলো, ভবসিন্ধুর নানাবিধ আচরণে ; পরে এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করে আমরা বাড়ির সবাই রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

মিনতি বললো, 'ফ্রিজটা যখন নিয়ে আসা হয় তখন আমার মনে আছে এটার গায়ে ছিটেছিটে গাঢ় কালো রঙের কি যেন লেগে ছিলো। আমাদের বুক ধড়াস কর উঠলো, পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, কেউ কিছু বললাম না, সবাই মনের গভীরে বুঝতে পারলাম, ঐ কালো ছিটগুলো ছিলো শুকনো রক্তের ফোঁটা।

তাতাই তখন অতি ছোটো, তবে ভূতের ভয় পাবার বয়েস তার হয়েছে। সে বললো, সে দুদিন আগে এক দুপুরে ফ্রিজটাকে একা একা খুলে যেতে দেখেছে। দরজাটা নিঃশব্দে খুলে যাচ্ছে। এ দৃশ্য আমিও একদিন সন্ধ্যাবেলা দেখেছি। বিজন বললো, ফ্রিজটা যখন টেম্পোতে করে আনা হয়, তখন ওটার একটা কোণা লেগে ওর হাঁটুটা ছড়ে যায়, সেই ঘা এখনো শুকোচ্ছে না।

সেই সময় আমাদের বাড়িতে যে কুকুর ছিলো, সে এখনকারটির শ্রদ্ধেয় জননী। তার নাম ছিল চিলি, বিখ্যাত লেখক থেকে নগণ্য পথচারী, ডাক্তার, মেসোশ্বশুর, তাতাইয়ের

সহপাঠী—জানাশোনার মধ্যে অসংখ্য লোককে সে বিনা কারণে কামড়েছে। সে হঠাৎ উঠে গিয়ে শান্ত চিত্তে একটা জোর কামড় দিয়ে যেন কিছু নয় ব্যাপারটা এই রকম মুখ করে আবার ফিরে এসে নিজের চেয়ারে শুয়ে ঘুমাতো।

সেই দুর্দান্ত চিলি ভবসিন্ধুকে নিয়ে আসার পর প্রচণ্ড খুশি হয়। ভবসিন্ধুকে যেখানে রাখা হয় তার চারপাশে লেজ নেড়ে নেড়ে ঘোরে, মাঝে মাঝে ভবসিন্ধুর দরজা, দেয়াল এগুলো শুঁকে শুঁকে আলতো করে জিব দিয়ে চাটে। এ লক্ষণটাও আমাদের খুব সুবিধে মনে হলো না।

অনেক রকম আলাপ-আলোচনা করে এবং বহুলোকের পরামর্শ নিয়েও আমরা ভবসিন্ধু সম্পর্কে কোনো রকম মনস্থির করতে পারলাম না। জন্মের মধ্যে কর্ম, একটা ফ্রিজ কেনা হয়েছে অথচ সেটাকে বাসায় রাখতে কেমন যেন একটা খটকা, একটা আশঙ্কা দেখা দিচ্ছে মনে।

দু-একজন যুক্তিবাদী বন্ধু আমাদের বললেন, 'এ সবই আজব চিন্তা, তোমরা যদি না জানতে যে এর মালিক আত্মহত্যা করে মারা গেছে তা হলে তো কোনো চিন্তাই করতে না, এত গোলমাল হতো না।'

আমরা ব্যাপারটা মেনে নিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু এর মধ্যে একদিন গভীর রাতে একটা অনৈসর্গিক কারণে আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই জেগে উঠলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর থেকে লোডশেডিং ছিলো, আলোর সুইচ অফ না করেই ঘুমিয়ে ছিলাম। ফ্রিজটা থাকতো আমাদেব শোয়ার ঘরে, কখন বিদ্যুৎ এসেছে, ঘরের আলোটা জ্বলেছে এবং ফ্রিজটার ভেতর থেকে কেমন একটা করুণ সানাইয়ের মতো শব্দ বেরোচ্ছে। এই বাজনা ক্রমশ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগলো। মিনতি বিস্ফারিত চোখে বিছানার উপর উঠে বসলো, সানাই বাদন শুনে

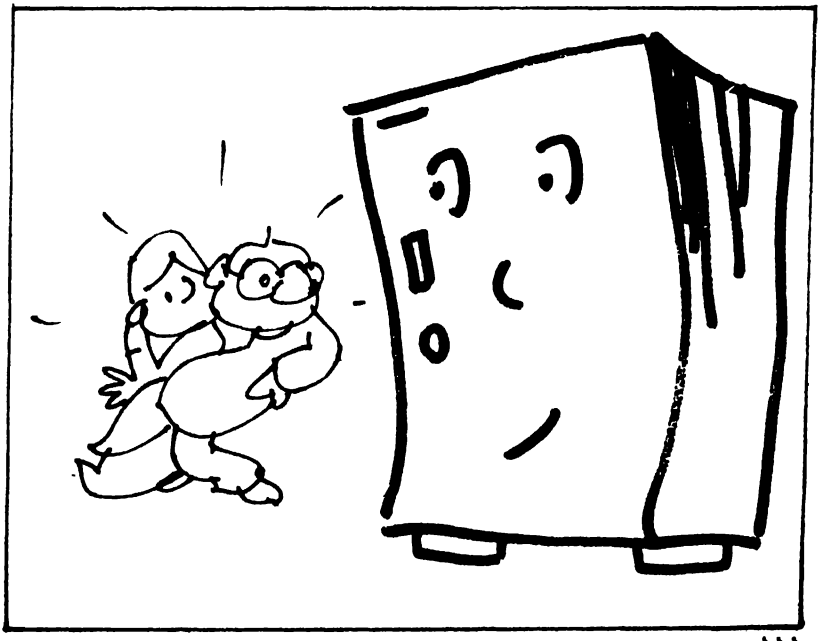

বিজন এবং তাতাই, সেই সঙ্গে চিলিও পাশের ঘর থেকে আমাদের ঘরে এলো।

আমরা কেউ কাউকে কিছু বলছি না, শুধু বিহ্বল আর হতভম্ব হয়ে ঐ বাজনা শুনতে লাগলাম। একটু পরে শুধু বাজনা নয়, নাচ শুরু হলো। ভবসিন্ধু রীতিমত দুলেদুলে নাচতে লাগলো, ভবসিন্ধুর উপরে দুটো লেবু আর একটা খালি জলের বোতল রাখা ছিলো। জলের বোতল সশব্দে মেজেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেলো, লেবু দুটো গড়িয়ে পড়ে খাটের নিচে চলে গেলো। লেবু দুটোকে অনুসরণ করে চিলিও খাটের নিচে প্রবেশ করলো। এই দৃশ্যের যবনিকা পতন হলো, মিনতির একটি হিমশীতল আর্তনাদে এবং সেই সঙ্গে তাতাইয়ের চিৎকারে।

অত রাতেও আশেপাশের বাড়ি থেকে লোকজন ছুটে এলো। পাশের বাড়িতে এক অবসরপ্রাপ্ত সৈন্য বাহিনীর মেজর ছিলেন। দুঃসাহসী বলে তাঁর নাম আছে, তিনি হাত দিয়ে ভবসিন্ধুকে নিবৃত্ত করতে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ধাক্কায় চিৎপাত হলেন।

চতুর্দিকে আশঙ্কা, উত্তেজনা ও হাহাকার। এরই মধ্যে একটি ঢ্যাঙা মতন ছেলে ভিড় ঠেলে এসে ফ্রিজের সুইচটা অফ করে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে ভবসিন্ধুর নৃত্যগীত সমাপ্ত হলো। ছেলেটি কি একটা বোঝাতে চাইলো, এটা অন্য ভোলটেজের মেসিন, তাই ভেতরের মোটরটা একদম ভড়কে গেছে।

আমাদের কিন্তু এসব বৈজ্ঞানিক বা বৈদ্যুতিক ব্যাখ্যা মনে ধরলো না। আস্তে আস্তে লোকজন চল গেলো। আমরা গভীর দুশ্চিন্তার মধ্যে শুতে গেলাম।

পরদিন সকালবেলা অফিসে গিয়ে প্রথম কাজ হলো গয়ায় আমাদের পরিচিত একপাণ্ডাকে ঐ সাহেবের নাম জানিয়ে একান্ন টাকা মানি অর্ডার করে পাঠানো, লোকটার নামে একটা পিণ্ড দেওয়ার জন্য। সাতদিন পরে পাণ্ডাঠাকুর জানালেন, এখন আর এত কম টাকায় পিণ্ডিদান হয় না, তাছাড়া বিধর্মীর পিণ্ডদানে খরচা বেশি, আরো দেড়শো টাকা পাঠাতে হবে।

তাই পাঠালাম। এর মধ্যে আমি আর বিজন একদিন ট্যাক্সি করে গিয়ে বাবুঘাট থেকে দু কলসি গঙ্গাজল নিয়ে এলাম। ভবসিন্ধুকে বাথরুমে শাওয়ারের নিচে ঠেলে নিয়ে গিয়ে ভালোভাবে স্নান করালাম, তারপরে দু বালতি গঙ্গাজল দিয়ে ভাল করে মুছলাম।

আধিভৌতিক এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে মিস্ত্রি ডেকে ভবসিন্ধুর চিকিৎসা করালাম। আগাগোড়া নতুন রঙ করালাম।

কিন্তু ভবসিন্ধু আর চালু হলো না। গয়ায় পিণ্ডিদানের জন্যেই হোক অথবা মেরামতির গলতির জন্যেই হোক সে একদম থেমে গেলো। নাচগান তো দূরের কথা, মেশিনটা আর চলে না। তবে সারানোর পরেপরেই একবার হয়েছিলো, হঠাৎ চলতে শুরু করেছিলো, কিন্তু তার কাজ ছিলো বিপরীত। সে খাবারপত্র ঠাণ্ডা না করে গরম করতে লাগলো। ব্যাপারটা ধরার পর মিনতি সেবার শীতে আমাদের মাছ, তরকারি, ভাত ভবসিন্ধুর মধ্যেই রাখতো, বেশ গরম থাকতো খাবারদাবার। অবশ্য এই তাপদান খুব বেশিদিন চলেনি। এরপর থেকে ভবসিন্ধু একদম থেমে গুম হয়ে আছে।

ভবসিন্ধুকে আমরা বিদায় করিনি। সে এখনো বাসায় আছে। তাতে শীতের লেপ-কম্বল তুলে রাখা হয়। আর প্রত্যেকবার বসন্তকালে ভবসিন্ধুর দরজাটা খুলে রাখি। পাশের বাড়িতে রূপসী নামে মেনিবেড়াল আছে, সে বছরে দিন পনেরোর জন্যে ব্যবহার করে প্রসূতিসদন হিসেবে ভবসিন্ধুর একটা তাক।

কৃষ্ণকান্ত এবং

আমাদের বেড়াল কৃষ্ণকান্তের বয়েস তখন বোধ হয় দেড় মাসের বেশি হবে না। একদিন বাসায় এক কেজি মাংসের কিমা আনা হয়েছে, রান্নার টেবিলের নিচে শালপাতার ঠোঙাটা, যাতে কিমা ভরা ছিলো, সেটা রাখা হয়েছিলো। হঠাৎ এক সময় দেখা গেলো কিমার ঠোঙাটা উধাও। নেই, কোথাও নেই।

একটু পরে খুঁজে পাওয়া গেলো বারান্দায়, শূন্য ঠোঙার শুকনো শালপাতাগুলি হাওয়ায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কিমার কোনো চিহ্ন নেই। এমন কি কোনো শালপাতার গায়ে এক ফোঁটা কিমার টুকরোও লেগে নেই। একেবারে ধোয়ামোছা, পরিষ্কার।

কিছু পরে কৃষ্ণকান্তকে খুঁজে পাওয়া গেলো। তার মুখে কেমন একটা চোর চোর ভাব, সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে রয়েছে। ধরে আনতে দেখা গেলো, পেটটা অসম্ভব মোটা আর ভারি, রীতিমত পাঁচ নম্বর ফুটবলের মত গোল, টনটনে।

কিন্তু সব সত্ত্বেও কেমন খটকা লাগলো, ঐটুকু দেড়মাসী, আধফুটী বেড়াল সে পুরো এক কিলো কিমা চেটেপুটে সাফ করে খেয়েছে, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন।

আমরা সঙ্গে সঙ্গে সমস্যার সমাধান করে ফেললাম। (আমাদের পরিবারের একটা বড় গুণ, পারিবারিক ঐতিহ্য হলো, ভালো ভাবে হোক, খারাপ ভাবে হোক যে কোনো সমস্যা দ্রুত সমাধান করা।) রাস্তা দিয়ে একটা পুরনো খবরের কাগজওয়ালা যাচ্ছিলো। তাকে ডেকে আনা হলো। তারপর তাকে এক টাকা বকশিশ দেওয়া হবে কথা দিয়ে তার দাঁড়িপাল্লা এবং ওজনের পাথর পাঁচ মিনিটের জন্যে ধার নেওয়া হলো। অবশ্য তাকে

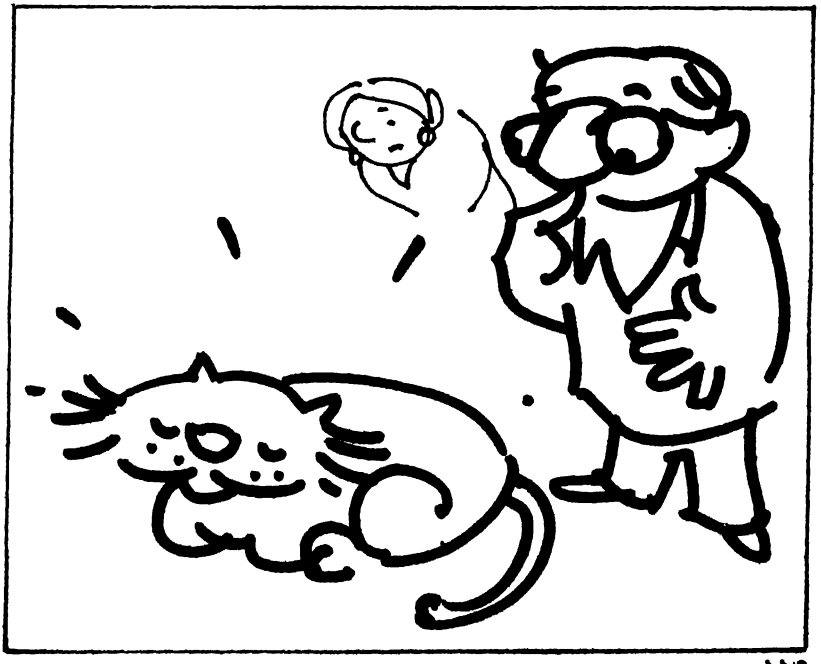

কারণটা বলা হলো না। যদি সে জানতে পারতো যে তার তুলাদণ্ডে একটি মার্জার শিশুকে ওজন করা হবে সে হয়তো এক টাকার লোভেও দাঁড়িপাল্লা দিতে রাজি না হতে পারতো।

এর পরের অধ্যায় আরো কঠিন। বুদ্ধিমতী প্রাণাধিকা পাঠিকা কখনো বেড়াল ওজন করার চেষ্টা করে দেখেছো ? সে এক অসাধ্য ব্যাপার। অনেক আঁচড় কামড়, কলা-কৌশল ইত্যাদির পরে কৃষ্ণকান্তকে দাঁড়ির এক পাল্লায় তুলে অন্য পাল্লায় পাথর দিয়ে বহু কষ্টে ওজন করা সম্ভব হয়েছিলো। সেই পাঁচ মিনিটের নির্দিষ্ট সীমা ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলো, ফলে পুরনো কাগজওয়ালা পয়সার ক্ষতি হচ্ছে বলে রাস্তায় ইতিমধ্যে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

সে অন্য গল্প। আসল ঘটনা আরো মারাত্মক। কৃষ্ণকান্তকে ওজন করে দেখা গেলো, তার ওজন হয়েছে ঠিক এক কিলোগ্রাম।

এক কিলোগ্রাম মাংস খাওয়ার পরে যদি বেড়ালের ওজন ঠিক এক কিলোগ্রামই হয় তা হলে মাংস খাওয়ার আগে ঐ বেড়ালের ওজন কত ছিলো ? স্বর্গীয় যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয়ও কস্মিনকালে তাঁর বিখ্যাত পাটিগণিত গ্রন্থে এমন কোনো জটিল প্রশ্নের সন্ধান দেননি। সেখানে বাঁদরের বাঁশ বেয়ে ওঠা থেকে দুধে জল মেশানো পর্যন্ত হাজার রকম পাটিগাণিতীয় (নাকি পাটিগণিতিক) উদাহরণ ছিলো, কিন্তু তার কোনোটাই এতটা রহস্যময় নয়।

শেষ পর্যন্ত আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের কৃষ্ণকান্ত নামক মার্জার শিশুটির ওজন শূন্য, অর্থাৎ সে অশরীরী, অর্থাৎ, সে একটি ভূত। কিন্তু ঘটনা হয়তো তা নয়, তার সম্ভবত তখন ওজন ছিলো পাঁচশো গ্রাম, আড়াইশো গ্রাম ওজনে মাংসওয়ালা কম দিয়েছিলো আর আড়াইশো গ্রাম ওজন কমে গিয়েছিলো পুরনো কাগজওয়ালার চোরাই দাঁড়িপাল্লার ভুলপ্রান্তে উপস্থাপনের জন্য।

কৃষ্ণকান্ত কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনো এমন করেনি। শুধু কৃষ্ণকান্ত কেন, আজকাল আমাদের বাড়ির সব কুকুর-বেড়ালই সব সময়ে রীতিমত আইনশৃঙ্খলা মেনে চলে। তাদের আচার-সহবৎ সকলের প্রশংসা পায়।

মনীষী সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, যিনি কখনো কখনো চমকপ্রদ গল্প-উপন্যাস লেখেন, কখনো কখনো আমাদের বাড়িতেও আসেন। তিনি একদিন আমাদের বাড়িতে বিস্ময় প্রকাশ করেন আশ্চর্য সব কাণ্ড দেখে যে টেবিলের উপর খোলা বাটিতে দুধ রয়েছে বেড়াল খেয়ে নিচ্ছে না, কুকুর বিছানা বা সোফায় উঠে শুচ্ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি—তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন এ ধরনের অরাজকতা দেখে।

সন্দীপনবাবু হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে যদি কখনো কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ভালো আছেন ?' তিনি কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে ঘাড় চুলকিয়ে বলেন, ' দাঁড়ান, ভেবে বলতে হবে।' সেই সন্দীপনবাবু পর্যন্ত যখন কুকুর-বিড়ালের এতাদৃশ বাধ্যবাধকতা দেখে তাঁর স্বভাব-অসুলভ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁকে আমরা সমস্ত ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাই।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, 'দ্যাখ-মার সিসটেম'। কৃষ্ণকান্তের ঐ ঘটনার পরে আমার বিনম্রা স্ত্রী মিনতি দেবী এই পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন। সম্প্রতি ঐ পদ্ধতিটিকে 'দ্যাখ-মার সিসটেম' (Dhakh-Maar System) এই ট্রেড নামে আমরা পেটেন্ট নেওয়ার কথা চিন্তা করছি।

এই সিসটেম বা পদ্ধতিটি আর কিছুই নয়, কোনো রকম বেয়াদপি বা বেচাল দেখলে, দ্যাখা মাত্র মার। কুকুর, বিড়াল এবং সেই সঙ্গে আমরা সকলে ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। মিনতি দেবীকে এই স্বপরিকল্পিত পদ্ধতিতে সিদ্ধহস্তা বলা উচিত। তিনি প্রতিবার রথের মেলায় একাধিক রুটি বেলবার এক্সট্রা বেলুন খরিদ করেন। আজকাল বেশি ব্যবহার করতে হয় না, একবার বেলুন তুলে দেখালেই অবলা জীবেরা সন্ত্রস্ত হয়ে যায়।

অনাবশ্যক এবং বিপজ্জনক বিষয়ে কথাচ্ছলে চলে গেছি, দ্রুত বিড়ালে প্রত্যাবর্তন করছি।

কুকুরের কথা বলার বিষয়ে একবার লিখেছিলাম। এবার বেড়ালের কথা বলার বিষয়ে কিছু লেখা যায়। একবার একটি চপলা তরুণী আমাকে জব্দ করেছিলো, সে বলেছিলো, তাদের বেড়াল নাকি নিজের নাম বলতে পারে। তাদের বাড়িতে আমি নিজের কানে বেড়ালের নাম বলা শুনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনি বেড়াল নাম বলতে পারে ঠিকই, কিন্তু তার নাম হলো 'মিঁয়াও'। নাম জিজ্ঞাসা করলেই সে 'মিঁয়াও' 'মিঁয়াও' বলে।

বেড়াল যে সব সময় 'মিঁয়াও' 'মিঁয়াও' বলে ঠিক তা নয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসে একটি বেড়াল পড়ন্ত দুপুরে এসে এক হতভাগিনী রাঁধুনী মহিলার কাছে স্পষ্ট 'মা' 'মা' করে ডেকে খাবার চাইতো। শীর্ষেন্দুর অমল বর্ণনায় বেড়ালের 'মা'-'মা' ডাকে ভরা সেই মধ্য দুপুর বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে গেছে।

এক মার্জার-অনুরক্ত বিদেশী লেখক কিন্তু বেড়ালের কথা বলার ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান। তিনি এ বিষয়ে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তাঁর বক্তব্য, 'বেড়ালদের আমি খুব ভালোভাবে জানি। তারা খুব চতুর এবং মিথ্যাবাদী। যদি কোনোদিন কোনো বেড়াল আপনাকে বলে এবং দাবি করে যে সে কথা বলতে পারে, তার কথা মোটেই বিশ্বাস করবেন না।'

আরেকটা গল্প জানি, একটা বুড়ো হুলো বেড়াল কালীঘাটে নিত্যানন্দ ভোজনালয়ে গিয়ে একদিন মাছ ভাতের অর্ডার দিয়েছিলো। যে রাঁধুনিবামুন পরিবেশন করছিলো তাকে সে বলে, 'আমার মাছের টুকরোটা যেন একটু কাঁচা থাকে, খুব বেশি সেদ্ধ বা ভাজা না হয়।' ভাত-মাছ খেয়ে দাম দিতে দিতে কৌতূহলী বেড়ালটি পরিবেশনকারীকে জিজ্ঞাসা করে, 'এই যে আমি এ রকম খেলাম, আপনার খুব অবাক লাগছে না!' বামুনঠাকুর বললেন, 'না, না তাতে কি? কত রকম খদ্দের আসে। অনেকেই বেশি ভাজা মাছ খেতে চায় না। আমি নিজেও খুব পছন্দ করি না।'

কথা বলতে পারুক আর না পারুক, বেড়ালের বুদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু আমাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। নিঃশব্দে রান্নাঘরে প্রবেশ করা, জালের আলমারির ছিটকিনি পা দিয়ে খুলে ফেলা, বিপদে দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যাওয়া পরে ফিরে এসে পায়ে মাথা ঘষে ক্ষমাপ্রার্থনা করা এগুলো বেড়ালের চরিত্রের অঙ্গ। আমি এমন একজনকে জানি, যিনি বেড়াল খুব পছন্দ করেন না, তিনি প্রতিদিন রাতে ঘুমোনোর পরে তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে একটি বেড়াল নিঃশব্দে এসে শয্যাগ্রহণ করতো এবং ব্রাহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে ওঠার আগে উঠে চলে যেতো। ভদ্রলোক টের পাননি, কোনোদিন জানতে পারেননি একটি রূপসী পূর্ণ যৌবনা মেনি বেড়াল প্রতি রাত্রে তাঁর শয্যাসঙ্গিনী।

বেড়ালের অভিজ্ঞতা বোধও যথেষ্ট বেশি। সে অনেক ব্যাপারেই নিজের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। কথায় আছে, যদি কোনো বেড়ালের গরম দুধ খেয়ে কখনো জিব পুড়ে যায়

তা হলে পরে সে ঠাণ্ডা দই খাওয়ার সময়েও ফুঁ দিয়ে খাবে। মার্ক টোয়েন সাহেবও অনুরূপ কথা লিখেছেন, 'একটি বেড়াল যে গরম স্টোভের ঢাকনায় একবার বসেছে, সে আর জন্মে কোনোদিন ঐ উত্তপ্ত স্থানে বসতে যাবে না। সবচেয়ে গোলমেলে ব্যাপার এই যে, সে কোনোদিন ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া স্টোভের ঢাকনার উপরেও বসতে যাবে না।'

পুনশ্চ কৃষ্ণকান্ত

আমাদের কৃষ্ণকান্ত ছিল দধিমুখী বেড়াল। তাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম হাজরার মোড়ের কাছে একটা ডাস্টবিনের পাশে। এক মলিন বৃষ্টিময় নিষ্প্রদীপ সন্ধ্যায় সে অসহায়ভাবে করুণ কণ্ঠে মিউমিউ করে কাঁদছিল। প্রায় পুরোপুরি কালো একটা বেড়ালছানা, অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছিল না। শুধু তার মুখটা ছিল সাদা, তাই লোডশেডিং-এর মধ্যেও তাকে আবছা ধরতে পেরেছিলাম।

সারা গায়ে নোংরা আর কাদা-মাখানো, জলে ভিজে নেতিয়ে গেছে। তাকে বাড়িতে এনে ধুয়ে-মুছে একটু দুধ দিলাম। তখনো সে মিউমিউ করে কাঁদছে, বোধহয় তার মায়ের জন্যে, যার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

রাস্তায় বেড়ালছানা কুড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে আসার মত সাহসী ব্যক্তি আমি নই। কিন্তু কালো বেড়ালের সাদা মুখ, আমার মা বলতেন দধিমুখী বেড়াল, খুব লক্ষ্মী। কিছুদিন আগেই মা মারা গেছেন, বৃষ্টি ও অন্ধকারভরা সন্ধ্যায় মানুষের মন একটু দুর্বল হয়, তাছাড়া সদ্য ভয় নেই, মিনতি দু'একদিনের জন্যে পিত্রালয়ে গেছেন। দধিমুখী বিড়ালশিশুটিকে বাড়িতে রেখে দিলাম, গায়ের রং-এর সঙ্গে মিলিয়ে নাম দিলাম কৃষ্ণকান্ত।

কালো বেড়াল সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা কুসংস্কার আছে, সে নাকি অমঙ্গলবহ। তাছাড়া ভৌতিক গল্পকাহিনীতে বারবার মোক্ষম মুহূর্তে কালো বেড়ালের অনিবার্য অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এক বিদেশী মার্জারপ্রেমিক কালো বেড়ালের অমঙ্গল-সূচকতা হাল্কা করে উড়িয়ে দিয়েছেন এই বলে যে কালো বেড়াল মঙ্গলজনক না অমঙ্গলজনক সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তুমি ইঁদুর না মানুষ তার ওপরে।

বিলিতি ঘুমপাড়ানি ছড়ায় এক পুষি বেড়াল লন্ডন গিয়েছিলো রানীকে দেখতে। সেখানে সে চেয়ারের নিচে একটা ছোট ইঁদুরকে ভয় দেখিয়েছিলো।

কৃষ্ণকান্তের সামান্য কিছু কথা আগের বার লিখেছি। তার সম্বন্ধে একটি ছড়াও লিখেছিলাম বহুকাল আগে,

কৃষ্ণকান্ত নামক কালো বেড়ালটি
তুষারকণা নামক সাদা কুকুরটিকে
থাবা মুড়ে বললো, 'দিদি, নমস্কার।'...

লন্ডন-বেড়ানি পুষি বেড়াল অথবা কৃষ্ণকান্ত, তুষারকণার মত সরল জীবজন্তুর কথা বাদ দিয়ে একটু জটিল মার্জারতত্ত্বে যাই।

প্রথমে একটি পাকিস্তানী গল্প। লাহোরে একটি সরকারি বিদ্যালয়ের মাঝারি ক্লাসে রহিম নামে এক বুদ্ধিমান ছেলে পড়ে। একদিন তাকে মাস্টার সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'একটি যুক্ত যৌগিক বাক্য রচনা করো।' রহিম দাঁড়িয়ে উঠে ভেবে চিন্তে বললো, 'আমাদের বাড়িতে একটা বেড়ালের কাল চারটে বাচ্চা হয়েছে এবং সেই চারটে বাচ্চাই জানে যে প্রেসিডেন্ট জিয়াই আমাদের সব বিপদ থেকে পরিত্রাণ করবেন।'

এই আশ্চর্য ব্যাকরণসিদ্ধ এবং রাজনীতি শুদ্ধ বাক্য রচনা শুনে মাস্টার সাহেব চমৎকৃত হলেন। ক্লাসে আর কোনো ছেলে এত গুছিয়ে কোনো বাক্য বানাতে পারেনি। তিনি রহিমকে খুব প্রশংসা করলেন।

দিন কয়েক বাদে হঠাৎ একদিন লাহোরের সামরিক প্রশাসক সেই বিদ্যালয় পরিদর্শনে এসেছেন এবং সব ক্লাসে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে রহিমদের ক্লাশেও পৌঁছেছেন। সেদিন সেই মাস্টার সাহেব যিনি যুক্ত যৌগিক বাক্যের প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি ক্লাসে ছিলেন।

সামরিক প্রশাসক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের পরে তিনি স্বাভাবিকভাবেই রহিমকে বললেন যুক্ত যৌগিক বাক্যের একটা উদাহরণ দিতে।

রহিম বিনীতভাবে উঠে দাঁড়ালো এবং তারপরে মাস্টার সাহেব এবং সামরিক প্রশাসক মহোদয়, উভয়কে দুটি সম্ভ্রান্ত আদাব জানিয়ে ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে বললো, 'আমাদের বাড়িতে একটা বেডালের কয়েকদিন হলো চারটে বাচ্চা হয়েছে এবং সেই চারটে বাচ্চাই জানে যে প্রেসিডেন্ট জিয়াই আমাদের সমস্ত সর্বনাশের কারণ।'

এই সাংঘাতিক বাক্যরচনা শুনে সামরিক প্রশাসক রাগে গুমগুম করতে করতে বাকি পরিদর্শন অসমাপ্ত রেখে সেই মুহূর্তে স্কুলগৃহ থেকে বেরিয়ে গেলেন। মাস্টার সাহেব ভীত,

হতচকিত ; তিনি কম্পিত কণ্ঠে রহিমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আগের দিনে বেড়ালছানাগুলো সম্পর্কে যা বলেছিলে আজ তার উল্টো বললে কেন ?' রহিম জবাব দিলো, 'সেদিন যে বেড়ালছানাগুলোর চোখ ফোটেনি স্যার। এখন ওদের চোখ ফুটেছে তাই অন্যরকম জানতে পেরেছে।'

এ নিতান্তই গল্প। প্রেসিডেন্ট সাহেবের প্রতি অসূয়াবশত কোনো দুষ্টচক্র এ গল্পের রচনা ও রটনা করেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি বেড়ালের গল্পের আদি অন্ত নেই।

ল্যারি ওয়াইল্ড নামে মার্কিনী ভদ্রলোক নানা রকম বিচিত্র বিষয়ে হাসির গল্পের সঙ্কলন করেছেন। বিদ্যাবুদ্ধির বহু গল্পের জন্যেই আমি তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর একটি বই হলো, 'দি অফিসিয়াল ক্যাট লাভারস্' জোক বুক'। এই বইটিতে প্রায় দুশো' গল্প আছে বেড়াল নিয়ে, সবই মজার গল্প।

এই সরস গ্রন্থের ভূমিকায় ল্যারিবাবু একটি কুকুরের কথা বলেছেন। কুকুরটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলো পড়াশুনা করতে। কয়েক বছর পরে যখন ফিরে এলো তখন অন্য কুকুরেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি শিখে এলে ?' কুকুরটি বিজ্ঞের মত গম্ভীর মুখ করে বললো, 'বিদেশী ভাষা শিখলাম।' সবাই তখন তাকে অনুরোধ করলো একটু বিদেশী ভাষায় কথা বলতে। কুকুরটি তখন বেড়ালের মত, 'মিউ নিউ' করে ডাকতে লাগলো।

কুকুর-বেড়াল মিলিত আর দুটি গল্প বলি। তার প্রথমটি ঐ বিদেশী ভাষা নিয়ে। একটি বেড়াল তার বাচ্চাদের নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো, এমন সময় একটা পাজি কুকুর তাদের তাড়া করে আসে। বেড়াল মা দেয়ালে পিঠ দিয়ে থাবা তুলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে কুকুরটির সঙ্গে লড়তে থাকে। কিন্তু কুকুরটি কিছুতেই ভয় পায় না, তখন হঠাৎ বেড়ালটি 'ঘেউ ঘেউ' করে গর্জন করে কুকুরের মতই তাড়া করে গেলো আক্রমণকারী কুকুরটিকে, পাজি কুকুরটি এই বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড দেখে ছুটে পালালো। বেড়ালটি তখন বাচ্চাদের দিকে ফিরে বললো, 'দেখলে তো, দুটো ভাষা শিক্ষা করার কত সুবিধে ?'

কুকুর-বেড়ালের তৃতীয় গল্পটি দাম্পত্য বিষয়ক। স্ত্রী স্বামীকে বলছেন, 'দ্যাখো, ঐ যে বারান্দায় পাশাপাশি কুকুর আর বেড়াল শুয়ে রয়েছে ; কোনো গোলমাল মারামারি না করে কেমন সুন্দর শান্তিতে সহাবস্থান করছে। ওরা জন্তু হয়ে যদি পারে, তাহলে মানুষ হয়ে আমরা কেন পারবো না ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি না করে পাশাপাশি থাকতে।' স্বামী মৃদু হাসি হেসে বললেন, 'বেড়াল আর কুকুরের ল্যাজ দুটো গিঁট দিয়ে বেঁধে দিয়ে একবার দ্যাখো কেমন শান্তিতে ওরা বসবাস করে।'

বেড়াল কথামালার এই অধ্যায় দুটি ইতস্তত গল্প দিয়ে শেষ করি।

এক ভদ্রমহিলার প্রিয় পোষা বেড়াল হঠাৎ একদিন ছাদের কার্নিশ থেকে পা হড়কিয়ে বাঁধানো উঠোনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে চোখ উল্টিয়ে জিব বার করে অজ্ঞান। ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি বাড়িতে কাউকে না পেয়ে তাঁর গাড়ির ড্রাইভারকে ডাকলেন একটা কিছু চেষ্টা বা ব্যবস্থা করার জন্যে। ড্রাইভারটি বুদ্ধিমান, সে দৌড়ে গিয়ে একটা পেট্রোলের ক্যান থেকে দু' চামচ পেট্রোল এনে বেড়ালটির মুখ হাঁ করিয়ে খাইয়ে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে অভাবিত কাণ্ড। বেড়ালটি হঠাৎ চোখ খুলে একটা তীব্র আর্তনাদ করে বিদ্যুৎ বেগে ছুটতে লাগলো, উঠোন দিয়ে বারান্দায়, তারপরে পাশের পাঁচিলের ওপরে উঠে দ্রুত বোঁ-বোঁ করে পাক খেতে লাগলো। অবশেষে মিনিট দুয়েক পরে সহসা একদম থেমে

গেলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দুম করে পাঁচিল থেকে ছিটকিয়ে পড়লো উঠোনে।

ভদ্রমহিলা এতক্ষণ বিস্ফারিত নয়নে দেখছিলেন তাঁর প্রিয় বেড়ালের এই কীর্তিকলাপ, এবার তিনি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটা কি হলো ?' ড্রাইভার বিনা দ্বিধায় বললো, 'পেট্রোল ফুরিয়ে গেলো। যাই আরেকটু পেট্রোল নিয়ে ভরে দিই।'

শেষ গল্পটি সংক্ষিপ্ত এবং আমাদের নিজেদের। এক ভদ্রমহিলা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এসে কৃষ্ণকান্তকে দেখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমাদের বেড়ালটা এত ছোটখাট, এত বেঁটে সাইজের কেন ?' আমরা কেউ কিছু বলার আগে বিজন জানিয়ে দিয়েছিলো, 'আমাদের বেড়াল কৃষ্ণকান্তকে আমরা এমনি সাধারণ দুধ দিই না, কনডেনস্‌ড্ মিল্ক দিই, তাই ওর আকারও কনডেনসড।'

অশেষ কৃষ্ণকান্ত

এবারের বেড়ালের গল্প কবিতা দিয়ে আরম্ভ করি।

গল্পটি প্রাচীন এবং বহুশ্রুত। একালের পাঠক-পাঠিকা নাও শুনে থাকতে পারেন সেই ভেবে লিখছি। গল্পটি আসলে ঠিক গল্পও নয় ; রহস্যচ্ছলে কবিতার উপরে কটাক্ষ মাত্র।

এক রাজা খুব কবিতার ভক্ত। দূর দূর অঞ্চল থেকে কবিরা এসে তাঁকে কবিতা শুনিয়ে পারিতোষিক নিয়ে যায়। সেদিনও একজন কবি এসেছেন তাঁর কবিতা নিয়ে রাজাকে শোনাতে। কিন্তু তাঁর কবিতাটি বড় ছোট, মাত্র এক পঙ্‌ক্তি এবং সেটা যে কেন কবিতা, তা কে বলবে !

পঙ্‌ক্তিটি হলো, 'মার্জারিঃ ক্ষীরম্ পিবতি' মানে 'বেড়াল দুধ খাচ্ছে'—এইটুকুই পুরো কবিতা।

রাজামশায় তাঁর কাব্যপ্রীতির দৌলতে ক্ষুদ্র-দীর্ঘ, খারাপ-ভালো, মধুর-নিষ্ঠুর, চমৎকার-অখাদ্য হাজার রকম কবিতা শুনেছেন। বলতে গেলে এ ব্যাপারে তিনি রীতিমত অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু তিনিও তাজ্জব বনে গেলেন, 'বেড়াল দুধ খাচ্ছে', এই সামান্য সাধারণ একটি বাক্যকে কবিতা বলে দাবি করায়।

সুতরাং কবিকে রাজা জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হলেন, 'এটা কেমন কবিতা হলো ? কবিতা যদি হয় এর চার চরণ কোথায় ?'কবি বললেন, 'মহামান্য নৃপতি, আমার ঐ মার্জারের চার চরণ রয়েছে।' রাজা একটু বিব্রত হলেন, বললেন, 'কিন্তু কাব্যের তো একটা রস থাকবে, আপনার এই সাদামাটা বাক্যে কাব্যরস কোথায় ?' কবি এবারও বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, 'মহামান্য নৃপতি, মার্জার যে ক্ষীর পান করছে, ঐ ক্ষীরের মধ্যেই রস রয়েছে।'

রাজা কাব্যরসিক হলে কি হবেন, তিনি লোক চরিয়ে খান, তিনি সহজে বোকা মানবেন কেন, শেষ মোক্ষম প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু এর অর্থ কি ?'

কবি এবার করজোড়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'মহামান্য নৃপতি, আমি গরীব কবি, অর্থ আমি কোথায় পাবো ? আমার কবিতায় অর্থ আসবে কি করে ? অর্থ সে যা দেবার সে আজ

আপনি দেবেন, সেই ভরসাতেই বহু দূর থেকে আপনার দরবারে এসেছি।'

সেই কাব্যরসিক রাজা এই চতুরতার জবাবে কি করেছিলেন, সত্যিই সেই কবিকে কোনো পারিতোষিক দিয়েছিলেন কি না, মার্জার-কাহিনীতে আমরা সে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় নাই-বা গেলাম। তবু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি, শুধু রুটি দিয়ে যেমন জীবন চলে না, তেমনি শুধু চাতুর্য বা বুদ্ধি দিয়ে কবিতা হয় না। আমি এক সদা চঞ্চল-বুদ্ধি কবিকে জানি, তার সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া, তার নাম বলা যাবে না, তার দিন চলে যাচ্ছে হাস্যকর রচনা লিখে।

কূটকথা থাক। বেড়ালতত্ত্বে ফিরে আসি। বেড়াল বিষয়ে দু-একটা জ্ঞানের কথা বলি।

তখন আমাদের বাড়িতে কৃষ্ণকান্ত তো রয়েইছে, তাছাড়া একটি স্বর্ণরোম, নীলনয়ন বেড়ালছানা নিয়ে এসেছি। তার নাম দিয়েছি স্বর্ণকান্ত। এই সময় একদিন কবি দীপক মজুমদার সস্ত্রীক আমাদের বাসায় এসেছেন। বেড়াল দুটো দেখে এবং তাদের নাম শুনে স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকময় ভঙ্গিতে দীপক বললেন, 'তাহলে তোমাদের দুটোই হুলো বেড়াল!'

দীপকের স্ত্রী শ্রীমতী ক্যারল মজুমদার, জীবজন্তু বিষয়ে আশ্চর্য জ্ঞান তাঁর। তিনি বললেন, কোনো সোনালি বেড়াল হুলো হতে পারে না। ঝলমলে, উজ্জ্বল সব বেড়ালই মেনি বেড়াল। সাদা-কালো পাঁশুটে হতে পারে হুলো বেড়াল কিন্তু ক্যারল এদেশে বা তাঁর পিতৃভূমি মার্কিনদেশে সচরাচর কোনো রঙিন পুরুষ বেড়াল দেখেননি। শ্রীমতী মজুমদার আমাদের আরো বলেছিলেন যে যদি প্রকৃতই স্বর্ণকান্ত হুলো হয়, তাহলে মার্কিনবাজারে এর মূল্য হবে কয়েক হাজার ডলার।

এই বক্তব্যের সত্যমিথ্যে জানি না। শুধু পাঠকদের অনুধাবনের জন্যে জানালাম। এই

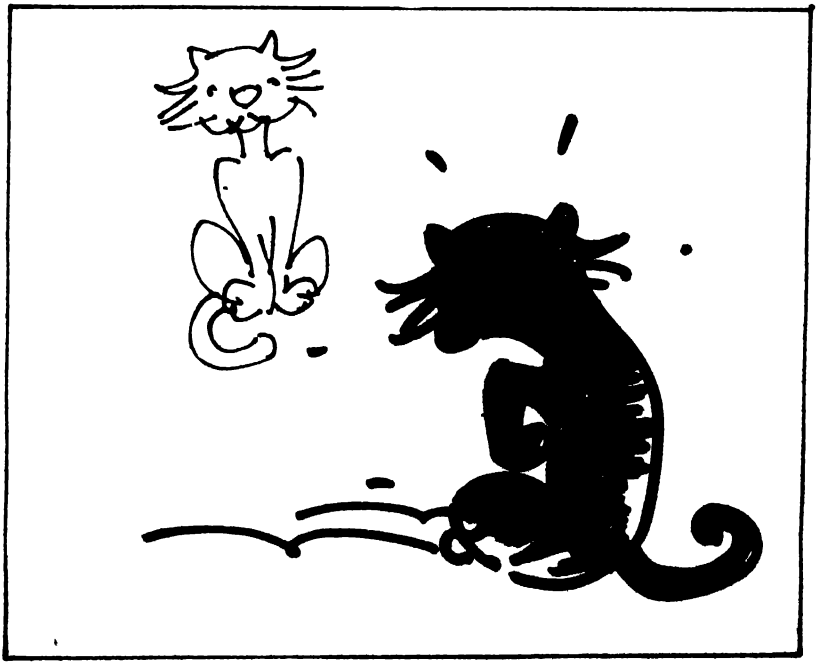

তত্ত্বে যদি ভুল থাকে কেউ আমাকে ধরলে আমি ক্ষমা চেয়ে নেবো। ক্যারলকে ধরতে পারব না, শ্রীমতী এখন আর এদেশে নেই

এতক্ষণে মনে হচ্ছে বেড়াল নিয়ে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। বেড়াল মা ষষ্ঠীর বাহন, বাঙালীর ঘরের পরম আদরের। ষষ্ঠীর পাঁচালি থেকে তার পালাকীর্তন শুরু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে দার্শনিক করেছেন, সুকুমার রায়ের হ য ব র ল কাহিনীর বেড়াল দর্শন-অদর্শনের সীমানা ছাড়িয়ে এক অপ্রাকৃত পৃথিবীর নাগরিক আর পরশুরাম তাঁর গল্পে সুকুমারীর অপদার্থ স্বামীকে বেড়ালে রূপান্তরিত করেছিলেন।

সুতরাং আমার অনধিকার চর্চা হয়ে যাচ্ছে। তবু দু-একটা গল্প এখনো বলা বাকি রয়ে গেছে।

শিবরাম চক্রবর্তীর গল্পে এক অত্যাচারী বেড়ালকে থলেয় ভরে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু বেড়ালের যা বুদ্ধি সোজাসুজি কোথাও ফেলে দিয়ে এলে সে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসবে। সুতরাং ফেলার সময় অলিগলি, আঁকাবাঁকা, চোরাঘুঁজি পথ দিয়ে থলেয় ভর্তি বেড়ালকে নিয়ে যাওয়া হলো যাতে সে কোনোক্রমেই আর পথ চিনে ফিরতে না পারে। এখানেই হলো গণ্ডগোল। যারা বেড়াল ফেলতে গিয়েছিলো তারা নিজেরাই পথ হারিয়ে ফেললো। তারপর ? তারপরে আর কি, তারা বাড়ি ফিরলো সেই ফেলে দেওয়া বেড়ালের পিছু পিছু অনুসরণ করে, কারণ বেড়ালের কোনো অসুবিধাই হয়নি বাড়ি খুঁজে ফিরতে, সেই এবার ফিরতি রাস্তার পথপ্রদর্শক।

অনুরূপ একটা ঘটনা দেখেছিলাম আমার কৈশোর বয়সে। আমাদের পাশের বাড়ির মাসীমা পাড়ার জমাদারকে আট আনা পয়সা দিয়েছিলেন একটা চোর বেড়ালকে দূরে ফেলে আসার জন্যে। ফেলে আসার পরদিন জমাদার মাসীমাকে এসে বললো, 'মাঈজী, বিল্লি ফেক্‌নেকে লিয়ে আপ যো আধুলি দিয়া, উ আধুলি অচল হ্যায়।' মাসীমা সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে মেরে উঠলেন, 'আধুলি অচল হ্যায় তো কি হ্যায় ? যে বিল্লি কাল ফেলে এসেছিলি, সেটাও তো আজ সকালেই ফিরে এসেছে।'

আরেকটা পাশের বাড়ির গল্প বলি। অনেকদিন আগে আমাদের পাশের বাড়ির একটা ছেলে পণ্ডিতিয়া সঙ্ঘের ফাংশনের আগে আমাকে ধরেছিলো, 'আঙ্কেল, এবার ফাংশনে আমাকে একটা চান্স দিতে হবে।' আমি জানতে চেয়েছিলাম, 'তুমি কি করতে পারবে ?' ছেলেটি বলেছিলো, 'আমি দু মিনিটের জন্যে বেড়াল সেজে সবাইকে তাজ্জব করে দেবো।' আমি বললাম, 'তার মানে তুমি স্টেজে উঠে কিছুক্ষণ বেড়ালের পোশাক পরে মিউ মিউ করে ডাকবে ?' ছেলেটি আমাকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বলেছিলো, 'না,আঙ্কেল, অত সোজা কাজ নয়, আমি সকলের চোখের সামনে একটা ইঁদুর চিবিয়ে খাবো।'

'বেড়াল ও কেক', এই সংক্রান্ত দুটি গল্প দিয়ে এই মার্জার কথামঞ্জরী শেষ করছি। দুটো গল্পই বিলিতি।

প্রথম গল্পটিতে এক মেমসাহেব তাঁর বিয়ের পরে বাপের বাড়ি থেকে প্রিয় পোষা বেড়ালটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। তাঁদের সদ্য বিয়ে হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মেমের বর কাজ থেকে ফিরে এসে দেখলেন, বৌয়ের চোখ মুখ ফোলা ফোলা, কেমন যেন বিষাদ করুণ ভাব।

সাহেব মেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো ? তোমার কি হয়েছে ?' মেম এবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন, তারপর অনেক দুঃখে চোখ মুছে বললেন, 'আমি সারাদিন কত

কষ্ট করে তোমার জন্যে একটা কেক বানালাম, হতভাগা বেড়ালটা সেটা খেয়ে নিয়েছে।' সব শুনে সাহেব সংযত হয়ে বললেন, 'তুমি মিছে দুঃখ করো না। তোমাকে আমি আরেকটা বেড়াল এনে দেবো।'

অর্থাৎ মেমের তৈরি কেক খেয়ে বেড়ালটি নির্ঘাত মারা পড়বে। অরন্ধন-পটীয়সী নববধূদের নিয়ে এরকম রসিকতা সাহেবদের দেশে এখনো চমৎকার চলছে।

বেড়াল ও কেকের দ্বিতীয় গল্পটি ছোট করে বলি। বাড়িতে অতিথি এসেছেন, তাঁকে ঘরে তৈরি কেক খেতে দেওয়া হয়েছে। তিনি নাসা কুঞ্চন করে খেতে খেতে বললেন, কেমন একটা কুটকুটে গন্ধ লাগছে। ইঁদুরে-টিঁদুরে খাওয়া নয়তো?' গৃহস্বামিনী সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'ইঁদুরে খাবে কি করে? সকালবেলা কেকটা বানিয়েছি, তারপর থেকে আজ সারাদিন, এই একটু আগে পর্যন্ত, আমার বেড়ালটা এই কেকটার ওপরে শুয়ে ছিলো।'

মাতাল-রহস্য

মদের মতই মদের গল্পও অতি উত্তেজক। কাণ্ডজ্ঞান-বিদ্যাবুদ্ধির পৃষ্ঠায় কত উল্টোপাল্টা বিষয়ে বলা হলো। কুকুর-বেড়াল, চোর-ডাকাত, ছাতা-মাথা কত না খুচরো গল্প শুনে, বানিয়ে বা অন্য বই থেকে টুকে লিখলাম, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে ইতিমধ্যে টের পেয়েছি মাতাল কথামালা যত জমজমাট হয়,কিছুই আর তেমন জমে না। মদ ও মাতালের আকর্ষণের কোনো তুলনা হয় না।

সম্প্রতি বেড়াল নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করা হয়ে গেছে বোধহয়। ফলে বিদ্যাবুদ্ধির শোচনীয় ঝুল অবস্থা দেখে আমার পরম বন্ধু রসরঞ্জন শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী আমাকে অনুগ্রহপূর্বক তিনটি সুরাসিক্ত রসিকতা প্রেরণ করেছেন, সেগুলি নিবেদন করছি। সুরা রসপিপাসু পাঠকপাঠিকাবৃন্দ সে সব মন দিয়ে পাঠ করুন যদি কিঞ্চিৎ গোলাপি আবেশ তাঁদের স্পর্শ করে, সমস্ত কৃতিত্ব হিমানীশবাবুর, আমার নয়।

স্কচ হুইস্কি দিয়ে আরম্ভ করা যাক। এটাই নাকি জগৎ-সংসারের সেরা মদ। এক বিখ্যাত ফৌজদারি উকিলের বাড়িতে এক মক্কেলের আবির্ভাব। উকিলবাবুর টেবিলের ঠিক সামনের চেয়ারে বসে মক্কেল মহোদয় বললেন, 'স্যার, এক কেস স্কচ হুইস্কি চুরি করার দায়ে ধরা পড়েছি। এই কেস কি আপনি নেবেন?' উকিলবাবু তাড়াতাড়ি গলা নামিয়ে মক্কেলের কানের খুব কাছে মুখটা নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'নেবো। নিশ্চয়ই নেবো। কেসটা কোথায়?'

দ্বিতীয় গল্পটি প্রথম গল্পটির মত তত সরল নয়। রেললাইনের পাশে এক উচ্চতল বাড়ি। সে বাড়ির উপরের এক ফ্ল্যাটে পার্টি হচ্ছে, পার্টি ভাঙলো গভীর রাতে, তখন লোডশেডিং, ঘুটঘুটে অন্ধকার, লিফটও বন্ধ। কয়েকজন মাতাল সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে অবশেষে রেললাইনের উপর এসে পৌঁছলো। সকলের অবস্থাই এমন যে চলতে

পারছে না আর, রেললাইনের ওপরে হামাগুড়ি দিতে লাগলো। এইভাবে মিনিট কুড়ি যাওয়ার পরে একজন বললো, 'আজব বাড়িতে পার্টিতে এসেছিলাম বটে। অর্ধেক সিঁড়ি সিমেন্টের আর বাকি সিঁড়ি কাঠের।' এই শুনে দ্বিতীয় এক মাতাল বললো, 'কি উঁচু সিঁড়িরে বাবা, নামছি তো নামছিই, এ যে আর শেষ হয় না।' এইবার তৃতীয় হামাগুড়িদাতা মাতাল বললো, 'তা, সিঁড়ি বেয়ে নামতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না। তবে রেলিং দুটো এতো নিচু করেছে, হামাগুড়ি দিয়ে না গেলে ধরতেই পারতুম না।'

তৃতীয় গল্পটিও হিমানীশ প্রেরিত। কিন্তু স্বীকার করা ভালো, গল্পটি হিমানীশের নয়, এর প্রবক্তা সাংবাদিক সন্তোষ বাগচী। শ্রীযুক্ত বাগচী কিছুকাল আগে অবসর নিয়েছেন, তাঁর রসবোধ অতি সম্ভ্রান্ত এবং অভিজাত।

সন্তোষবাবুর গল্পটিও অবশ্য মাতাল-সংক্রান্ত। এ কিন্তু ভালো জাতের মাতাল। বছরের শেষ দিনে নিউ ইয়ারস ইভে ভদ্রলোক প্রচুর মদ্যপানের পর প্রতিজ্ঞা করলেন নিজের মনে, 'না আর নয়, আজ থেকে মদ খাওয়া শেষ। এই বাজে নেশা ছেড়ে দিলাম।' সোজা বাড়ি গিয়ে যথারীতি বিছানায় শয়ান হলেন তিনি। পরের দিন দুপুরবেলা ঘুম ভাঙলো, তখন তাঁর আগের রাতের প্রতিজ্ঞা মনে পড়লো। খুশি হলেন নিজের ওপরে, নববর্ষে চমৎকার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে ; না, সত্যি সত্যি আর কখনো মদ্যপান নয়।

বিকেলের দিকে রাস্তায় বেরোলেন তিনি। তখন তিনি নিজের মনের জোর পরীক্ষা করার জন্যে পানশালার সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটা আরম্ভ করলেন। নববর্ষের অপরাহ্ন, পানশালার ভিতরে তখন মদিরার মোহজাল ; উচ্ছল, আনন্দিত জনতা। রাস্তা থেকে মৃদু সঙ্গীতের ইশারা পাওয়া যাচ্ছে। সব কিছু অবহেলা করে, সুরার হাতছানি উপেক্ষা করে

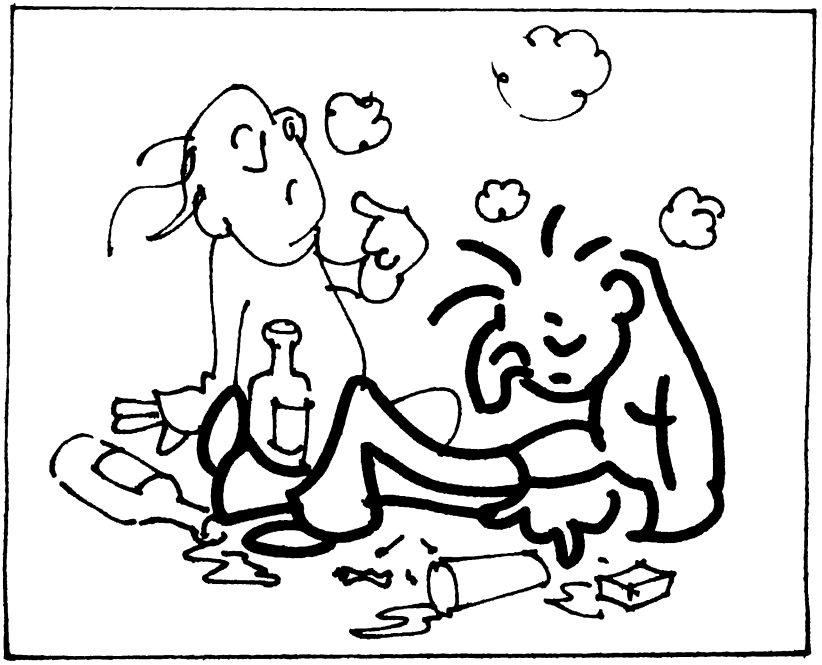

ভদ্রলোক নিতান্ত মনের জোরে এগিয়ে গেলেন পানশালা অতিক্রান্ত হয়ে।

কিছু দূরেই আরো একটা পানশালা। সেখানেও অনুরূপ প্রলোভন, প্রচুর নরনারী মদ্যপান করছে। কিন্তু তিনি বেপরোয়া, একে একে বহু পানশালা পার হয়ে গেলেন। তারপর আবার ফিরতি পথে, ঐ একই পানশালাগুলির সামনে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে, দীপ্ত চিত্তে চলে গেলেন।

এইভাবে বার দশেক পারাপার করার পরে ভদ্রলোক নিজের মনকে বললেন, ওরে মন, তোর তো খুব জোর। এই দোকান, এই মদ, এই সব মানুষজনেরা পান করছে, এততেও তোর কোনো বৈকল্য নেই, দুর্বলতা নেই, লোভ নেই। সাবাস! ওরে মন, সাবাস, সাবাস।'

ততক্ষণে নববর্ষের মধুর সন্ধ্যা নীল কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে সরাবসরণীতে উচ্ছলতায় অংশ নিতে এসেছে। রাজপথে খুশি জনতার ভিড, সুমধুর সুরলহরী ভেসে আসে পাশের পানশালাগুলি থেকে। সেই সঙ্গে হাসি. গান।

এবার ভদ্রলোক নিজের মনকে বললেন, 'ওরে মন, ওরে আমার মন, তুই যখন এতই সাহসের পরিচয় দিলি, আজ এই নতুন বছরের শুভ দিনে আয় তোকে একটু খুশি করি,' এই স্বগতোক্তি করে ভদ্রলোক তাঁর মনকে খুশি করার জন্যে সামনের পানশালার ভেতরে ঢুকে গেলেন।

শ্রীযুক্ত গোস্বামী এবং শ্রীযুক্ত বাগচী, দুই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে নিয়ে একটু বেশি মাতামাতি করা হয়ে গেলো, আমি নিজেও মানবজাতির ঐ বিপজ্জনক প্রশাখার (সৈয়দ মুজতবা আলী দ্রষ্টব্য)। ব্যাপারটা নাকি সুবিধার নয়, ব্রাহস্পর্শের দোষ কাটানোর জন্যে এইখানে এক কুলীন কায়স্থকে ছুঁয়ে যাচ্ছি।

প্রবীণ, রাশভারি, বিদগ্ধ পরশুরাম বা রাজশেখর বসুকে মদের গল্পে কখনই স্মরণ করতে সাহস হয়নি। এবার শুধু ফাঁড়া কাটাবার জন্যে করছি।

পঞ্চপ্রিয়া পাঞ্চালী গল্পে পরশুরাম মদের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণকে জড়িয়েছেন। দ্রৌপদীকে শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করছেন, 'দশ-বিশ কলসে উত্তম আসব পাঠিয়ে দেবো? পৈষ্ঠী মাধ্বী আর গৌড়ী মদিরা, মৈরেয় আর দ্রাক্ষেয় মদ্য, সবই দ্বারকায় প্রচুর পাওয়া যায়।...'

শুধু ঈশ্বর বা অবতার নন, যন্ত্র সম্পর্কেও মদের কথা বলেছেন পরশুরাম। একগুঁয়ে বার্থা গল্পে আছে, মোটর গাড়ির মালিক নিজের জন্যে এক বোতল ব্র্যান্ডি কিনলেন আর তিন বোতল সাজাহানপুর রম (Rum) কিনলেন তাঁর গাড়ির জন্যে, কারণ গাড়ি কেনার পরই তিনি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, গাড়িকে রম খাওয়ালে (অর্থাৎ পেট্রল ট্যাঙ্কে ঢাললে) তাব. বেশ ফুর্তি হয়। হর্স্‌পাওয়ার বেড়ে যায়।

মাতাল প্রসঙ্গে আরেকজন সিদ্ধপুরুষকে স্মরণ করি, তিনি অতুলনীয় ত্রৈলোক্যনাথ। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে এক গুলিখোর মাতালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, 'আর বিশ্বাস করিও না, এই পেশাদার মাতালদের। সাত ঘাটের জল এক করিয়া তুমি চারিটি পয়সা যোগাড় করিলে,আড্ডায় আসিয়া সেই চারি পয়সার ছিটে টানিলে, নেশাটি করিয়া তুমি আড্ডা হইতে বাহির হইলে, আর হয়ত কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল, তোমার নেশাটি চটিয়া গেলো। শীতকাল, মেঘ করিয়াছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে, ফুরফুর করিয়া বাতাস হইতেছে। সহজেই নেশাটি বজায় রাখা ভার, তার উপর কোথা হইতে একটা মাতাল আসিয়া তোমার গায়ে হড়হড় বমি করিয়া দিলো। তোমার নেশাটির দফা একেবারে রফা হইয়া গেলো।'

মহাজ্ঞানী, মহাজন যে পথে গমন করেছেন, সে পথে আরেকটু যাই, আর একটা ল্যাম্পপোস্ট ছুঁই।

কাহিনীটি পুরনো। জনৈক সুরাপায়ী বারে এসে মদের অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে একটা পোষা গিনিপিগ বার করে টেবিলের ওপর রাখতেন। তারপর কয়েক পাত্র পান করার পরে গিনিপিগটিকে তুলে ভালো করে দেখে আবার পকেটে পুরে চলে যেতেন। একদিন বেয়ারা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো, 'দাদা, গিনিপিগটাকে নিয়ে আসেন কেন ?'দাদা বললেন, 'দ্যাখো, আমি তো একটা গিনিপিগ আনি। যখন খেতে খেতে দেখি দুটো গিনিপিগ হয়েছে, তখন দুটোকে দু পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে যাই।'

কিছুদিন পরে গিনিপিগটা মারা গেছে। গিনিপিগ ছাড়া ভদ্রলোক এসেছেন। বেয়ারা বললো, 'দাদা, এবার কি করবেন ?' দাদা বললেন, 'সামনের টেবিলের লোকটা যেই ডবল হয়ে যাবে, আমি উঠে পড়বো।' এইভাবে ভালোই চলছিলো, কিন্তু হঠাৎ একদিন দাদা এক পেগ খেয়েই উঠে পড়লেন। বেয়ারাটি ছুটে এলো, 'দাদা, আজ এতো তাড়াতাড়ি ?' দাদা বললেন, 'তাই তো,আজ বড় তাড়াতাড়ি নেশা হয়ে গেলো। সামনের টেবিলের লোকটা এক পেগ খেতেই দেখি ডবল হয়ে গেছে।' বেয়ারা হেসে বললো, 'দাদা, ও দেখে ভয় পাবেন না। ও টেবিলে একজন নয়, দুজনই আছে। ওরা যমজ ভাই। তাই ডবল মনে হচ্ছে।'

দাদা এবার শান্ত হয়ে টেবিলে বসলেন এবং ডবল রিডবল না হওয়া পর্যন্ত, দুজন চারজন না হওয়া পর্যন্ত মনের সুখে সুরাপান করতে লাগলেন।

আরো রহস্য

মাতাল রহস্য নামে প্রকাশিত রোমাঞ্চকর এবং গোলমেলে আগের লেখাটায়, পরশুরাম ত্রৈলোক্যনাথ সবই বলা হয়েছে, কিন্তু আসল কথাটা মাতালের রহস্যটা যে কি সেটাই ভাল করে বলা হয়নি। এবার সর্বপ্রথমে আমি যথাসাধ্য সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবো।

যে কোনো গল্পকথায় মদ ও মাতালের প্রবেশ একটা নতুন মাত্রা বা গতি এনে দেয়। মাতালকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করানো যায় ; অসংলগ্ন অসম্বন্ধ অকল্পনীয় সব কিছুই মাতাল করতে পারে। শুধু তাই নয়, একজন সাধারণ মানুষ সরলভাবে যা করতে পারে, সেটাই একজন মদ্যপায়ী করলে যথেষ্ট হাসির কারণ হতে পারে।

এক মদ্যপ প্রতিদিন অফিসের শেষে প্রচুর মদ্য পান করে বাড়ি ফেরে। সারাদিন তার অফিসে কাটে কখন অফিস ছুটি হবে, ফাইল-টাইল গুটিয়ে সোজা পানশালায় গিয়ে পান করা আরম্ভ করবে এই প্রতীক্ষায়।

এর মধ্যে হয়েছে কি, অফিসে বহু ছুটি জমে গেছে, তাই মদ্যপ অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছে। কিন্তু সেটাই হয়েছে বিপদ। তার দিন আর কাটে না। এতদিন তবু অফিসের কাজকর্মে দিন কাবার হয়ে যেতো, কিন্তু এখন সারাদিন অস্থির লাগে। সূর্যোদয় থেকে

সূর্যাস্ত হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা কখন সন্ধ্যায় আবার পানশালায় যাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, আমাদের এই মদ্যপের দিনের বেলায় মদ্যপান পছন্দ নয়, অভ্যাসও নেই।

সে যা হোক, দিন কাটনোর জন্যে মদ্যপ একটি বুদ্ধি বার করলো। সে সকাল বেলা খাতা পেনসিল হাতে নিজের বাড়ির সামনে বারান্দায় বসে এবং রাস্তা দিয়ে যত লোকজন যায়, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলের হিসাব রাখে, তালিকা প্রস্তুত করে। অফিসেও তার কাজের ধরন মোটামুটি একই রকম—শুধু সেখানে মানুষজনের বদলে কোম্পানির মালপত্রের হিসাব রাখতে হয়, তালিকা বানাতে হয়। সুতরাং এখন আর তার দিন কাটাতে তেমন অসুবিধা হয় না।

এর মধ্যে একদিন সকালবেলা মদ্যপের স্ত্রী দেখলো আজ আর সে রাস্তার লোক গুনছে না। চিন্তিতা স্ত্রী মদ্যপকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ওগো, তোমার কাগজ পেন্সিল কোথায় ? আজ রাস্তার লোক গুনবে না।' মদ্যপ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, 'আজ গুনবো কেন ? আজ তো ছুটি, আজ যে রোববার।'

এই গল্পটি তেমন ভালো নয়। শুধু লিখলাম একটা জিনিস দেখানোর জন্যে। মূল গল্পটি এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির সময় কাটানোর সমস্যা নিয়ে, সে মাতাল-টাতাল কিছু নয়। কিন্তু মাতালের চরিত্র ও গল্পে একটা অন্য আমেজ এনে দিচ্ছে।

মদ জিনিসটা কি ? এ বিষয়ে পাতার পর পাতা লেখা যেতে পারে। মদের বিকল্প চাঙ্গায়নী সুধার বর্ণনা আছে পরশুরামের গল্পে। বিখ্যাত জটাধর বকশী এক বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় দিল্লির ক্যালকাটা টি ক্যাবিনে এক দশসেরা রুদ্র-কমণ্ডলু ভর্তি চাঙ্গায়নী সুধা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সে সুধার ব্যাখ্যা করছে, 'এতে আছে কুড়িটি গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম

ডাক্তারি আরক, কুড়ি রকম হোমিও গ্লোবিউল, কুড়ি দফা হেকিমি দাবাই, তা ছাড়া তান্ত্রিক স্বর্ণ ভাম হীরক ভাম বায়ু ভস্ম ব্যোম ভাম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকট্রিসিটি। আর আছে হিমালয়জাত কোমলতা যাকে আপনারা সিদ্ধি বলেন, আর কাশ্মীরী মকরন্দ এই সব মিশিয়ে বকযন্ত্রে চোলাই করে প্রস্তুত হয়েছে।'

জটাধর আরো বলেছে, 'এতে সিদ্ধি আছে বটে। কিন্তু তা মামুলি ভাঙ নয়, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে তার মাদকতা একেবারে নিউট্রালাইজ করা হয়েছে···খেলে শরীর চাঙ্গা হবে, ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে, চিত্তে পুলক আসবে, সব গ্লানি আর অশান্তি দূর হবে।'

এই বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে মদ খেলে যা হয়, জটাধর বকশীর চাঙ্গায়নী সুধা খেলেও ঠিক তাই হয়। তবে মদের প্রস্তুত প্রণালী চাঙ্গায়নী সুধার মত অত কঠিন কিংবা জটিল নয়।

মদের বর্ণনা থেকে মাতালের বর্ণনা বেশি চিত্তগ্রাহী। আমরা অতঃপর মাতালের দিকেই যাচ্ছি, মদের গুণাগুণ বিষয়ক একটি ছোট গল্প সেরে নিয়ে।

সদ্যযুবক কয়েকজনকে মদ খাওয়ার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্যে একটা বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিলো। বক্তা করিৎকর্মা ব্যক্তি। তিনি হাতে হাতে মদ্যপানের কুফল দেখানোর ব্যবস্থা করেন। দুটো ফাঁকা কাচের গেলাস নিয়ে তিনি সে দুটোর মধ্যে কয়েকটা করে পোকা ছেড়ে দেন। তারপর একটা গেলাসের মধ্যে পাশের বোতল থেকে পরিষ্কার সাদা জল নিয়ে ঢেলে দিলেন, গেলাসের পোকাগুলো সাবলীলভাবে সেই জলে সাঁতরাতে লাগলো, কিলবিল করতে লাগলো।

এবার একটা মদের বোতল থেকে মদ নিয়ে দ্বিতীয় গেলাসটায় বক্তা ধীরে ধীরে ঢাললেন। কড়া মদের বিষক্রিয়ায় গেলাসের মধ্যের পোকাগুলো কুঁকড়িয়ে, কুঁচকিয়ে অবশেষে মারা গেলো।

চোখের সামনে মদের এই বিষময় পরিণাম ছেলেদের দেখিয়ে উত্তেজিত বক্তা বললেন, 'তাহলে এটা দেখে এবার তোমরা মদের ব্যাপারটা বুঝতে পারলে ?' ছেলেদের দলের এক নেতা উঠে দাঁড়ালো, সে জানালো, 'হ্যাঁ পেরেছি'। বক্তা আবার প্রশ্ন করলেন, 'কি বুঝতে পারলে ?' ছেলেটি বললো, 'স্যার, যদি আমরা মদ খাই তবে আমাদের পেটে পোকা থাকবে না, সব মরে যাবে। আর মদ না খেলে পেটের মধ্যে পোকা কিলবিল করবে।'

মদ যাক, এবার মাতাল। কলকাতার কাছাকাছি এক বিদ্যায়তনে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক পড়ান, তাঁর কিঞ্চিৎ ম-কার দোষ আছে, তাঁকে আমরা মবাবু বলবো। সেই প্রতিষ্ঠানের যিনি অধ্যক্ষ তিনি কিন্তু ভীষণ প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, গোঁড়া প্রকৃতির। বিদ্যায়তনটিতে সম্প্রতি এক নবীনা শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই মবাবুর খুব মাখামাখি ভাব। অধ্যক্ষ একদিন মবাবুকে বললেন, 'দেখুন, মিস চক্রবর্তী নিতান্ত নাবালিকাপ্রায়।' মবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

কিন্তু আসলে ঠিক নেই। একদিন অধ্যক্ষ মহোদয় কি একটা কাজে চৌরঙ্গীর রাজপথ দিয়ে সন্ধ্যার একটু পরে হেঁটে আসছিলেন ; সহসা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন সামনের একটি পানশালা থেকে মবাবু বেরিয়ে আসছেন, তাঁর টলমল অবস্থা, সঙ্গে মিস চক্রবর্তী।

অধ্যক্ষ প্রমাদ গনলেন। তখন আর মুখোমুখি না হয়ে পরের দিন নিজের ঘরে মবাবুকে ডেকে বললেন, 'দেখুন, মিস চক্রবর্তী নিতান্ত অল্পবয়েসী, সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞাই মনে হয়। ওকে ভালোমন্দ বোঝানোর দায়িত্ব তো বলতে গেলে আমাদেরই। সঙ্গে সঙ্গে

মবাবু রাজি হয়ে গেলেন, 'ঠিক আছে, সেই কথাই রইলো। আপনি ওকে ভালোটা বোঝাবেন, আর আমি ওকে মন্দটা বোঝাবো। নমস্কার।'

আরেকবার কলকাতা ময়দানের প্রাচীন মনুমেন্ট অর্থাৎ শহীদ মিনারের চূড়ায় উঠেছিলাম। সেখানে চূড়ান্ত অলিন্দে দেখি জনাকয়েক সুরারসিক সরাসরি বোতল থেকে নির্জলা মদ টকঢক করে গলায় ঢেলে খাচ্ছে। তাদের চোখ ঈষৎ রক্তিম, আচরণ কিঞ্চিৎ আলুথালু।

কিছুক্ষণ পরে মদ খাওয়া শেষ করে শূন্য বোতলটি তাদের একজন মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে বললো, 'শূন্যে শূন্য'। দুঃখের বিষয় নিউটন সাহেবের প্রবর্তিত মাধ্যাকর্ষণের অন্যায় আইনে শূন্য বোতলটি শূন্যে না বিলীন হয়ে একটু পরেই নিচে ময়দানে পতিত হোলো এবং অচিরাৎ নিচ থেকে একটি ক্ষীণ আর্তনাদ ওপরে ভেসে এলো। একজন মাতালের সংবিৎ ফিরলো, তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঢুকেছে। সে রেলিংয়ের কাছে ছিলো, একটু পিছিয়ে এসে বললো, 'আচ্ছা ভাই, আমার কেমন ভয় করছে। মাঝে-মধ্যে কোনো মাতাল-টাতাল এই রেলিং টপকে নিচে পড়ে যায় না তো ?' যাকে জিজ্ঞেস করা হলো তার জ্ঞান টনটনে। সে বললো, 'মাঝে-মধ্যে নয়, পড়লে একবারই পড়ে। পড়বি ?' এরপরে আর দাঁড়ানো যায় না। দ্রুতপদে আমি নিচে নেমে এলাম।

পানশালার দরজা বন্ধ করার আগে শেষমেশ একটা করুণ কাহিনী বলি। এক ছন্নছাড়া ভদ্রলোক সন্ধ্যা থেকে বারের আলো না নেবা পর্যন্ত একা একা এক টেবিলে বসে গেলাসের পর গেলাস মদ খেতেন। তারপর শেষ মুহূর্তে টলতে টলতে উঠে অন্য কোথাও চলে যেতেন পানীয়ের সন্ধানে। বছরের পর বছর এই রকম। আমার সঙ্গে এক সময় তাঁর সামান্য মুখ-পরিচয় ছিলো। একদিন আধা মত্ত অবস্থায় তিনি আমাকে বলেছিলেন,'দ্যাখো, যাকে ভুলবার জন্যে এই চালচুলোহীন এলোমেলো জীবনযাপন করি, গেলাসের পর গেলাস মদ খেয়ে কেটে যায় সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা ; আসল কথাটা কি জানো, কবে তার নাম ভুলে গেছি, হাজার চেষ্টা করলেও এখন আর তার মুখটা মনে করতে পারি না।'

উপহার অথবা দান

উপহার ও দান, এ রকম দুটো জিনিসকে কেন যে জড়িয়ে ফেললাম ! উপহার এবং দানের মধ্যে পার্থক্য করা আমার মতো মূর্খের পক্ষে সহজ নয়।

দান হলো অর্পণ-প্রদান। তার মধ্যে একটা ত্যাগ, একটা দয়ার ব্যাপার আছে। একটু মহত্ত্বও জড়িত। লোকে কন্যাদান করে, অর্থদান করে, শ্রমদান করে, রক্তদান করে। রক্তদানের সঙ্গে আবার স্বেচ্ছা কথাটা জড়িয়ে ; দূরদর্শনে, খবরের কাগজে প্রায়ই সচিত্র সংবাদ—অমুক চিত্রতারকা, অমুক লেখক, অমুক জজসাহেব স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন। দান তো স্বেচ্ছায়ই করতে হবে, স্বেচ্ছায় রক্তদান না হলে তো বুঝতে হবে সাংঘাতিক কথা। গায়ের জোরে অনিচ্ছুক ব্যক্তির রক্তগ্রহণ কি সম্ভব ? সেটা তো মারামারি, খুনোখুনির পর্যায়ে পড়ে।

রক্তদানের রহস্য থাক। দান আমাদের দেশে রীতিমত বিশিষ্ট ও বড় ব্যাপার। দানের বৈশিষ্ট্য বোঝাতে সংস্কৃত ভাষায় কর্মকারকের সঙ্গে প্রভেদ করে সম্প্রদান কারকের ব্যবহার রয়েছে। ধোপাকে কাপড় কাচতে দেওয়া আর দরিদ্রকে কাপড় উপহার দেওয়া, এই দুই রকম দেওয়ার ব্যাকরণগত প্রয়োগ আলাদা, এ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোনো ভাষাতে নেই।

উপহারও দান। কিন্তু ব্যাপারটা আনুষ্ঠানিক,তার মধ্যে সামাজিকতা আছে। একজনকে এক তোড়া ফুল উপহার দেয়া যায় কিন্তু বোধহয় দান করা যায় না। অথচ ব্রাহ্মণকে দুটি

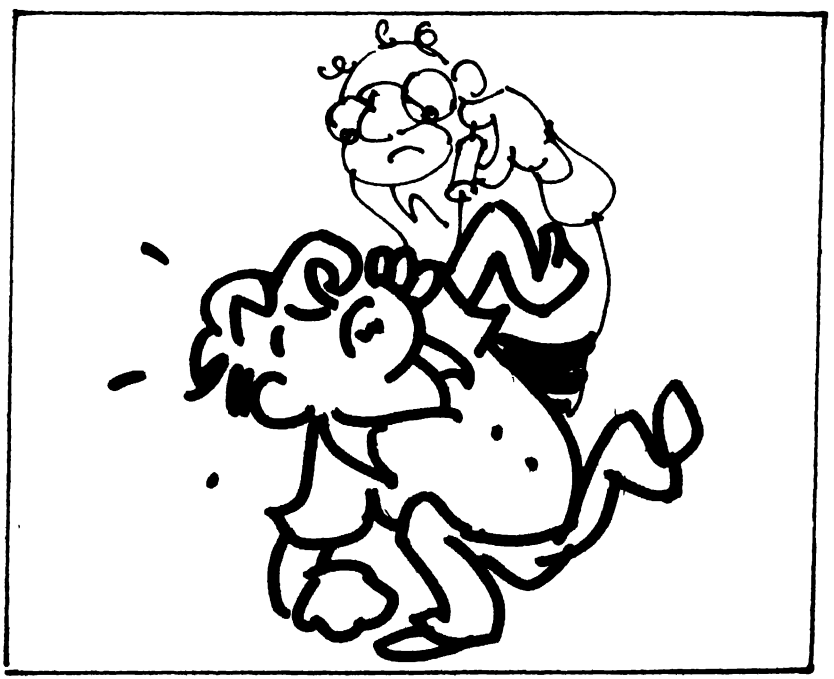

ফল দান করা যায়।

উপহারের আভিধানিক অর্থ উপঢৌকন, নজরানা বা ভেট। কিন্তু এই সবগুলির অর্থই কিঞ্চিৎ একপেশে, যেন উপহারের সঙ্গে স্বার্থ বা প্রয়োজন জড়িত রয়েছে। তা তো সর্বদা ঠিক নয়, বরং উপহারের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে প্রীতি শব্দটি, উপহার বলতে প্রীতি উপহার। এবং স্নেহ উপহার। কবির ভাষায়,

যত দিতে সাধ করি মনে মনে খুঁজে পেতে সে তো পাব না।

উপহার প্রসঙ্গে যদি আলোচনা করতেই হয় তা হলে রাজরাজন্য, নবাব-বাদশাদের বাদ দিয়ে করা উচিত হবে না। আমরা মোগল সম্রাটকে ধরছি।

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র শাহজাদা মুহম্মদ আজিমউদ্দীন বাংলাদেশের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখনো ঔরঙ্গজেবের আমল চলছে, সেটা ১৬৯৭ সাল। ১৬৯৮ সালে সাহেবরা সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা পত্তনের জন্যে আজিমউদ্দীনের কাছে নানাবিধ তদ্বির করছিলেন এবং বহু উপহার দিচ্ছিলেন। সুবাদারের পক্ষে তাঁর পুত্র এবং আমলারা উপহার গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি, চেয়েছিলেন এমন সব জিনিস যাকে ইংরেজরা অদ্ভুত এবং চমকপ্রদ মনে করে। হীরা, মুক্তা, জহরৎ, অলঙ্কার বা অর্থ নয়, সুবাদারজাদা উপহার হিসেবে সাহেবদের কাছে চেয়েছিলেন, একটা ঘড়ি, পিস্তল, ব্র্যান্ডি, পাখির খাঁচা এবং স্ট্রং ওয়াটার (Strong water),

(এই স্ট্রংওয়াটার জিনিসটাযে কি আমার পক্ষে বলা কঠিন। তখন কিসোডাওয়াটার ছিলো, নাকি এটা অন্য কোনো জাতের উত্তেজক পানীয় ?)

সে যাহোক, এই দ্রব্যগুলির মূল্য এত কম ছিলো, যে ইংরেজ তদ্বিরকারকেরা অবাক হয়ে গিয়েছিলো মোগল সম্রাটের বংশধর এই সব তুচ্ছ ও যৎসামান্য জিনিস চাওয়ায়। বলা বাহুল্য ইংরেজরা অবিলম্বে এ সব জিনিস সরবরাহ করেছিলো।

এ যুগে যে ফরেন গুডস্ অর্থাৎ বিদেশী সুরভি, বিদেশী মদ, বিদেশী সামগ্রীব প্রতি এত ঝোঁক, এত লোভ, এ কোনো সাময়িক বা হাল আমলের ব্যাপার নয়। যা কিছু সুদূর বা অভিনব, যা নিজের দেশে অপ্রাপ্য তার অর্থমূল্য যাই হোক না কেন, তার জন্যে আগ্রহ এবং কৌতূহল থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এবং সেই মানসিকতা থেকেই মোগল মহিমার উত্তরাধিকারীরও প্রার্থিত ছিলো ঘড়ি ও ব্র্যাণ্ডি। আর স্ট্রং ওয়াটার।

উপঢৌকন বা ভেট থেকে প্রীতি উপহারে আসি। বরাবরের মতই এবারকার প্রীতিউপহারের গল্পটি আমাব নয়, গল্পটি এর আগে যাঁরা শুনেছেন তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য গল্পটিতে বিদ্যাবুদ্ধির পোশাক পরিয়ে দিচ্ছি।

এক বহুতল অট্টালিকার উঁচুর দিকের একটা ফ্ল্যাটে এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটার সময় অফিস যান। ঐ বাড়িরই একটি বাচ্চা মেয়ে ঐ সময়েই দৈনিক স্কুলে যায়।

ফলে প্রায় প্রতিদিনই সকাল সাড়ে আটটার সময় ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়েটির দেখা হয়ে যায়। ভদ্রলোকের কয়েকতলা নিচু থেকে মেয়েটি একই লিফটে ওঠে। লিফটে নামার পথে ঐ দিনের পর দিন দেখা হওয়ায় মেয়েটির সঙ্গে ভদ্রলোকের বেশ পরিচয় এবং বন্ধুত্বও হয়।

এই বন্ধুত্বের সুবাদেই মেয়েটি নামার পথে একদিন ভদ্রলোককে একটা নিমন্ত্রণ করে বসলো, 'আজ সন্ধ্যেবেলা আসবেন আমাদের বাড়িতে।'

এতটুকু মেয়ের নিমন্ত্রণে কোনো অচেনা গৃহে যাওয়া যায় কি না এই চিন্তায় ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ বিব্রত হলেন। ভাবলেন ব্যাপারটা এড়াতে হবে, তবু স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন ? কি ব্যাপার তোমাদের বাড়িতে ?'

ততক্ষণে লিফট নিচে পৌঁছে গেছে। লিফট থেকে বেরোতে বেরোতে মেয়েটি উচ্ছলভাবে বললো, 'বারে ! আজ যে আমার জন্মদিন। সন্ধ্যেবেলা আসবেন কিন্তু।'

ঐ লিফটের দোরগোড়াতে দাঁড়িয়েই ভদ্রলোক আচ্ছা বললেন, 'কিন্তু তোমাদের ফ্ল্যাট তো আমি চিনি না। যাবো কি করে ?' মেয়েটি জানালো, সেটা তো সোজা। সাত তলায়, সিকস্থ ফ্লোর, একানব্বুই নম্বর ফ্ল্যাট। দেখবেন দরজায় ইংরেজিতে 'ভট্টাচার্য' লেখা আছে। দরজার ডানদিকেই কলিংবেল আছে। আপনার কনুই দিয়ে অল্প টিপলেই হবে।'

এবার ভদ্রলোক রীতিমত বিস্মিত হলেন, প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কলিংবেল হাত দিয়ে না টিপে কনুই দিয়ে টিপতে যাবো কেন ?'

স্কুলের দিকে দ্রুতপদে এগোতে এগোতে মেয়েটি পিছন ফিরে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললো, 'বাঃ ! আমার জন্মদিনে আপনি উপহার নিয়ে আসবেন না ? আপনার দুটো হাত যে জোড়া থাকবে, তাই বললুম কনুই দিয়ে কলিংবেলটা টিপবেন।'

এই মধুর উপাখ্যানটির পরে একটি দুঃখের গল্প বলি। এটি উপহারজনিত নয়, দানের ব্যাপার।

এক রবিবার সকালে তিনজন কৃপণ ভদ্রলোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন। এমন সময় প্রবল বেগে বৃষ্টি এলো। কাছাকাছি আশ্রয় নেওয়ার কোনো জায়গা নেই। তবে অদূরে একটি গির্জা রয়েছে। রবিবার সকালে গির্জায় প্রবেশ খুব নিরাপদ নয়। তবু বৃষ্টির তোড়ে অনুপায় হয়ে ঐ তিন কৃপণ ভদ্রলোক গির্জার মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন।

তখন গির্জার ভিতরে প্রার্থনা চলছে। ভদ্রলোকেরা গুটি গুটি গিয়ে অন্যান্য প্রার্থনাকারীদের পাশে আসন গ্রহণ করলেন।

কিছুক্ষণ পরেই অতিবিপজ্জনক মুহূর্ত। একটি থালা হাতে করে গির্জার একজন যাজক একে একে উপাসকদের কাছে যেতে লাগলো গির্জার জন্যে কিছু অর্থদানের জন্য।

সিকি-আধুলি-টাকা যে যার সামর্থ্য মত সবাই দিতে লাগলো। থালার টুংটুং শব্দ যখন এই তিনজন কৃপণের নিকটবর্তী হলো, তাঁদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করতে লাগলো, 'সর্বনাশ ! কিছু দিতে হবে না কি ?'

তিনজনেই দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন, বাইরে বৃষ্টি থেমে গেছে। এখন ইচ্ছা করলেই বেরিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু সে বড় দৃষ্টিকটু হবে। এখন উপায় ?

কৃপণের বুদ্ধির অভাব কখনো হয় না। দানের থালাটা তাদের কাছে আসার আগেই তিনজনের একজন অজ্ঞান হয়ে টলে পড়ে গেলেন। আর সেই অজ্ঞান ব্যক্তিকে ধরাধরি করে বাকি দুজন গির্জার বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

দানের আরেকটা উদাহরণ দিয়ে এ যাত্রা শেষ করি। এ উদাহরণটি খুবই পুরনো কিন্তু চমৎকার। আজকাল আর শোনা যায় না। তাই লিখছি।

স্বর্গীয় নরেশবাবু তাঁর যা কিছু ছিলো সবই মৃত্যুর পরে অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছেন। তা মহানুভব নরেশবাবুর কি ছিলো, কি তিনি অনাথ আশ্রমে দিয়ে গেছেন ?

বিশেষ কিছু নয়, চার পুত্র আর তিন কন্যা।

মনে মনে

অসুখটা মনের কিন্তু বলা হয় মাথার। মাথা খারাপ। মন খারাপের সঙ্গে মাথা খারাপের কোনো সম্পর্ক নেই।

মনের অল্পবিস্তর অসুখ প্রায় সকলেরই আছে, সেই অর্থ অনুসারে সমস্ত মানুষই মনের রোগী। কিন্তু এই রোগ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই মাথা খারাপের পর্যায়ে পড়বে।

একটি প্রচলিত সংজ্ঞায় বলা আছে যে, যে-সব ঘটনা ঘটেনি সেই অলীক ও কাল্পনিক ব্যাপার নিয়ে যে উদ্বিগ্ন সে মানসিক রোগী, আর যে ঘটনা কস্মিনকালেও ঘটবে না সেই ভবিষ্যৎ নিয়ে যারা দুশ্চিন্তিত তারা সাধারণ মানুষ।

ব্যাপারটা জটিল করে ফেললাম। দু-একটা সহজ গল্পে যাই।

প্রত্যেক পাগলের পাগলামির যেমন একটা প্যাটার্ন আছে, এলোমেলোয়ানার মধ্যে ছন্দ আছে তেমনই সব পাগলেরই তার পাগলামি সম্পর্কে নিজস্ব লজিক আছে।

বর্ধমান শহরের এক ভদ্রলোকের মাথায় হঠাৎ গণ্ডারের ভয় ঢুকলো। রাত্রিবেলায় বিছানায় শুলেই তাঁর আশঙ্কা হয়, এই বুঝি গণ্ডার তাড়া করে এলো। তিনি অবশ্য নিজ বুদ্ধিবলে গণ্ডার তাড়ানোর একটা বুদ্ধি বার করেছেন।

খেলার মাঠের রেফারিদের যেমন হুইসিল থাকে, তেমনি একটা হুইসিল বাঁশি তিনি কিনে নিয়েছেন। তাঁর নিজের মনগড়া ধারণা যে গণ্ডাররা হুইসিল শুনলে খুব ভয় পায়। সুতরাং গণ্ডাররা যাতে কাছে ঘেঁষতে না পারে, ভয়ে ভয়ে দূরে থাকে তাই তিনি পাঁচ-দশ

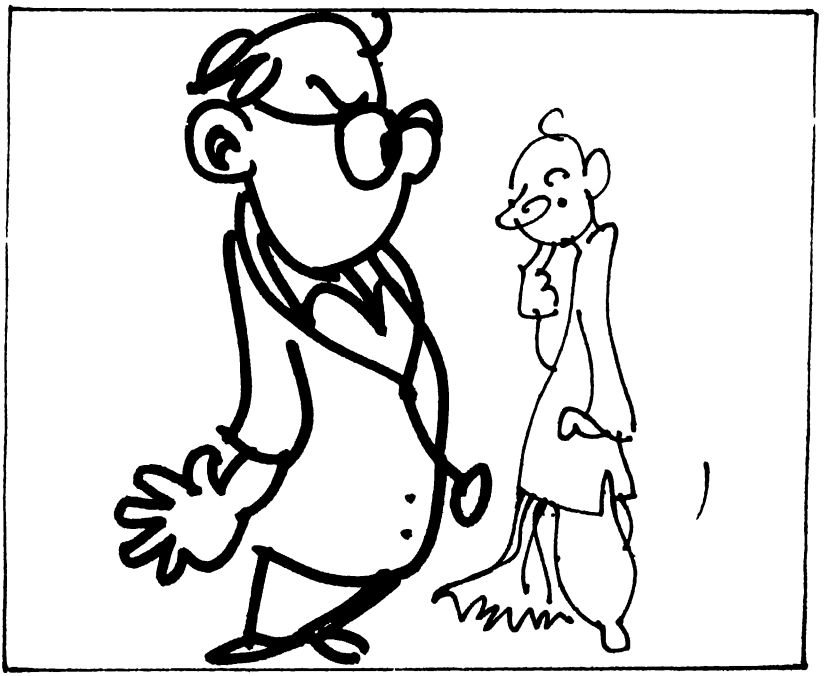

মিনিট পরপর তীব্র নিনাদে ঐ হুইসিল বাঁশিটা বাজান।

ভদ্রলোক নিজের গলায় একটা ফিতের সঙ্গে তাঁর হুইসিলটা ঝুলিয়ে নিয়েছেন। যখনই বুঝতে পারেন যে গণ্ডার বা গণ্ডাররা সমীপবর্তী হচ্ছে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাঁশিটায় ফুঁ দিতে থাকেন।

দিনের বেলায় বাঁশি বাজানোর দবকার পড়ে না। কারণ সূর্যাস্তের আগে গণ্ডাররা বেরোয় না এবং সূর্যোদয়ের আগেই তারা জঙ্গলে ফিরে যায়।

মুশকিল হয়েছে বাড়ির লোকদের। হুইসিলের তীব্র আওয়াজে শুধু বাড়ির লোক কেন, পাড়ার লোকেরা পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কারো চোখের পাতা জুড়বার উপায় নেই। ঘণ্টায় আট-দশবার হুইসিলের শব্দে চমকে চমকে জেগে থাকতে হয়।

অগত্যা ভদ্রলোককে নিয়ে যাওয়া হলো মাথার ডাক্তারের কাছে। মাথার ডাক্তার তাঁকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন. 'আপনি এত হুইসিল বাজান কেন ?' ভদ্রলোক বললেন, 'হুইসিল শুনে গণ্ডারেরা ভয় পায়। তাদের দূরে রাখার জন্যে। তা না হলে তো গণ্ডারেরা আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।'

এটুকু তথ্য ডাক্তারবাবুর জানা ছিলো। এবার তিনি বললেন, 'কিন্তু গণ্ডার কোথায় ?' বর্ধমান শহরের কয়েক শো মাইলের মধ্যে কোনো গণ্ডার নেই।' এইবার রোগী একগাল হাসলেন, 'তা হলেই দেখুন। হুইসিলের ভয়ে গণ্ডারগুলো কতদূর পালিয়েছে। কাছে আসতেই সাহস পাচ্ছে না।'

এর পরের কাহিনীটিও আতঙ্কমূলক এবং জন্তুবিষয়ক। মনকুমারবাবুরও রাতে ঘুম হয় না হায়েনার ভয়ে। সন্ধ্যা হতে না হতে কোথা থেকে দলে দলে হায়েনা এসে তাঁর শোবার ঘরের খাটের নিচে ঢোকে। সারারাত ধরে তাদের হিমশীতল নিষ্ঠুর হাসি, কখনো কখনো খাটের নিচে থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা হায়েনার চোখে ক্ষুধার্ত তীব্র দৃষ্টি মনকুমারবাবুকে সারারাত সন্ত্রস্ত করে রাখে।

এ অবস্থায় মাসের পর মাস না ঘুমিয়ে একজন লোক বেঁচে থাকতে পারে না। বাধ্য হয়ে মনকুমারবাবু এক বিখ্যাত মানসিক ডাক্তারবাবুর কাছে গেলেন। ডাক্তারবাবু সব শুনে মনের রোগের চিকিৎসার জন্যে যা কিছু করণীয়—আনন্দদায়ী ট্যাবলেট থেকে ইলেকট্রিক শক হাজার রকম করলেন। কিন্তু সাধারণত এসব ক্ষেত্রে যা হয়, কিছুতেই অসুখের সুরাহা হলো না।

অবশেষে ডাক্তারবাবু হাল ছেড়ে দিলেন। মনকুমারবাবুও হতাশ হয়ে ফিরে গেলেন।

মাস ছয়েক বাদে কোথায় এক বিয়েবাড়িতে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে মনকুমারের দেখা। ডাক্তারবাবু মনকুমারকে দেখে রীতিমত বিস্মিত হলেন, আগের মত ভীত, সন্ত্রস্ত, ভেঙ্গে-পড়া ভাব নেই। রীতিমত উৎফুল্ল, আনন্দিত, স্বাভাবিক চেহারা।

ডাক্তারবাবু মনকুমারকে জিজ্ঞাসা করতে উত্তর পেলেন 'খুব ভালো আছি।' প্রশ্ন করা উচিত হবে কিনা একটু দ্বিধা করে তবে উৎসুক হয়ে জানতে চাইলেন, 'সেই হায়েনার ব্যাপারটা ?' মনকুমারবাবু বললেন, 'হায়েনা-ফায়েনা নেই। জামাইবাবু সব ঠিক করে দিয়েছেন।'

ডাক্তারবাবু স্বভাবতই জানতে চাইলেন, 'আপনার জামাইবাবুও কি ডাক্তার নাকি ?' মনকুমারবাবু বললেন, 'না, না। ডাক্তার হবেন কেন, তিনি কনট্রাক্টর। ফার্নিচারের কাঠের ব্যবসা করেন।' এতক্ষণে ডাক্তারবাবু বেশ বিস্মিত হলেন, 'তা হলে কোনো টোটকা কিছু

জানেন নাকি ?' 'টোটকা আর কি ! একটা কাঠের মিস্ত্রি ডাকিয়ে জামাইবাবু আমার শোয়ার খাটের পায়া চারটে ছোট করে দিয়েছেন। একেবারে ছয় ইঞ্চি মাত্র উঁচু এখন আমার খাটটা। হায়েনারা জব্দ, আর হায়েনারা আমার খাটের নিচে সেঁধোতে পারে না। তাই আর আসেই না।'

ডাক্তারবাবু যখন এনেই ফেলেছি, ডাক্তারবাবুর আরেকটু গল্প বলে নিই।

এক খ্যাতনামা মনের রোগের ডাক্তার তাঁর এক রোগীকে পরীক্ষা করতে করতে পরামর্শ দিলেন, 'সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিন।' রোগী বললেন, 'সে কি, ডাক্তারবাবু ? সেদিন আপনি বললেন, সিগারেটে আপত্তি নেই। আর তা ছাড়া সিগারেট ছেড়ে দিলে আমার টেনশন বাড়বে। আর সিগারেট তো আমার খুব একটা ক্ষতি করে না।'

ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আপনার করছে না কিন্তু আমার ক্ষতি করছে। আপনি সিগারেটের আগুন দিয়ে আমার সোফাটা পুড়িয়ে ফেলেছেন।'

ক্লেপটোম্যানিয়া (kleptomania) বলে একটা মনের রোগ আছে। এটা হলো চুরির বাতিক—এটা অভাবের চুরি বা পেশাদারি চুরি নয় ; স্বভাবের চুরি, মনের বাতিকে চুরি। সচ্ছল কোটিপতি পর্যন্ত এই রোগে ভোগে। দেশপ্রিয় পার্কে এক অভিজাত ভদ্রমহিলা বাচ্চাদের প্যারাম্বুলেটর থেকে খেলনা চুরি করতেন। এক খ্যাতনাম্নী ভারতীয় চিত্রাভিনেত্রী এইতো অল্পকাল আগে সিঙ্গাপুরের এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে একজোড়া শস্তার মোজা চুরি করে নিজের হাতব্যাগে ঢুকিয়ে দোকান থেকে বেরোতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং খবরের কাগজে সংবাদ হন। এক টেস্ট খেলোয়াড়ও বিলেতে তাই করেছিলেন।

এক সময় আমি যখন সিগারেট খেতাম, আমার নিজের ছিলো দেশলাইয়ের ঝোঁক। আড্ডার মাঝখানে যখন দেশলাই ফুরিয়ে যেতো, সুনীল-শরৎ-শক্তি আমার প্রাণের বন্ধু আমাকেই চেপে ধরতো,' তারাপদ দেশলাই বার করো।'

সত্যি বেরোতো আমার পকেট থেকে দেশলাই। কোনোটা আর্ধেক, কোনোটা সিকি ; ঘোড়ামার্কা, টেক্কামার্কা, নীলপাখি, সোনালি মাছ ছাপ দেয়া একটা দুটো নয়, বেশ কয়েকটা দেশালাই।

এর জন্যে আমি কোনো দিন অপমান বা অপদস্থ বোধ করিনি। আমার চিরকাল আসক্তি তুচ্ছ জিনিসে। দেশলাই থেকে রসিকতা, এর বেশি এ জীবনে সজ্ঞানে আর কিছু চুরি করিনি।

নিজের কথা বলতে গিয়ে আসল গল্পটা মারা পড়তে বসেছে।

এক মানসিক ডাক্তারবাবু ক্লেপটোম্যানিয়াকের চিকিৎসা করলেন, সেই রোগী তো ভালো হয়ে গেলেন। ডাক্তারবাবু নিজেই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। আগে তিনি এলে তাঁর চেম্বার থেকে অ্যাশ ট্রে, ডট পেন, স্লিপ প্যাড ইত্যাদি অন্তর্হিত হতো। কিন্তু এখন আর হচ্ছে না।

ডাক্তারবাবু নিজের সাফল্যে খুশি হয়ে রোগীকে শেষ পর্যন্ত অভিনন্দন জানালেন। অবশ্য রোগী নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর এই রোগমুক্তির কথা। কোথাও কোনো জিনিস দেখলে তাঁর আর আজকাল হাত নিশপিশ করে না সেটা তুলে পকেটে ফেলার জন্যে। তিনি কৃতজ্ঞ চিত্তে ডাক্তারবাবুকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, আপনি আমার যে উপকার করলেন, আমি জানি না, কি ভাবে আপনার এই ঋণ শোধ করবো।'

স্থিতচিত্ত ডাক্তারবাবু বললেন, 'দয়া করে আমাকে এসব কথা বলে লজ্জা দেবেন না। আর ঋণশোধ, ঋণের কি আছে ? আপনি তো আমার ভিজিট সবই দিয়ে দিয়েছেন।' একটু থেমে ডাক্তারবাবু একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'তবে যদি কখনো আপনার ঐ ম্যানিয়া ঐ ক্লেপটোম্যানিয়া, চুরির বাতিক ফিরে আসে, কোথাও থেকে আমার জন্যে একটা বিলিতি সিগারেট লাইটার এনে দেবেন।'

আবার মনে মনে

আড়াই হাজার বছর আগে গ্রীক কবি ইউরিপিডেস বলেছিলেন, ঈশ্বর যখন ধ্বংস করেন, তখন প্রথম পাগল করে দেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এক উপন্যাসে লিখেছিলেন, মানুষ মহাপাপে পাগল হয়। সেক্সপীয়ার সাহেব তাঁর হ্যামলেট নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে পাগলামির সঙ্গে সেই অমোঘ উক্তিটি করেছেন, এই যদি পাগলামি হয়, তবে এর ভিতরে পদ্ধতি রয়েছে. (Yet there is madness in it.)।

পাগল ও পাগলামি সংক্রান্ত মহাজনভাষণে আবদ্ধ না থেকে একটু সামনের দিকে যাচ্ছি।

প্রথমে নিজের কথা বলি। আমার লেখা পড়ে যদি কারো ধারণা হয়ে থাকে যে আমার মধ্যে পাগলামি রয়েছে তবে তাঁকে দোষ দেয়া যাবে না। আমাদের বংশে এখন আর তেমন নামকরা পাগল কেউ নেই, কিন্তু বহুকাল পাগলামির ধারা ছিলো। সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণে যাবো না, শুধু একটা ছোট ঘটনা বলি। একবার আমার স্বর্গত অগ্রজকে, যিনি পাগলামির জন্যে নিজ গণ্ডীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, এক মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। ডাক্তারবাবু দাদাকে পরীক্ষা করতে করতে নানা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের বংশে কেউ কখনো পাগলামিতে ভুগেছে ?' দাদা মৃদু হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'না, ভোগেনি তবে অনেকেই পাগলামি উপভোগ করেছে, রীতিমত এনজয় করেছে।'

পাগলামি উপভোগ করার একটা পুরনো গল্প আগে বলে নিই।

এক ভদ্রলোক বিমানবন্দরের কাছে থাকেন। প্রতিদিন বিকালে বিমানবন্দরের পাশের রাস্তায় পায়চারি করে বাড়ি ফিরে আসছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন কে যেন তাঁকে ডাকছেন, 'ও দাদা। ও দাদা। এই যে এদিকে।'

ভদ্রলোক দেখলেন হাস্যমুখ এক ব্যক্তি বিমানবন্দরের এই প্রান্তে একটা ছোট বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে হাত তুলে ডাকছেন। বিমানবন্দরের এদিকটায়, তারকাঁটার বেড়াটা একটু ঢিলে, তার মধ্যে দিয়ে চিকন পায়ে চলার পথ আছে।

আহ্বান শুনে পথচারী ভদ্রলোক কোনো একটা দরকারে ডাকছে এই ভেবে অগত্যা এগিয়ে গেলেন।

সেই হাস্যমুখ ব্যক্তিটি এবার এগিয়ে এসে বললেন, 'দাদা, যাবেন নাকি, আমার এই

প্লেনে মিনিট পনেরো আকাশে বেড়িয়ে আসতেন।'

যাঁকে অনুরোধ করা হলো তিনি কখনো বিমানে চড়েননি। ভাবলেন, এ নিশ্চয় কোনো শৌখীন পাইলট। যাই মিনিট পনেরো আকাশ ভ্রমণ করে আসি। এমন মওকা সহজে জুটবে না।

ছোট প্লেন মাত্র কয়েকটা সিট। ভদ্রলোক উঠে দেখলেন, তিনি ছাড়া আর কোনো যাত্রী নেই। একটু পরেই পাইলট প্লেন ছেড়ে দিলেন, শূন্যে উঠলো উড়োজাহাজ।

হঠাৎ যাত্রী ভদ্রলোক দেখলেন পাইলট অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছেন। একটু বোকার মত যাত্রীভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হলো, এতো হাসির কি হলো ? এতো হাসছেন কেন ?'

উদ্দামভাবে হাসতে হাসতে ছোট প্লেনটাকে একটা নাক-উঁচু ডাইভ দিয়ে পাইলট বললেন, 'আমি যে পাগলাগারদ থেকে পালিয়েছি, সেই পাগলাগারদের লোকেরা যখন টের পাবে যে আমি পালিয়েছি, তখন যে কি মজাই না হবে। কি মজা, কি মজা ! একবার ভাবুন তো দাদা !'

এতো মজায় দাদার তখন বুকের রক্ত হিম।

আগের গল্পটি অবশ্য দারুণ গোলমেলে তদুপরি বিপজ্জনক। কিন্তু বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা অত্যন্ত সামান্য কারণেও উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

একবার এক বায়ুরোগগ্রস্ত ভদ্রলোক প্রাণপণ ছুটে মানসিক ডাক্তারের চেম্বারে ঢুকে যান, সঙ্গে আর্তনাদ, 'ডাক্তারবাবু, বাঁচান, বাঁচান। আমি আর পারছি না। আমার চারদিক ঘিরে ধরেছে, চারপাশ থেকে আমাকে আটকে রেখেছে।'

হতভম্ব ডাক্তারবাবু রোগীকে যথাসাধ্য শান্ত করে জানতে চাইলেন, 'জিনিসটা কি ? কি আপনাকে চারপাশে ঘিরে আটকে রেখেছে ?' রোগী তাঁর হাওয়াই শার্ট উঁচু করে নিচে প্যান্টের কোমরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফিস ফিস করে বললেন, 'আমার এই কোমরের বেল্ট। এই বেল্টটা আমাকে আষ্টেপৃষ্টে ঘিরে রেখেছে।'

আরেক বাতিকগ্রস্তের কথা জানি, সেই ভদ্রলোকের ধারণা হয়েছিল তার এক ধরনের মারাত্মক লিভারের অসুখ হয়েছে। ডাক্তারকে বলতে ডাক্তার ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিলেন, বললেন, 'এ অসুখ হলে আপনি জানতেই পারবেন না। এ আপনার সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বাজে চিন্তা।'

রোগী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন জানতে পারবো না ?' ডাক্তারবাবু বললেন, 'কারণ এ অসুখ টের পাওয়া যায় না। কোনো ব্যথা, বেদনা বা অসুবিধে, এ অসুখের কোনো লক্ষণই নেই।'

এইবার রোগী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, সেইজন্যেই তো। কোনো লক্ষণ না থাকার জন্যেই তো আমি বুঝতে পারছি যে ঐ অসুখটা আমার হয়েছে।'

কোনো ডাক্তারের কাছে কোনো সুরাহা করতে না পেরে এই রোগী একদিন আমাকে তার মনের দুঃখের কথা বলেছিলো। সবচেয়ে দুঃখজনক কথা যেটা বলেছিলো, তা হলো রোগের চিন্তায় আজকাল সারারাত তার ঘুম আসে না। বিনিদ্র রজনীতে বিছানায় শুয়ে ছটফট করে।

আমি অগত্যা তাকে একটা সুপরামর্শ দিয়েছিলাম, 'রাতে এক ঘন্টা পর পর এক পেগ করে হুইসকি খাবে।' সে অবাক হয়ে বলেছিলো, 'তাতে কি আমার ঘুম আসবে ?'

আমি বলেছিলাম, 'ঘুম আসুক ছাই না আসুক। ঘুম না আসার কষ্টে ভুগবে না। পরম আনন্দে জেগে থাকবে।' ঐ রোগী আমার এই সুপরামর্শ গ্রহণ করেছিলো কিনা, আশা করি সে প্রশ্ন আমাকে কেউ করবেন না।

আরেকটা ছিটগ্রস্ত লোকের গল্প করি। এ ভদ্রলোক একদা আমার প্রতিবেশী ছিলেন। একবার সাঁওতাল পরগনা থেকে শীতের সময় বেড়াতে গিয়ে একটা ভালুকছানা নিয়ে এসেছিলেন।

ক্রমশ ভালুকছানাটা পাড়ার মধ্যে বড় হতে লাগলো। পাশের বাড়িতে একটা হিংস্র জন্তু বড় হচ্ছে, নিতান্ত ভয়ে ভয়ে একদিন প্রতিবেশীকে বললাম, 'আপনার ভালুকছানা তো বেশ বড় হলো। এবার ওটাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যান।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন, বললেন, 'সামনের রোববার অবশ্যই ওকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবো।' পরের সপ্তাহের মাঝামাঝি দেখি, ভালুকছানাটা, (এখন আর ছানা নয়, রীতিমত বড়সড়) প্রতিবেশীর বাইরের ঘরের জানলার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যাবেলায় রাস্তায় প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি হলো ? গত রোববার ভালুকের বাচ্চাটাকে চিড়িয়াখানায় নিতে বলেছিলাম যে। নিয়ে যাননি ?'

ভদ্রলোক মধুর হেসে বললেন, 'তা নিয়ে গিয়েছিলাম বইকি। মধুলাল মানে আমার ওই ভালুকছানাটার চিড়িয়াখানা খুব ভালো লেগেছে। ভাবছি এই রোববারে মধুলালকে মিউজিয়ামে নিয়ে যাবো। দেখি মধুলালের মিউজিয়াম চিড়িয়াখানার মতই ভালো লাগে কিনা ?'

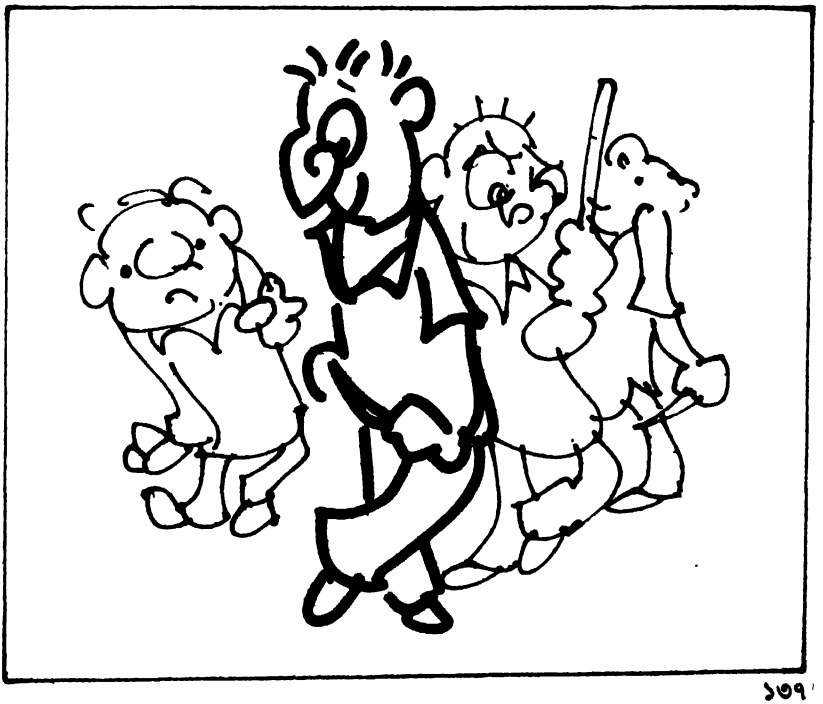

এতো সব আজেবাজে গল্প লেখার পরে সবশেষে একটা প্রকৃত কাহিনী লিখছি ; প্রকৃতই সত্য ঘটনা অবলম্বনে।

এক মনস্তত্ত্ববিদের চেম্বারে এক ভদ্রমহিলা এলেন। তাঁর সঙ্গে শিকলে বাঁধা একটা বেশ বড় মুখপোড়া হনুমান। ডাক্তার ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি ?'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি আমার জন্যে আপনার কাছে আসিনি। আমি এসেছি আমার স্বামীর জন্যে।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন,আপনার স্বামীর কি হয়েছে ?' মুখপোড়া হনুমানটির মুখের দিকে তাকিয়ে মহিলা দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, আমার স্বামীর বদ্ধমূল ধারণা যে তিনি একটা হনুমান।'

একবার বিদায় দে মা

আবার ঘুরে আসবো কিনা জানি না। তবে এবার একবার বিদায় চাই।

বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বলতে গেলে শেষ। আর এক কিস্তি, তারপর বিদায়। বুদ্ধিমান পাঠক এবং ধীমতী পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন বিদ্যাবুদ্ধির ধার কেমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ গতানুগতিক রসিকতা, তারও অধিকাংশ চোরাই—এ আর পোষায় না। এ বোঝা কাঁধ থেকে নামিয়ে এখন কিছুকাল আমি হালকা হয়ে বাঁচতে চাই।

প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায় মাথায় দুশ্চিন্তা দেখা দেয় এ হপ্তায় আবার কি করে লোক হাসাবো। পুরো সপ্তাহ ভূতের মতো কাঁধে চেপে থাকে ইয়ার্কির বাক্স। কোনো চেনা লোকজন আমার সঙ্গে হেসে কথা বলে না, তাদের একমাত্র আশঙ্কা, কি শুনবে আর কি লিখে দেবে কে জানে !

সুতরাং আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।

কিন্তু তার আগে এ সপ্তাহের দায় মেটাতে হবে। সেই যে প্রবাদ-প্রসিদ্ধ এক ব্যক্তি মাত্র দু পঙ্‌ক্তিতে তাঁর উইল রচনা করেছিলেন, 'সজ্ঞানে, সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায় আমি আমার সমস্ত অর্থ নিজে খরচ করে গেলাম। অতএব আমার উইলের প্রয়োজন হচ্ছে না।'

এই ভদ্রলোকের মত যদি আমিও লিখতে পারতাম যে আমার সমস্ত রসিকতা খরচ হয়ে গেছে, সেটা আমার পক্ষে সত্য ভাষণ হতো, কিন্তু দায়িত্ব এড়ানো অত সহজ নয়।

তাই দু-একটা ভুলে যাওয়া, ভুলে না-লিখে-রাখা প্রসঙ্গ উত্থাপন করি।

কয়েকদিন আগে পাগলের গল্পে একটা ঘটনা বাদ পড়ে গেছে। আমার এক বিশেষ বন্ধু খুব সফল মনস্তত্ত্ববিদ এবং অতিশয় পরিহাসপ্রিয়। সে আমাকে বলেছে যে আমার বিদ্যাবুদ্ধি নাকি তার চিকিৎসায় খুব কাজে লাগে। এ রকম শুনে যথেষ্ট গৌরবান্বিত বোধ করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক কিন্তু তাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি বহুকাল ধরে, তাই গম্ভীর মুখে কপাল কুঁচিয়ে জানতে চাইলাম, 'কি রকম ?'

সে বুঝিয়ে বললো, 'দ্যাখো, আমার কাছে মোটামুটি দুরকমের রোগী আসে। এক রকম হলো অকারণে অতিরিক্ত হাসিখুশি, উচ্ছল ; আর এক রকমের হলো অকারণে অতিরিক্ত মন-খারাপ, মুখ-গোমড়া। ঐ দ্বিতীয় দলের লোকেদের আমি ধরে ধরে বিদ্যাবুদ্ধি পড়াই। দেখেছি কারো কারো উপকার হয়, কখনো একটু হাসিমুখ দেখা যায়। আবার ঐ প্রথম দলের অতিরিক্ত হাসিখুশি যারা, তাদেরও পড়াই এবং শতকরা একশো ক্ষেত্রে বিদ্যাবুদ্ধি পাঠ করে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মুখ গোমড়া হয়ে যায়।

এ গল্পের সত্যমিথ্যে জানি না, বিদ্যাবুদ্ধির বিজ্ঞাপন থাক, তবে মার্জার কাহিনীতে আমার প্রতিবেশিনীর বেড়ালের কথা বলা হয়ে ওঠেনি, সেটা না লিখলে পাপ হবে।

ইঁদুরের অত্যাচার আমাদের পাড়ায় বড় সাংঘাতিক। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার প্রতিবেশিনী একটা বিড়ালছানা নিয়ে এলেন কোথা থেকে।

কিন্তু বিশাল বিশাল ইঁদুর, অতটুকু বেড়ালছানা দেখে তারা ভয় পাবে কেন! প্রতিবেশিনী ঠাকরুন বেড়ালছানা বড় হওয়ার জন্যে অধীর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কালক্রমে জৈবিক নিয়মে সে বড় হলো।

প্রতিবেশিনীর সঙ্গে বাজারের রাস্তায় দেখা এর মধ্যে একদিন, দেখি একটা বিশাল ইঁদুর ধরার খাঁচা নিয়ে আসছেন। জিজ্ঞাসা করতে হলো, 'কি ব্যাপার, বেড়ালটা পালিয়েছে নাকি ?' মহিলা বললেন, 'পালাবে কেন ? বাসায়ই আছে। তবে ইঁদুর তো ধরেই না, বরং তাদের সঙ্গে দিনরাত খেলা করে।'

দুদিন পরে বাড়ির সামনে আবার মহিলার সঙ্গে দেখা, জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হলো ? আপনার খাঁচায় ইঁদুর-টিঁদুর ধরা পড়লো ?' তিনি মলিন হেসে বললেন, 'ইঁদুর ধরা পড়েনি

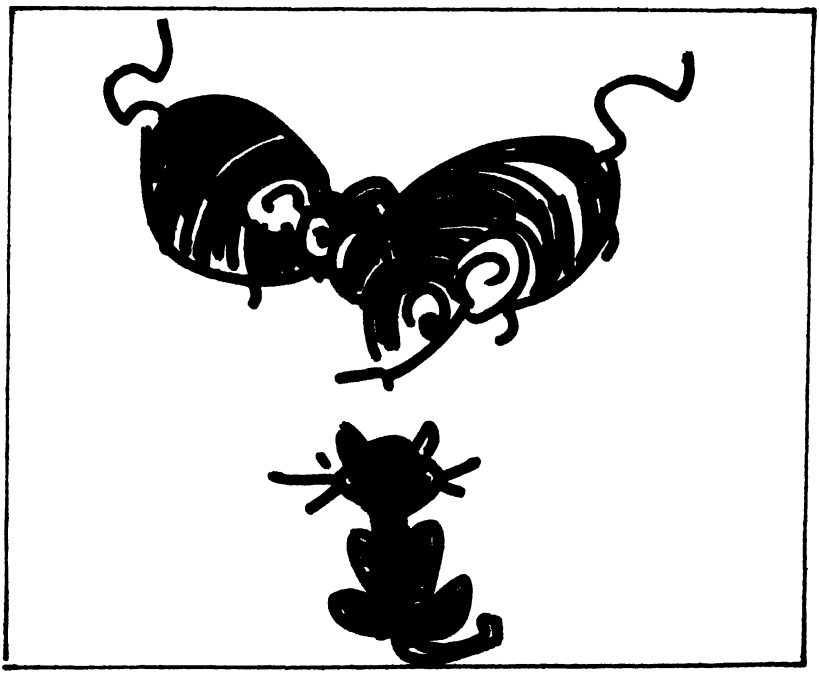

তবে টিদুর পড়েছে।' আমি বললাম, 'মানে ?' তিনি বললেন, 'খাঁচাটা পাতবার পর সর্বপ্রথম ঐ বেড়ালটাই তাতে আটকিয়ে ধরা পড়েছে। অবশেষে খাঁচা ভেঙে তাকে উদ্ধার করতে হয়েছে।'

মাতাল কাহিনীমালায় সব কিছু লিখলাম, কতবার লিখলাম ছাইভস্ম ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু মর‍্যালটা লেখা হলো না।

মর‍্যালটা পড়েছিলাম এক দুঃখী সাহেবের রচনায়। তিনি লিখেছিলেন, 'মদ খেয়ো না। মদ খেলে মাথা গরম হবে। মাথা গরম হলেই বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হবে। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলেই আরো মদ খাবে। তখন আরো মাথা গরম হবে। আরো ঝগড়া হবে বউয়ের সঙ্গে। আরো মদ খাবে। আরো মাথা গরম হবে। বউকে গুলি করে মারতে ইচ্ছে হবে। তখন রিভলবার দিয়ে বউকে গুলি করবে। বউয়ের গায়ে লাগবে না। বউ বহাল তবিয়তে বেঁচে থাকবে। মাতাল বলে হাত কেঁপে যাবে, তাই এমন সুযোগটা হারাবে। তাই বলছি মদ খেয়ো না।'

এতই যখন বললাম, তাহলে শেষ যাত্রা সাহস করে সেই বোকার গল্পটাও বলি।

এ গল্প সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যদি কোনো জীবিত বা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে এই ক্ষুদ্র গল্পের নায়কের কোনো মিল খুঁজে পান, সে দায়িত্ব তাঁর, আমার কিংবা সম্পাদক মহোদয়ের নয়।

কলকাতার পাতাল রেল দেখেছেন ? ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে সে রেলের দরজা একা একা, মানে অটোমেটিক, বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীযুক্ত বোকাবাবু পাতাল রেলে একদিন চড়তে গিয়েছিলেন। ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তে রেলগাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলেন।

এমন সময় ঘটলো সেই ভয়াবহ কাণ্ড। দরজা দুটো, গাড়ি ছাড়ার ক্ষণে, দুদিক থেকে এগিয়ে এসে বোকাবাবুর মাথাটা দুদিক থেকে চেপে ধরলো।

বোকাবাবু যথেষ্ট শক্তিশালী ব্যক্তি। দরজার করাল গ্রাস থেকে প্রবল চেষ্টায় মাথাটা ছাড়িয়ে নিতে পারলেন কিন্তু তাঁর একটা কান কেটে বেরিয়ে গেলো, ছিটকে পড়লো এসপ্ল্যানেড স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে।

রক্তারক্তি, হই হই কাণ্ড !

সহযাত্রীরা চেঁচামেচি শুরু করলেন। বোকাবাবু হাউ হাউ করতে লাগলেন। এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কি করে কে ট্রেন থামালো বলা কঠিন।

গাড়ি থামার পর গার্ড সাহেব সমস্ত শুনে এবং বোকাবাবুর এরকম অবস্থা দেখে ছুটে বেরিয়ে গেলেন গাড়ি থেকে।

গাড়ি ছাড়ার মুহূর্তে যে জায়গায় কোচের সেই দরজাটা ছিলো, যেখানে বোকাবাবুর কানকাটা গিয়েছিলো, সে জায়গাটা খুঁজে পেতে সুবুদ্ধি গার্ড সাহেবের এক মুহূর্তও দেরি হলো না।

সেখানে রক্তাক্ত প্ল্যাটফর্ম ঘেঁষে পড়ে রয়েছে সদ্য-উত্থিত একটি ছিন্ন কর্ণ। গার্ড সাহেব তাঁর পকেট থেকে সাদা রুমাল বার করে পরম যত্নের সঙ্গে সেই কানটা কুড়িয়ে নিলেন। তারপর গুপ্তধন উদ্ধারকারীর মতো উজ্জ্বল, গৌরবময় মুখে দীপ্ত আভা নিয়ে তখনই নির্দিষ্ট কামরায় বোকাবাবুর কাছে দ্রুত চলে এলেন।

যাত্রীরা হৃত সম্পত্তি এত দ্রুত পুনরুদ্ধার হতে ইতিপূর্বে দেখেননি। তাঁরা গার্ডসাহেবের হাতে বোকাবাবুর সদ্য-কর্তিত কান দেখে, 'হিপ হিপ হুর্‌রে, থ্রি চিয়ারস্ ফর মেট্রো

রেলওয়ে' বলে শ্লোগান দিলেন।

কিন্তু বোকাবাবু কানটা দেখে হাতে নিয়ে অনেক উল্টে-পাল্টে ফেরত দিয়ে দিলেন, দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'ভেরি সরি ! গার্ড সাহেব। এ কানটা খুব ভালো। কিন্তু এ কানটা আমার নয়। আমার কানের পিছনে একটা বিড়ি গোঁজা ছিলো।' পুনশ্চ: সেই রসিকতাটা জানেন ?

এক ব্যক্তি আপশোষ করছিলেন, 'দু'বছর চাকরি করার পর আমার চাকরিটা গেলো।'

যিনি শুনছিলেন, জানতে চাইলেন, 'কি চাকরি ছিলো আপনার ?' উত্তর পেলেন, 'সুতানুটি মিউনিসিপ্যালিটিতে রাস্তার কুকুর ধরার চাকরি।'

আবার প্রশ্ন, 'চাকরিটা গেলো কেন ?'

আবার জবাব, 'তেরোটা কুকুর ছিলো সবসুদ্ধ সুতানুটি শহরের রাস্তায়, তেরোটাই যে ধরে ফেললাম।'

সবসুদ্ধ তেরোটা রসিকতা ছিলো তারাপদ ওরফে তেরোপদ বায়ের। তেরোটাই করা হয়ে গেছে তার।

শেষের সেদিন

কোথায়, কোন্ দেশে নাকি তাঁর ল্যাবরেটরিতে এক খামখেয়ালি জীববিজ্ঞানী একটি হাস্যবান হায়েনার সঙ্গে এক সদাবাত্ময়ী কাকাতুয়ার পরিণয় দিয়েছিলেন।

জীববিজ্ঞানীর উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো, এই পরিণয়জাত সংকর সন্তানটি পশু না পাখি তা বোঝা যায়নি, কিন্তু সে বাবার কাছ থেকে হা-হা হাসি এবং মায়ের কাছ থেকে চমকপ্রদ কথা বলা এই দুটি জন্মসূত্রে অর্জন করে।

ফলে এই বিচিত্র জীবটি শুধু হাহা করে হেসেই ক্ষান্ত হতো না, সঙ্গে সঙ্গে কাজের মাধ্যমে হাসির কারণ সর্বদাই ব্যাখ্যা করতো।

এ অবশ্য নিতান্তই গল্প, মানে কল্পকথা। আজ এই শেষ বিদ্যাবুদ্ধিতে এ গল্পের খেই ধরতে যাবো না। বিদ্যাবুদ্ধিতে বোকা হাসি এবং মোটা গল্প অনেক হয়েছে, এবার এই শেষ কিস্তিতে আমার জবাবদিহির পালা।

উত্তর কলকাতার প্রাচীন পাঠক থেকে আলিপুর আদালতের মাননীয় ব্যবহারজীবী পর্যন্ত কেউ কেউ কখনো কখনো বিদ্যাবুদ্ধির কোনো না কোনো স্খলন উল্লেখ করে পত্রাঘাত করেছেন। তাঁদের কাছে আমি যথার্থই কৃতজ্ঞ, তাঁদের চিঠি না পেলে জীবনে জানতে পারতাম না যে এমন প্রাজ্ঞ লোকেরা কষ্ট করে বিদ্যাবুদ্ধির মত জোচ্চুরি করে লেখা পাঠ করেছেন, পাঠ করে বিরক্ত বোধ করেছেন। পয়সা খরচ করে চিঠি দিতেও তাঁদের কষ্ট কম হয়নি। তাঁদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। তবে যাঁরা লিখেছেন বিদ্যাবুদ্ধির কিছু কিছু রসিকতা বিলিতি জোকবুকে তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন, তাঁরা স্বভাবদোষে বিনয় প্রকাশ করেছেন, একটি রসিকতাও আমার নিজের নয়, সবই কোনো না কোনো বই থেকে টোকা। আমার অক্ষম

ভঙ্গিতে এবং নির্বোধ ভাষায় আমি শুধু সে গল্পগুলোকে সাজিয়েছি।

বিনীতভাবে জানাই, মহামহিম মার্ক টোয়েন সাহেব কিংবা চিরকিশোর শিবরাম চক্রবর্তী এবং গোপালভাঁড়, নাসিরুদ্দিন কিংবা প্রাতঃস্মরণীয় পরশুরাম অথবা সৈয়দ মুজতবা আলী, আমার এ মহাবিদ্যা তাঁদের কাছেই অধীত। রসিকতার ধারাই তাই।

মধ্যযুগে আরবদেশে একটা গল্প ছিলো। যমজ ভাই দুজন, আগাগোড়া একরকম দেখতে, তাঁদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। এক বিদেশী বণিক এসে দ্বিতীয় জীবিত ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করছে, 'গতবার আপনার কিংবা আপনার ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। শুনলাম আপনি মারা গেছেন, নাকি আপনার ভাই? আমি কি আপনার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি নাকি আপনার সঙ্গে কথা বলছি? আপনারা দুজনে এতো এক রকম দেখতে, কিছুতেই ধরতে পারছি না।'

এ প্রশ্নের জবাব নেই। মার্ক টোয়েন সাহেব নিজের মত করে চমৎকার লিখেছিলেন এই গল্প, পরে শিবরাম আরও চমৎকার। আর এই অধম? সে এ গল্প লেখেনি, লেখার সাহস হয়নি তার, সে শুধু মুখে বলেছিলো। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতো, একবার সে গিয়েছিলো মার্কিন দেশে। সে দেশে সবই রহস্যময়। সেই রহস্যময়তা শুরু হয়েছে জন্মবৃত্তান্ত থেকে।

সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করতো, আমি কে, আমি কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি উপনিষদীয় জটিল প্রশ্ন। সব প্রশ্নের জবাবে আমার ছিলো একটি মাত্র উত্তর, একটি মাত্র গল্প, সে ঐ যমজের গল্প।

গল্পটা বলি। গল্পটা আমার জন্মরহস্য নিয়ে।

আমার ঠাকুমা ছিলেন যমজ বোনের একজন। এক খরস্রোতা নদীর তীরে ছিলো আমার বাবার মাতুলালয়। মানে আমার পূজনীয়া পিতামহীর পিত্রালয়। যখন আমার ঠাকুমা এবং তাঁর বোনের নয়-দশ বছর বয়েস, একবার বাড়ির নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে, তাঁদের দুজনের একজন জলে ভেসে যান, কে যে সঠিক ভেসে গিয়েছিলেন, আমার পিতামহী নাকি পিতামহীর বোন, তাঁর দেহ আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

দুজনেই ছিলেন হুবহু একরকম দেখতে, নাক চোখ একরকম, গায়ের রঙ, উচ্চতা সবই একরকম, কে যে কে বোঝা অসম্ভব। ফলে হলো কি, যিনি জলে ভেসে গেলেন, তিনিই আমার পিতামহী নাকি তিনি ছিলেন পিতামহীর বোন তা কোনোদিন জানা যায়নি। আজ পর্যন্ত আমি জানি না, আমি আমার পিতামহীর পৌত্র নাকি আমার পিতামহীর বোনের পৌত্র। এই অসম্ভব জটিলতা, রহস্যময়তা আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে ঘিরে আছে।

বিশ্বাস করুন বা না করুন, বিদেশীরা তাজ্জব বনে যেতো এই গল্প শুনে।

এবার একটি তথ্যের মধ্যে যাচ্ছি। গত ১৪ সেপ্টেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সামন্ত লিখেছেন কবিকঙ্কণে আলুর উল্লেখ আছে, সুতরাং আমি যে 'গোপাল ভাঁড়' নিবন্ধে লিখেছিলাম আলু অষ্টাদশ শতকের পরের ব্যাপার, সেটা ভুল।

সত্যিই কি ভুল ? আলু হলো একপ্রকার মূল বা কন্দ। শব্দটি সংস্কৃত না ফরাসী সে বিষয়ে পণ্ডিতদের সন্দেহ আছে। সম্ভবত, আমার মনে হয় আলের মধ্যে যা জন্মায় তাই আলু এবং গোল আলু আমাদের দেশে খুব বেশিদিন আসেনি। এই সেদিন পর্যন্ত পুজোপার্বণে আলুর ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিলো, এখনো সে জলচল হয়নি।

এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে ১৯০২ সালে নব্যভারত পত্রিকায় প্রাচীন আচার ব্যবহার নিবন্ধে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহোদয় লিখেছিলেন, 'এখন গোল আলু লোকের প্রধান তরকারি হইয়াছে। পিতামহেরা উহার নামগন্ধ জানিতেন না। এমন কি, ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে স্টাভোরিনাস নামক ভ্রমণকারী কলিকাতার বাজারের যে সকল তরকারির তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বাঁধাকপি ও কড়াইশুঁটির উল্লেখ আছে, কিন্তু আলুর নাম নেই।' (দ্রষ্টব্য, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত কলিকাতার ইতিবৃত্ত, ১৯১১ সংস্করণ, পৃ ১০৭।)

অকারণে শেষমেষ কচকচির মধ্যে চলে যাচ্ছি। বরং তরল বিষয়ে চলে আসি।

সন্ন্যাসীরা যেমন স্বপ্নে মাদুলি পান তেমনি আমি ডাকে দু'একটা চমৎকার গল্প পেয়েছি। সেগুলির সদ্ব্যবহার করি।

কাঁকুলিয়া রোড থেকে শ্রীমতী সুদেষ্ণা সরকার একাধিক ভালো গল্প পাঠিয়েছেন। একটা গল্প বিশুদ্ধ জলপান নিয়ে।

যখন আন্ত্রিক রোগের হিড়িক দেখা দিয়েছিলো, তখন মিলিটারি সব ব্যারাকে যে কতরকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো, তা আর কহতব্য নয়।

ব্যারাক অধিকর্তা ক্যাম্প পরিদর্শনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পানীয় জল জীবাণুমুক্ত রাখতে তোমরা কি কি ব্যবস্থা নিয়েছো ?'

'আজ্ঞে, আমরা জলটা ভালো করে ফুটিয়ে নিই।'

'বাঃ, বাঃ, এই তো চাই।'

'তারপর আমরা জলের মধ্যে জীবাণুনাশক ওষুধ দিই।'

'চমৎকার।'

'এরপর আমরা সেই জল ফিলটার করি।'

'চমৎকার। অতি চমৎকার।'

'এবং তারপর আমরা নিরাপত্তার খাতিরে শুধু বীয়ার খাই। আজ তিন সপ্তাহ আমরা কেউ জল খাচ্ছি না।'

মদের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে যখন এসেই পড়লো তাহলে বহরমপুরের লোকেন রায়কেও স্মরণ করতে হয়। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, সেখানে এক ভাঁটিখানায় প্রতি সন্ধ্যায় কবির লড়াই হয়, সেখানে তিনি দেখেছেন এবং শুনেছেন, খালি বোতল বাজিয়ে গান হচ্ছে,

হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি যাই বল না
বাংলা মদের নেই তুলনা।

মদমত্ত পাঠ করে উত্তেজিত হয়ে ইন্দ্র বিশ্বাস রোড থেকে আবদুস সালাম বিশ্বাস লিখেছিলেন, 'মদ্যপায়ীদের নিয়ে অহেতুক যথেচ্ছাচার বিবেকবুদ্ধিকে প্রশংসিত না করে ধিক্কৃতই করে।' ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি তবে অনুমান করি বিশ্বাস সাহেব খুব ক্ষুব্ধ।

প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম বসু রোডের বুদ্ধদেব কর। একটি কালো পতাকা পাঠিয়ে করমশায় আমাকে জানিয়েছেন, 'কলকাতার বিভিন্ন সরাবখানায় আপনাকে আমরা ধিক্কার জানিয়েছি। ব্যক্তিগত প্রতিবাদ জানানোর জন্যে একটি ক্ষুদ্র কালো পতাকা আপনাকে প্রদর্শন করলাম।'

শেষ করবার আগে একটা সুখবর দিই। দুর্গাপুর থেকে শ্রীআশীষ মজুমদার আমাকে একটি লটারির টিকিট উপহার পাঠিয়েছেন, তাঁর প্রথম পুরস্কার একটি বড় খাসি, দ্বিতীয় পুরস্কার তিনটি বড় মুরগি।

প্রতিযোগিতার ফলাফল এখনো জানি না। আমার যা ভাগ্য একটা পুরস্কার হয়তো পেয়েও যেতে পারি।

ইতি ১৩১২ বঙ্গাব্দ, আশ্বিন মাস।

হাস্যোপাখ্যান বিদ্যাবুদ্ধি কাণ্ড সমাপ্ত।

পুনশ্চ: একটু দাঁড়ান। এবার যে যমজকাহিনী লিখেছি তাতে একটু বাদ আছে। সেদিন এক যমজ ভাইবোনকে দেখলাম। তারাও দুজনে আগাগোড়া একরকম, শুধু বয়সের ব্যাপারটা ছাড়া। ভাইয়ের বয়েস একচল্লিশ আর বোনের এখনো চৌত্রিশ।